Family Development Package - Book 11

মুসলিম পরিবারের ছেলেমেয়েরা

কেন ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে

?

আমির জামান
নাজমা জামান

Family Development Package – Book 11

আমাদের মুসলিম পরিবারের ছেলেমেয়েরা কেন ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে

(সমস্যা ও সমাধান)

আমির জামান
নাজমা জামান

সম্পাদনা পরিষদ

✍ **ড. কায়সার মামুন**
শিক্ষা বিষয়ক গবেষক
সিংগাপুর

✍ **ড. জাকারিয়া আমিন**
শিক্ষা বিষয়ক গবেষক
অস্ট্রেলিয়া

✍ **মেরিনা সুলতানা**
আরলি চাইল্ডহুড এডুকেটর
ক্যানাডা

✍ **আলী আকবর**
শিক্ষা বিষয়ক গবেষক
আমেরিকা

✍ **জাবেদ মুহাম্মাদ**
পি.এইচ.ডি গবেষক
ইউনিভার্সিটি অব রেজাইনা, ক্যানাডা

Published by
Institute of Family Development, Canada
www.themessagecanada.com

আমাদের মুসলিম পরিবারের ছেলেমেয়েরা কেন ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে?

Amir Zaman
Nazma Zaman
Toronto, Canada
Email: themessagecanada@gmail.com

© Copyright: IFD Trust

1st Edition: April 2013
2nd Edition: December 2015

Please contact for your copy

Bangladesh:

IFD Trust	**UZ Sales Centre**	**Taleb Pharma**	**Al-Maruf Publications**	**Kabir Pablishers**
Mohammadpur	Dhaka	NurJahanRoad	Katabon, Dhaka	Chittagong
Dhaka	01712846164	Dhaka	029673237	01613061653
01710219310	01675865180	01917216350	01913510991	
01682711206		01712177474		

Canada:

TIC	**ATN Book Store**	**Proton Book Store**
Toronto Islamic Centre	Danforth, Toronto	Danforth, Toronto
575 Yonge St. Toronto	416-686-3134	416-686-3134
647-350-4262	416-671-6382	416-671-6382

Other Country:

New York, USA	**California, USA**	**London, UK**	**Singapore**
917-671-7334	714-821-1829	447424248674	65-938-67588
718-424-9051	714-930-6677		

মূল্য ঃ ২৫০ টাকা (BDT)
Price: $7 (Seven Dollars)

কেন এই বই ?

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁরই সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। বাংলাদেশের নাগরিকদের ৮৩% মুসলিম, বাকি ১৭% হিন্দু-বৌদ্ধ ও খৃষ্টান। স্পষ্টতঃই বাংলাদেশ একটা মুসলিম-প্রধান দেশ। মুসলিমরা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী, তাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে আল-কুরআন যা রসূল মুহাম্মাদ ﷺ -এর উপর আল্লাহ নাযিল করেছিলেন আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে (৬১০-৬৩২ খৃষ্টাব্দে)।

এখন ইনফর্মেশন টেকনলজির যুগ, ইসলামকে জানার জন্য তথ্যের কোন অভাব নেই। এখন দরকার শুধু সদিচ্ছা ও ইসলামকে জানার জন্যে আন্তরিক চেষ্টা। এতসব resources হাতের নাগালে থাকা সত্বেও দেশে এবং বিদেশে বাংলাভাষী মুসলিম পরিবারগুলোতে হাহাকার -- তাদের ছেলেমেয়েরা ইসলাম ধর্ম-বিরোধী কার্যকলাপ করে যাচ্ছে। কেউ কেউ কুরআন-হাদীস-আল্লাহ-রসূল-হিজাব-দাড়ি-টুপি ইত্যাদি নিয়ে জনসমক্ষে ও টিভি-ইন্টারনেটে আপত্তিকর বিরূপ মন্তব্য অবলিলায় করে যাচ্ছে।

আমরা দেশে ও বিদেশে ইসলাম-বিরোধী মনোভাব ও কর্মকাণ্ডের কারণ অন্বেষণ করে যেসব বাস্তব তথ্য উদ্ধার করতে পেরেছি তাই অতি সংক্ষিপ্ত আকারে এই বইটাতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তবে বিষয়টা এমন নয় যে আমরা সব নূতন বা অজানা কথা বলতে বসেছি। না, তা নয়। আমরা চেষ্টা করেছি ইসলাম-বিদ্বেষী ও ইসলাম-বিরোধী শক্তিগুলোকে চিহ্নিত করে বাস্তব পরিস্থিতির দিকে মুসলিম সমাজের, বিশেষ করে প্রত্যেক পরিবারের মুসলিম মাতাপিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। কারণ আমরা দেখতে পেয়েছি যে আসলে আমাদের গোড়াতেই গলদ রয়েছে, সমাজ গঠনের মূল ভূমিকা পালন করে থাকে যে পরিবার সেই পরিবারেই আজ ইসলাম অনুপস্থিত। পরিবারের সন্তানদের শিশুকাল থেকেই ইসলামকে জানার কোন সুযোগ সৃষ্টি করা হয় না। তারা জানতেই পারে না ইসলাম কী অথবা মুসলিম বলতে কী বোঝায়। তাহলে তারা কী শিখে বেড়ে উঠছে?

তারা তাদের বাবা-মা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সংগে বসে দিনরাত টিভি-ইন্টারনেটে ইসলামী আকীদা ও ঈমান ধ্বংসকারী কুরুচিপূর্ণ মুভি ও সিরিয়াল, নাটক-সিনেমা, নারীপুরুষের সম্মিলিত হৈ হল্লাপূর্ণ নাচগান, যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশা ও অশ্লীলতাপূর্ণ commercials দেখে। এবং এসব দেখে দেখেই ওরা বড় হয়।

তারা ঘরের বাইরে স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিতেও সম্পূর্ণরূপে ইসলামবিহীন পরিবেশে সময় কাটায়। ইসলামী শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী ও পরিপন্থী মানসিকতা তাদের মাঝে পাকাপোক্তভাবে আসন গেঁড়ে বসে। স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচীতে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা অনুপস্থিত। দেশে-বিদেশে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরাও ইন্ধন জোগাচ্ছে তাদের ইসলাম-বিদ্বেসী কবিতা-গল্প-উপন্যাস-নাটক এবং বক্তৃতায়।

চতুর্দিকে এই ইসলাম-বিরোধী প্রচারণার সর্বগ্রাসী আক্রমণে দিশেহারা আজ মুসলিম শিশু-যুবক ও এমনকি বয়স্করাও। সব অনাচারই আজ গ্রহণযোগ্য, এমন কি সমকামিতা, অবিবাহিত নারীপুরুষের একসাথে অবৈধ বসবাস, মদ খাওয়া, নেশা করা, বিবাহবহির্ভূত দৈহিক মিলন ইত্যাদি কোন কিছুই আর মুসলিমদের মনে ঘৃণার উদ্রেক করে না! মুসলিম সমাজকে, তাদের দোষ-ত্রুটি ও দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করার উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের এই বই প্রকাশ করছি। এই বইটিকে দু'টি ভাগে সাজানো হয়েছে যথা ঃ

১ম ভাগ ঃ এই আধুনিক যুগে আমাদের মুসলিম পরিবারের ছেলেমেয়েরা কেন ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

২য় ভাগ ঃ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের অজানা কাহিনী।

এখানে ১ম গ্রুপ ইসলাম নামক আল্লাহর নিয়ামত কাছে পেয়েও দূরে ঠেলে দিচ্ছে। আর ২য় গ্রুপ বিধর্মী হয়েও ইসলামের সৌন্দর্য দেখে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলামের ছায়া তলে ভিড়ছে।

এই বই পড়ে কেউ যেন আমাদের ভুল না বুঝেন। আমরা কোন ব্যক্তি, দল বা সোসাইটিকে হেয় বা ছোট করার চেষ্টা করিনি, যদি কারো নিকট এমন মনে হয়ে থাকে তাহলে সেটা আমাদের ভাষাগত দুর্বলতা। আর আমাদের ভাষাগত দুর্বলতার কারণে কেউ মনে আঘাত পেয়ে থাকলে আমরা সেজন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থি। মহান আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন, আ-মী-ন। সকল ভুলত্রুটি ফোনে অথবা ইমেইলে জানালে তা আগামী সংস্করণে প্রতিফলিত হবে, ইনশাআল্লাহ।

আমির জামান
নাজমা জামান
টরন্টো, ক্যানাডা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

হে ঈমানদারগণ!
তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারের লোকদেরকে
জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও
যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।
(সূরা আত তাহরীম ঃ ৬)

মুসলিম পরিবারের ছেলেমেয়েরা কেন নাস্তিক বা ইসলাম-বিদ্বেষী হচ্ছে? কেনইবা নন-প্র্যাক্টিসিং মুসলিম হচ্ছে?

হ্যাম্‌লিনের বংশীবাদকের মতো কেউ কি আমাদের বাংলাদেশের মুসলিম ঘরের ছেলেমেয়েদেরকে মোহগ্রস্ত করে দিন-দিন ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ইসলাম-বিদ্বেষী করে তুলছে, নাস্তিক বানিয়ে ফেলছে! এর রহস্যটা কী?

সূচীপত্র

আসুন আমরা গভীরভাবে চিন্তা করি ১২
এ যুগের ছেলেমেয়েদের মানসিকতা ১৩
আল কুরআনে ইবলিস শয়তানের ঘোষণা ১৪
কিন্তু মহান আল্লাহ্ বলছেন ১৪
মুসলিম কাকে বলে? ১৫
আমি কি ইসলাম মেনে চলতে বাধ্য? ১৫
আমি কী সিদ্ধান্ত নেবো? ১৬
ইসলাম মানে কী? ১৬

১ম পরিচ্ছেদ ঃ সঠিক শিক্ষার অভাব

পারিবারিক অসচেতনতা ১৯
আমাদের অতিরিক্ত ব্যস্ততার প্রভাব ২০
আল-কুরআন থেকে দূরে সরে থাকা ২০
কুরআন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার পিছনে ইবলিস শয়তানের প্ররোচণা ২১
রসূল ﷺ -কে না চেনা এবং তার জীবনী না জানা ২৪
সাহাবা (রাদিআল্লাহু আনহুম)-দের সম্পর্কে না জানা ২৫
বাংলা একাডেমীর বই মেলা ২৬
আলেমদের গাফিলতি ২৬
ইসলামিক লাইব্রেরীর অভাব ২৭
ভালর সাথে খারাপ মিলিয়ে ফেলা ২৮
ইসলামকে নিজেদের সুবিধামত কাস্টমাইজ করে নেয়া বা ব্যাখ্যা করা ২৯
ব্রিটিশ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ৩০
ইসলামের অনুসরণ করা অপশনাল বা ঐচ্ছিক ভাবা ৩১
ইবাদত সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকা ৩৩
হুজুরদের স্বরণাপন্ন হওয়া ৩৪
সলাতে (নামাযে) কী পড়ি তা না বুঝা ৩৪
ইসলামী নিয়মের অপব্যবহার ৩৫
ফরয সলাত (নামায) আদায় না করা ৩৬
জুমার খুৎবা থেকে কোন শিক্ষাগ্রহণ না করা ৩৭
মসজিদ ফ্যাসিলিটির সঠিক ব্যবহার না করা ৩৭
ইসলাম পালন করাকে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ভাবা ৩৯

আলেমদের নিয়ে ভুল ধারণা ৪০
মৃতব্যক্তিকে নিয়ে নানা রকম কান্ড ৪১
মৃত্যুর পর ইসলামের ব্যবহার ৪১
অন্যান্য ফরয হুকুম ঠিক মতো পালন না করা ৪৩
ইসলামিক কালচার অনুসরণ না করা ৪৩
সালামের সঠিক ব্যবহার না করা ৪৪
ইসলাম যা বলে আমরা তার উল্টোটা করি ৪৫
ভুল পন্থায় ঈদ উদযাপন ও রমাদানের পরের চিত্র ৪৭
অনেক স্কুল-কলেজে মেয়েদের হিযাব ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে ৪৯
তরুণদের ভাবনা ৫০
'মধ্যযুগ' বা 'আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগ' নিয়ে ভুল বুঝাবুঝি ৫১
যাকাতের সঠিক ব্যবহার না করা ৫২
একটি প্রচলিত ভুল ধারণার অবসান হোক ৫৩

২য় পরিচ্ছেদ ঃ অপসংস্কৃতি

বিজাতীয়দের প্রভাব ৫৮
মিডিয়ার প্রভাব ৫৯
ড. জাকির নায়েকের শর্ত ৬০
টিভিতে নিউজ বা খবর দেখা ৬১
টক শো (Talk Show) ৬১
অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু আপত্তিকর দৃশ্য শিশুদের মনে কু-প্রভাব ফেলে ৬২
পর্নগ্র্যাফীর সহজলভ্যতা ৬২
বিভিন্ন স্টারদের অনুসরণ করার প্রবণতা ৬৩
আইনের লোকের ক্ষমতার অপব্যবহার ৬৪
ফান্ডামেন্টালিস্ট বা মৌলবাদী বলে গালি দেয়া ৬৪
টেকনোলজির অপব্যবহার ৬৫
ফেইসবুকের অপব্যবহার ৬৫
ব্লগিং-এর অপব্যবহার ৬৭
নাটক-সিনেমার প্রভাব ৬৮
দিন দিন চিত্ত বিনোদনের আমূল পরিবর্তন ৬৯
নাটক-সিনেমার মাধ্যমে ব্রেইনওয়াশ ৭১
ভুল সংস্কৃতি চর্চা করার প্রভাব ৭২
মোমবাতি জ্বালানোর ইতিহাস ৭৩

গল্প-উপন্যাসের প্রভাব ৭৬
তাগুতের প্রভাব ৭৬
বিভিন্ন ফিলোসফি বা মতবাদের প্রভাব ৭৭
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রভাব ৭৮
স্কুল-কলেজের প্রভাব ৭৮
বিভিন্ন রকম ড্রাগ এবং মদ পানের প্রভাব ৭৯
জুয়া খেলা ও সিগারেট খাওয়ার প্রভাব ৮০
ছেলেমেয়েদের আপত্তিকর অনন্দ ফুর্তি (Fun) ৮০
বুদ্ধিজীবীদের প্রভাব ৮১
সংস্কৃতিমনাদের প্রভাব ৮১
প্রগতিশীলতার প্রভাব ৮২
ছেলে মেয়েদের অবাধ মেলামেশার প্রভাব ৮২
বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড পিকআপ-ড্রপ ৮৩
বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড কালচারের প্রভাব ৮৪
'লিভ টুগেদার' ও "এম.আর ." সাধারণ বিষয় ৮৬
'ভ্যালেন্টাইন'স ডে'-র প্রভাব ৮৬
কো-এডুকেশনের প্রভাব ৮৭
উচ্চ শিক্ষিতদের চিন্তাধারা ৮৯
অবৈধ বা হারাম উপার্জনের প্রভাব ৮৯
সর্বত্র দুর্নীতির প্রভাব ৯০
রাজনৈতিক প্রভাব ৯২
ইসলামের দৃষ্টিতে "শহীদ" কে? ৯২
নাস্তিকের হাজ্জ পালন ও মুসলিম হবার দাবি ৯৪
তাওরাত ধর্মগ্রন্থে আল্লাহর নির্দেশ ৯৫
আল্লাহ যে এক তা আমরা অন্যান্য ধর্মেও দেখতে পাই ৯৬
সর্বত্রই নাস্তিকতার হার দিন দিন বাড়ছে ৯৭
'মুরতাদ'-দের উপর কিছু বিশ্লেষণ ৯৭

৩য় পরিচ্ছেদ ঃ সংস্কৃতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন

সংস্কৃতি-চিন্তার সংগতি-অসংগতি ১০০
সংস্কৃতির জয়-পরাজয় ১০১
সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ১০৩
বর্ষরণ ও আত্মঘাতী সাংস্কৃতিপ্রীতি ১০৪

অপসংস্কৃতির কবলে বাংলাদেশ ১০৭
সংস্কৃতি নিয়ে আরো কিছু কথা ১০৮
লালন ফকিরের ধর্মীয় মতবাদ ১০৯
ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতিই মানবতার একমাত্র উপায় ১১১
ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা ও বর্তমান পরিপেক্ষিত ১১২
ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য পূর্ণাঙ্গ মানুষ পূর্ণাঙ্গ সমাজ ১১২
ভাষা নিয়ে ভাবনা ১১৩
ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতা ১১৪
মিউজিকের কুপ্রভাব ১১৪
পহেলা বৈশাখ ও নিউইয়ার উদযাপন করার বিধান ১১৮
মূর্তি, ভাস্কর্য ও ইসলাম ১২২
সকল প্রশ্নের একমাত্র জবাব আমি মুসলিম ১২৫

৪র্থ পরিচ্ছেদ ঃ নারীর সম্মান, অধিকার ও নিরাপত্তা

মুসলিম মেয়েদের সংক্ষিপ্ত পোশাক (ড্রেস) যখন বিপদের কারণ ১২৭
নারীর স্বাধীনতা নাকী অসম্মান! ১২৯
নারী স্বাধীনতার ইতিবৃত্ত ১৩১
নারীর অধিকার সম্বর্কে ভুল ধারণা দূর হওয়া প্রয়োজন ১৩২
ইসলামে নারীর অধিকার ১৩৩
বাংগালি নারীরা অযথাই ভয় পান ১৩৩
নারীর হিজাব সম্পর্কে একটু জানা যাক ১৩৪
সৌন্দর্য প্রদর্শন ও পর্দাহীনতার ক্ষতি ১৩৫
রূপ-সৌন্দর্য নারীর মহামূল্যবান সম্পদ ১৩৬
পুরুষদের পর্দা ১৩৭
বাড়ীর ভেতরে পর্দার নিয়ম ১৩৭
কর্মক্ষেত্রে পর্দার সুবিধা ১৩৮
মহিলাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ ১৩৯

৫ম পরিচ্ছেদ ঃ কুসংস্কার

দ্বীনের সঠিক জ্ঞানের অভাব ১৪১
ভুল ইসলাম চর্চার প্রভাব ১৪২
ভুলে ভরা তথাকথিত ইসলামী সাহিত্যের প্রভাব ১৪৩
আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট সাহায্য চাওয়া ১৪৪
দেয়ালে ছবি টাঙানো এবং শোকেসে মূর্তি রাখা ১৪৫

গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান ১৪৫
বিয়ের অনুষ্ঠান ১৪৬
বিয়ে নিয়ে নানারকম কুসংস্কারে বিশ্বাস করার প্রভাব ১৪৬
কুসংস্কারে বিশ্বাস করা ও শুভ-অশুভ মেনে চলা শিরক ১৪৭
তাবিজ-কবচের উপর নির্ভর করার প্রভাব ১৪৮
বিদ'আত পালন করার প্রভাব ১৪৯
বেশীরভাগ কবীরা গুনাহের সাথেই আমরা জড়িত! ১৪৯

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ অমুসলিমদের প্রতি সম্মান

অমুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রতি ইসলামের উদারতা ১৫১
মোঘল সম্রাট আকবরের দ্বারা ইসলামের ক্ষতিসাধন ১৫৬
'সাম্প্রদায়িকতা' শব্দের অপপ্রয়োগ বন্ধ হওয়া প্রয়োজন ১৫৮
ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism) মতবাদ সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন ১৫৯
"লাকুম দীনুকুম ওয়াল ইয়াদীন" আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা ১৬২
দেশের উন্নতিতে ইসলাম কি প্রতিবন্ধক? ১৬৩

৭ম পরিচ্ছেদ ঃ শান্তি (ইসলাম) নাকি নিজেদের মধ্যে দলাদলি

দাওয়াত না ঝগড়া - আমেরিকা থেকে নুমান আলী খান ১৬৯
মাযহাব সংক্রান্ত জটিলতা ১৭১
বেনামাযীর সংখ্যা অধিক হওয়ার কারণ কী? ১৭৬
সুন্নাতি পোষাকের নামে বিভ্রান্তি ১৭৯
৫ বছরে মুসলিমদের ইসলাম ধর্ম ত্যাগের পরিসংখ্যান ১৮৩

Appendix

"অনেক কষ্টে পাওয়া ইসলাম" ১৮৪
ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের কাহিনী
অভিবাবকগণ খেয়াল করি ২৫৩

আমরা কি চাই?

- আমরা কি চাই আমার সন্তান একজন ভাল একাডেমিক হওয়ার পাশাপাশি একজন ভাল মুসলিম হোক?
- আমরা কি চাই আমার সন্তানের অন্তরে সৎগুণাবলীর সমাবেশ ঘটুক?
- আমরা কি চাই আমার সন্তানেরা দুনিয়া এবং আখিরাত দুই দিকেই সফলতা অর্জন করুক?

আসুন আমরা গভীরভাবে চিন্তা করি

- আমাদের সন্তানের জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কী হবে?
- তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কী হবে?
- কোন ভাবাদর্শে আমরা তাকে গড়ে তুলবো?
- কোন মৌলিক উপাদান দিয়ে তার চিন্তা চেতনা গড়ে তুলবো?

এ যুগের
ছেলেমেয়েদের মানসিকতা

১. এখনকার ছেলেমেয়েরা বাবা-মার চেয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সিদ্ধান্তকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে ।

২. এখন তারা ইন্টারনেটকেই সকল বিনোদনের উৎস বলে মনে করে ।

৩. বলিউড-হলিউডকে সকল বিনোদনের প্রধান উৎস বলে মনে করে ।

৪. টিভি চ্যানেলগুলোকে একমাত্র সুস্থ স্বাভাবিক শিক্ষার উৎস বলে মনে করে ।

৫. আমেরিকান আইডল আর ইন্ডিয়ান আইডলকে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও অবশ্যই দর্শনীয় অনুষ্ঠান বলে মনে করে ।

৬. ইউরোপ আমেরিকাকে সভ্যতা আর মানবাধিকারের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত তীর্থস্থান বলে মনে করে ।

৭. তারা ফ্যাশন শোতে অংশগ্রহণ এবং মডেল হওয়াকে খুব গর্বের কাজ মনে করে ।

৮. তারা ইসলামকে টেররিজম ভাবে, এবং ইসলাম পালন করাকে ব্যাকডেইটেড বা অপশনাল বলে মনে করে ।

৯. তারা ব্যন্ড মিউজিক এবং হ্যাভিমেটাল মিউজিককে ইবাদত বলে মনে করে ।

১০. তারা বিভিন্ন স্টারকে ফলো করে এবং তাদেরকে গুরু বলে মনে করে ।

১১. তারা উল্টা-পাল্টা কাজ করাকে আধুনিকতা বলে মনে করে ।

১২. তারা আল্লাহ, রসূল ﷺ এবং ইসলামকে অবমাননা করাটাকে আধুনিকতা বলে মনে করে ।

১৩. তারা নাস্তিক শিক্ষক-শিক্ষিকা, নেতা-নেত্রী, অভিনেতা-অভিনেত্রী, নাট্যকার, গায়ক-গায়িকা, কবি-সাহিত্যিক, বাউল-সন্নাসীদেরকেই বেশী অনুসরণ করতে পছন্দ করে ।

১৪. তারা শবে কদর-এর রাত্রির চাইতেও 31st December night-কে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে ।

১৫. তারা Happy New Year, পহেলা বৈশাখ এবং Valentine's Day পালন করা জরুরী বলে মনে করে ।

আল কুরআনে
ইবলিস শয়তানের ঘোষণা

আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে ইবলীস [শয়তান] বলল ঃ আমি এদের (মানব জাতির) সামনে থেকে আসবো, পিছন থেকে আসবো, ডান দিক থেকে আসবো, বাম দিক থেকে আসবো এবং তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবে না। (সূরা আরাফ ৭ ঃ ১৭)

সে [শয়তান] বলল ঃ হে আমার রব! আপনি যে আমাকে বিপথগামী করলেন তারজন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপকাজকে শোভনীয় করে তুলবো এবং আমি তাদের সকলকেই বিপথগামী করবো। (সূরা হিজর ১৫ ঃ ৩৯)

সে [শয়তান] বলল ঃ আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করবো, তবে ওদের মাঝে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের নয়'। (সূরা সা'দ ৩৮ ঃ ৮২-৮৩)

কিন্তু
মহান আল্লাহ বলছেন

হে মু'মিনগণ! তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামের দিকে আসো এবং শয়তানের পথ অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।
(সূরা আল বাকারা ২ ঃ ২০৮)

মুসলিম কাকে বলে?

মানব শিশু মানুষই হয়, পশু বা পাখি হয় না। কিন্তু একজন শিক্ষকের ছেলে কি জন্মগতভাবেই শিক্ষক হতে পারে? না। কারণ শিক্ষকতার জন্য যেসব গুণ থাকা দরকার তা অর্জন না করলে শিক্ষক হওয়া যায় না। মুসলিম পরিচয়টাও একটা গুণ। এটা জন্মগত কোন গুণ নয় বরং এটা চেষ্টার মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। প্রত্যেক গুণই অর্জন করতে হয়। নাবীর ঘরে জন্ম নিয়েও নূহ (আ.)–এর ছেলে কাফির হয়েছিল। কারণ মুসলিম হবার গুণ সে অর্জন করেনি। তাই বুঝতে হবে যে কী কী গুণ থাকলে মুসলিম হিসেবে গণ্য হওয়া যায়।

ইসলাম শব্দটি আরবী। আমাদের দেশে মুসলমান শব্দটাই বেশী চালু। এ শব্দটি ফার্সী ভাষা থেকে এসেছে। ইসলাম শব্দ থেকেই মুসলিম শব্দটি এসেছে। যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে তাকেই মুসলিম বলে। ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ। নিজের খেয়াল খুশী ও প্রবৃত্তির মর্জি মতো না চলে যে আল্লাহর মর্জি ও পছন্দের নিকট আত্মসমর্পণ করে তারই পরিচয় হলো মুসলিম। এখন চিন্তা করি যে, আমরা যদি মুসলিম হিসেবে নিজের পরিচয় দিতে চাই তাহলে আমাদের কী কী গুণ অর্জন করতে হবে।

প্রথমত ঃ আমাকে জানতে হবে যে, ইসলাম কী ?

দ্বিতীয়ত ঃ আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমি ইসলামকে মেনে চলতে প্রস্তুত আছি কিনা।

তৃতীয়ত ঃ ইসলামকে মেনে চলতে চাইলে সব ব্যাপারেই আল্লাহ ও রসূল ﷺ -এর আদেশ নিষেধ কী তা জানতে হবে এবং তা পালন করে চলতে হবে।

আমি কি ইসলাম মেনে চলতে বাধ্য?

উপরে যে ৩টি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা অর্জন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বাধ্য করেন না। স্বাধীনভাবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার মানুষকে দেয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

"বস্তুতঃ আমি তাকে (মানুষকে) দু'টি পথ [সরল পথ ও পাপের পথ] প্রদর্শন করেছি।" (সূরা আল-বালাদ ঃ ১০)

যদি কেউ ইসলামকে কবুল করতে না চায় তাহলে বুঝা গেল যে, সে নিজেকে মুসলিম বলে গণ্য করতে চায় না এবং সে আল্লাহ ও রসূল ﷺ -এর আদেশ-নিষেধ পূর্ণভাবে পালন করতে রাযী নয়।

মানুষের এ স্বাধীন ইচ্ছার কারণেই সে মুসলিম হিসেবে চলার সিদ্ধান্ত নিলে আল্লাহর কাছে পুরষ্কার পাবে, আর অন্য সিদ্ধান্ত নিলে শাস্তি পাবে। এটা তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত। আল্লাহ তাকে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেননি।

আমি কী সিদ্ধান্ত নেবো?

গতানুগতিকভাবে আমি নিজেকে যতই মুসলিম বলে মনে করি না কেন, ব্যাপারটা কিন্তু সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নেবার বিষয়। যদি মুসলিম হিসেবেই জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত নিতে চাই তাহলে ইসলাম সম্পর্কে জানতে হবে এবং মেনে চলার জন্য মনের দিক দিয়ে প্রস্তুত হতে হবে। এ মানসিক প্রস্তুতির নামই ঈমান। যখন নিজের মধ্যে ঈমান তৈরি হবে তখন আল্লাহ ও রসূল ﷺ -এর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা কঠিন মনে হবে না। সুতরাং নিজের বিবেককে জিজ্ঞেস করি যে, এ বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেবো? আমি কি কুরআনের কিছু অংশ মানবো আর কিছু অংশ মানবো না? দেখি এ ব্যাপারে আল্লাহ কী বলেছেন ঃ

"তোমরা কি কুরআনের কিছু অংশ মান আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে যাদেরই এরূপ আচরণ হবে তাদের এছাড়া আর কী শাস্তি হতে পারে যে তারা পার্থিব জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ অবগত আছেন।" (সূরা আল বাকারা ঃ ৮৫)

মানুষ কি মনে করে নিয়েছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এতটুকু বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে - তাদের পরীক্ষা নেয়া হবে না? (সূরা আনকাবুত ঃ ২)

তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে পৌঁছে যাবে? (সূরা বাকারা ঃ ২১৪)

ইসলাম মানে কী?

প্রত্যেক সৃষ্টির কল্যাণের উদ্দেশ্যে তার জন্য সবচেয়ে উপযোগী বিধানই স্রষ্টা দিয়েছেন। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, গাছ-পালা, নদী-নালা, আকাশ-বাতাস, পশু-

পাখি, কীট-পতঙ্গ সকলেরই জন্য রচিত বিধান মেনে চলা বা না চলার কোনো অধিকার তাদেরকে দেননি। তিনি নিজেই সব বিধান সব সৃষ্টির উপর চালু করে দিয়েছেন। ঐসব বিধান নাবীর মাধ্যমে পাঠানো হয়নি, আল্লাহ নিজেই জারী করেছেন।

মানুষের দেহের জন্যও যেসব বিধান দরকার তাও নাবীর মাধ্যমে পাঠানো হয়নি। রক্ত চলাচলের নিয়ম, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের বিধি এবং অন্যান্য যাবতীয় বিধান আল্লাহ নিজেই চালু করে দিয়েছেন। কিন্তু মানুষের নৈতিক জীবনের সকল বিধি-বিধান, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ বিচার করে মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে তুলবার জন্য যে জীবনবিধান প্রয়োজন তা-ই নাবীর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। এসব মেনে চলার জন্য বাধ্য করা হয়নি। আল্লাহ বলেন ঃ

"তোমরা কী আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করতে চাও? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিস ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক তাঁরই আনুগত্য করে যাচ্ছে। আর সকলেই তাঁর কাছেই ফিরে যাবে।"
(সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৩)

সুতরাং সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার রচিত বিধানই হলো ইসলাম। যে সৃষ্টির জন্য যে বিধান তা-ই ঐ সৃষ্টির ইসলাম। মানুষের উপযোগী যে বিধান তা-ই মানুষের ইসলাম। মানুষের দেহসহ সকল সৃষ্টির ইসলামই বাধ্যতামূলক এবং তার জন্য নাবীর দরকার হয়নি। কিন্তু ভাল-মন্দ পার্থক্য করার মতো বুদ্ধি নিয়ে জন্মগ্রহণ করা মানুষের জন্য যে ইসলাম নাবীর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে তা পালন করতে মানুষকে বাধ্য করা হয়নি। এমন কি নাবীকেও ক্ষমতা দেয়া হয়নি মানুষকে বাধ্য করতে।

যখন কেউ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর দেয়া বিধানই তার জন্য ভাল তখন বুঝা গেল যে, সে ঈমান এনেছে। অর্থাৎ সে ইসলামকে মেনে চলার জন্য মনের দিক দিয়ে প্রস্তুত হয়েছে বা মুসলিম হিসেবে জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মূল কথা ঃ

ইসলাম মানে হলো আল্লাহর ইচ্ছা এবং তাঁর বিধানের প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পন (complete submission)। তার মানে, আমার নিজের ইচ্ছায় আমি কিছুই করতে পারবো না। যা কিছু করবো তা যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইচ্ছায় বা তাঁরই দেয়া নিয়মে করতে হবে।

১ম পরিচ্ছেদ

সঠিক শিক্ষার অভাব

পারিবারিক অসচেতনতা

- আমাদের মুসলিম ঘরের ছেলেমেয়েরা ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে পারিবারিক অসচেতনতা ।
- পিতামাতা এজন্য অনেকাংশে দায়ী, কারণ তারা তাদের সন্তানদের ইসলাম চর্চা বা ইসলামী জ্ঞান অর্জন নিয়ে খুব একটা চিন্তা করেন না ।
- আমরা জানি বাংলাদেশের ৮৩% লোক মুসলিম । কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে এদের খুব অল্প সংখ্যকই ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো ভালো করে জানেন বা বুঝেন ।
- সন্তানেরা নিজ ঘরে ছোটবেলা থেকেই তেমন একটা ইসলামী পরিবেশ দেখে না ।
- সন্তানরা জন্মের পর থেকে নিজ ঘরে বাবা-মাকে ঠিক মতো নামায-রোযা করতে দেখে না, যাকাত দিতে দেখে না । কুরআন-হাদীস পড়তে, ইসলামী বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করতে দেখে না ।
- সন্তানেরা নিজ মা, ফুফু, খালাদেরকে পর্দা করতে দেখে না । কুরআন-হাদীস পড়তে দেখে না ।
- সন্তানেরা নিজ ঘরে অনৈসলামী অনুষ্ঠান ও কর্মকান্ড দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে ।

আমাদের অতিরিক্ত ব্যস্ততার প্রভাব

আমরা সবাই আজকাল পার্থিব জীবন নিয়ে এতো ব্যস্ত যে এই বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে মহান আল্লাহ ও তাঁর রসূল নাবী মুহাম্মাদ ﷺ বলে দিয়েছেন ঃ

- 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান, আমার দ্বীনের কাজের জন্য তুমি (দুনিয়ার) ব্যস্ততা কমাও, আমি তোমার অন্তরকে প্রাচুর্য দিয়ে ভরে দেব এবং তোমার দরিদ্রতা ঘুচিয়ে দেব। আর যদি তা না কর, তবে তোমার হাত (আমি) ব্যস্ততায় ভরে দেব এবং তোমার অভাব দূর করব না।' [তিরমিযী, মুসনাদ আহমদ, ইবন মাজাহ]

- যে ব্যক্তি দুনিয়াকে তার জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে, আল্লাহ তার (ভালো-মন্দের) দায়িত্ব থেকে পৃথক থাকেন। তিনি (আল্লাহ) তার (ঐ ব্যক্তির) চোখের সামনে দরিদ্রতাকে তুলে ধরেন, আর প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ যা তাকদীরে লিখে রেখেছেন তা ব্যতীত ঐ ব্যক্তির জন্য আর কিছুই আসবে না। আর যে ব্যক্তি পরকালকে তার জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে, আল্লাহ ঐ ব্যক্তির (ভাল-মন্দের) দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেন, তাকে অন্তরে সমৃদ্ধি দান করেন, আর পৃথিবী তার কাছে ছুটে আসে আকুল হয়ে। [ইবনে মাজাহ ও ইবনে হিব্বান]

- আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি নাবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, যে ব্যক্তি পরকালকে তার জীবনের পরম ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছে আল্লাহ তার যাবতীয় অভাব-অনটনের দেখাশুনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন; আর যে ব্যক্তির আগ্রহ-আরাধনা হয়েছে পার্থিব বিষয়াদি, আল্লাহ তার বিষয়ে কোনো জামিনদার নন। [ইবনে মাজাহ]

আল-কুরআন থেকে দূরে সরে থাকা

- ইসলামের মূল সোর্স আল-কুরআন হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান (Complete code of life) যার ছায়াতলে এসে এবং মর্ম বুঝে কোটি কোটি মানুষ মুসলিম হয়েছিলেন। সেই মুসলিম ঘরে জন্ম নেয়া ছেলেমেয়েরা আজ কুরআনের মধ্যে কী আছে তা জানে না। তাদেরকে এর অর্থ ও ব্যাখ্যা জানানোর জন্যে ব্যাপক কোন ব্যবস্থা জাতীয়ভাবে করা হয়নি। এমনকি পারিবারিকভাবেও করা হয়নি।

- যারা কুরআনের অর্থ জানেন এবং বুঝেন, তারা নিজ দায়িত্বে এটা অন্যকে শিখানোর ব্যাপারে উদাসীন। চাকুরির বাইরে কুরআনের সঠিক শিক্ষা এবং প্রচারের কাজ আমরা কতজন করি?

- আল-কুরআনকে আমরা শুধু ব্যবহার করছি তিলাওয়াতের জন্য। যারাই কুরআন পড়ছি তাও শুধু মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে তিলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখছি, অর্থ বোঝার কোন চেষ্টা করছি না। যেন কুরআনের অর্থ বোঝার কোন প্রয়োজনই নেই!

- আশ্চর্যের বিষয়, আমরা অনেক বই পড়ি কিন্তু কোন বই পড়তে মাথা দুলাইনা কিন্তু এই একটি মাত্র বই যা পড়ার সময় কেন যেন মাথা দুলাই আর এর অর্থও বুঝি না এবং প্রয়োজনও মনে করি না।

- আল-কুরআন সম্পর্কে আমাদের ভুল ধারণা ঃ এক প্রতিবেশী আপা তার বাচ্চাদের অনেকগুলো সূরা মুখস্ত করিয়েছেন কিন্তু তিনি তার বাচ্চাদের ইয়াসীন সূরা মুখস্ত করতে দেন না। তার কারণে তিনি বলেন, ইয়াসীন সূরা খুব গরম তো তাই ওদেরকে পড়তে দেই না। কোথায় পেলেন তিনি এই গরম সূরার খবর?

- আল-কুরআনকে ব্যবহার করা হচ্ছে ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবজের জন্য। আবার ব্যবহার করা হচ্ছে কেউ মারা গেলে মৃত মানুষের কল্যাণের জন্য, অথচ আল কুরআনে মৃত মানুষদের কল্যাণের জন্য একটি আয়াতও নেই। এটা সম্পূর্ণভাবেই জীবিতদের জন্যে উপদেশের ও তা যথাযথভাবে পালনের নির্দেশ বহনকারি কিতাব।

কুরআন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার পিছনে ইবলিস শয়তানের প্ররোচণা

- মুসলিমদেরকে কুরআন থেকে দূরে সরে থাকার জন্য যে বিষয়গুলো কাজ করে তার মধ্যে আর একটি বিশেষ কারণ হলো "ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে না"। এটি ইবলিস শয়তানের একটি প্ররোচণা। তাই এই বিষয়ে আমাদের ভুল ধারণা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন যে কুরআন স্পর্শ করার জন্য অযুর প্রয়োজন নেই। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন 'পাক-পবিত্রতার কথা', ওজুর কথা বলেননি। 'কুরআন পড়তে বা ধরতে ওজু থাকতে হবে' এটি

শয়তানের একটি প্ররোচনা। কারণ শয়তান চায় না মানুষ বেশী বেশী কুরআন পড়ুক, বুঝুক এবং সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করুক। মানুষের বেশীরভাগ সময়ই সাধারণত ওজু থাকে না আর সেজন্য তারা ভয়ে কুরআনও স্পর্শ করে না। মানুষ কুরআন অর্থসহ বুঝে পড়লে এবং সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করলে সেটাই হবে শয়তানের ব্যর্থতা। রসূল ﷺ কুরআনের আয়াত দিয়ে চিঠি লিখে বিভিন্ন দেশের অমুসলিম রাজাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছিয়েছেন। সেই সকল অমুসলিম রাজারা ওজু ছাড়াই কুরআন স্পর্শ করেছেন। ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী একমাত্র নামায পড়তে ও কাবাঘর তাওয়াফ করতে ওজু লাগে, এছাড়া আর কোন কাজে ওজু লাগে না। এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য ডা. জাকির নায়েকের লিখা বই এবং ডা. মতিয়ার রহমানের লিখা বই পড়া যেতে পারে। "ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কিনা"।

- ২০১৩ সালে পাকিস্তানে এক লক্ষ ইমামের মধ্যে একটি সার্ভে করা হয়েছে যে তারা সলাতে (নামাযে) যা পড়ছে বা তিলাওয়াত করছে তা বুঝেন কিনা। এই এক লক্ষ ইমামই উত্তরে বলেছেন যে তারা যা তিলাওয়াত করেন তা বুঝেন না। শুধু পাকিস্তানেই নয়, বরং বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক মুসলিম অধ্যুষিত দেশেই এই অবস্থা বিরাজ করছে।

- অনেক হুজুররাই সাধারণ মুসলিমদের কুরআন বুঝে পড়তে নিরুৎসাহিত করেন। তারা বলেন কুরআন বুঝার প্রয়োজন নেই, কুরআন বুঝবে শুধু আলেমরা। তারা মুসলিমদেরকে শুধু তিলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চান। অনেক সাধারণ শিক্ষিত লোকেরাই আরবী দেখে শুদ্ধমতো কুরআন পড়তে পারেন না, হয়তো অনেক জায়গায় ঠেকে যান, তাই তারা কুরআনই পড়েন না।

- এমন এক শ্রেণীর মানুষ-তো আছেই, যারা মুসলিম উম্মাহর কল্যাণের প্রশ্নে শুধু অনীহ বা অনাগ্রহী নয়, রীতিমতো প্রতিশ্রুত শত্রুতা দ্বারা চালিত। এবং এইসঙ্গে একটি অতীব কৌতুককর বাস্তবতা হলো, এমন অসংখ্য ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি আছেন, যারা দলবদ্ধভাবে একটি বিশেষ পুস্তক ছাড়া অন্য কোনো বই, এমনকি কুরআন হাদীস পাঠ করাকেও নিরুৎসাহিত করেন। তাঁদের বিশ্বাস, বই-পুস্তক পড়লে অন্তরে অহেতুক ফিতনা সৃষ্টি হয়, আখিরাতমুখী 'যিকির ফিকির'-এর খুব ক্ষতি হয়। আর এই কারণে একটি বিরাট

ইসলামপ্রেমী দল আজ বই-পুস্তক থেকে সতর্কভাবে দূরে থাকাই সমীচীন জ্ঞান করছেন!

- অনেক প্রকাশনী শুধু আরবী টেক্সট দিয়ে আল কুরআন ছাপিয়ে বাজারে ছাড়েন, তাতে কোন অর্থ বা সংক্ষিপ্ত তাফসীর থাকে না। যার কারণে যারা তিলাওয়াত করেন তারা ঐ তিলাওয়াতের বাইরে এক অক্ষরও কুরআনের অর্থ জানার সুযোগও পান না আর জানেনও না। তারা শুধু নিজেদেরকে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে তিলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন, আর মনে করেন অনেক সওয়াব হচ্ছে। মনে রাখতে হবে যে, আল-কুরআন শুধু সওয়াবের জন্য আসেনি, এসেছে মানব জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করার জন্য।

- অনেক প্রকাশনী খুবই ছোট সাইজের কুরআন ছাপিয়ে বাজারে ছাড়েন যা চশমা বা খালি চোখে দেখে পড়া যায় না। এতো ছোট সাইজ যে পড়তে হলে ম্যাগনিফাইং গ্লাস লাগে। তারা এই কুরআন হয়তো ছাপায় মুসলিমদের গলায় ঝুলানোর জন্য বা পকেটে রাখার জন্য যাতে ভূত-প্রেত কাছে আসতে না পারে। এই ধরণের আচরণের সমর্থনে কোন দলিল কুরআন বা হাদীসে নেই। সঠিক ব্যবহার বাদ দিয়ে আজ কুরআনকে শুধু ব্যবহার করা হচ্ছে তাবিজ হিসেবে।

- অনেক উচ্চ শিক্ষিত লোকেরা সারা জীবন মোটা মোটা বই পড়ছেন এবং বড় বড় ডিগ্রি নিচ্ছেন, নিজেরাও বড় বড় বই লিখছেন কিন্তু কুরআন পড়ার কোন সময় করতে পারলেন না। যার কারণে উচ্চ শিক্ষিত লোকদের মধ্যে একটি বিশাল অংশ আল কুরআন বুঝেন না এবং সৃষ্টিকর্তা কী বলেছেন তা জানেনও না। তবে জাতি গঠনের জন্য এই শিক্ষিত শ্রেণীর কুরআন বুঝা খুবই জরুরী।

- বাংলাদেশের প্রতিটি মুসলিম শিক্ষক-শিক্ষিকার আল কুরআনের উপর ভাল জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তারা যদি আল-কুরআন না বুঝে থাকেন তাহলে তারা কীভাবে কুরআনের আলোকে যুব সমাজ গঠন করবেন? কীভাবে জাতি গঠন করবেন? তারাই তো জাতির ফাউন্ডেশন তৈরী করেন। আমরা জানি যে স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের একেকজন শিক্ষক-শিক্ষিকা একেক বিষয়ের উপর পারদর্শি। যেমন, সমাজ-বিজ্ঞান, পৌরনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, অংকবিদ্যা, রসায়ান বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের একেকজন শিক্ষক যদি আল কুরআনের সঠিক শিক্ষা পেতেন এবং গোটা কুরআন যদি বুঝতেন তাহলে তাদের

প্রতিটি বিষয়ের সাথে কুরআনকে সম্পৃক্ত করে ক্লাশে বুঝাতে পারতেন। এতে ছোটবেলা থেকেই ছাত্র-ছাত্রীরা আল কুরআনের সাথে পরিচিত হয়ে যেত।

- আমাদের ভুল ধারণা যে আল-কুরআন বুঝবেন শুধু স্কুলের ধর্ম শিক্ষক, এটা তার বিষয়। আর স্কুলের মধ্যে সবচেয়ে অবহেলিত বিষয় হচ্ছে এই ইসলাম ধর্ম। আমি সমাজ-বিজ্ঞানের শিক্ষক, আমি কুরআন নিয়ে মাথা ঘামাবো কেন? এই ধরণের চিন্তা সম্পূর্ণরূপে ভুল। আমি সমাজ-বিজ্ঞানের শিক্ষক হয়ে যদি আল-কুরআন না বুঝি তাহলে কীভাবে কুরআনের আলোকে সমাজ গঠন করবো? কীভাবে ক্লাশে সুষ্ঠ সমাজনীতি শিখাবো? আমার কাজ তো সমাজ নিয়ে। অথচ ১৪শত বছর আগে আল্লাহর রসুল ﷺ তো আল কুরআন দিয়েই তখনকার বর্বর সমাজের পরিবর্তন এনেছিলেন।

রসূল ﷺ -কে না চেনা এবং তার জীবনী না জানা

- আমাদের সন্তানেরা জানে না নাবী মুহাম্মাদ ﷺ কে? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটি কে তারা চেনে না। তারা জানে না রসূল ﷺ ছিলেন শ্রেষ্ঠ পিতা, শ্রেষ্ঠ স্বামী, শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী, শ্রেষ্ঠ দরদী, শ্রেষ্ঠ বিচারক, শ্রেষ্ঠ দানশীল, শ্রেষ্ঠ সংগঠক, শ্রেষ্ঠ সমর নায়ক, শ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী এবং আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্ব।

- বাংলাদেশের বেশীরভাগ ছেলেমেয়েরাই রসূল ﷺ -এর বিস্তারিত জীবনী জানে না, রসূল ﷺ -এর সঙ্গী-সাথী অর্থাৎ সাহাবাদের জীবনী জানে না। ইসলামের সঠিক ইতিহাস জানে না। এমনকি বাবা-মায়েরাও জানেন না। অথচ যার মাধ্যমে এই পৃথিবীতে ইসলাম এসেছে এবং ইসলাম বাস্তবায়িত হয়েছে তার জীবনী জানা আমাদের খুবই জরুরী।

- আমাদের দেশে রবীন্দ্র, নজরুল, লালন, জসিম উদ্দিন, মাইকেল মধুসুদন দত্ত, আব্বাস উদ্দিন, জয়নুল আবেদীন, শামসুর রহমান, হুমায়ুন আহমেদ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিভাদের নিয়ে নানা রকম সেমিনার, কনফারেন্স, ওয়ার্কশপ, সপ্তাহব্যাপী আলোচনা অনুষ্ঠান ইত্যাদি দেশের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিগুলোতে, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে, উসমানি মিলনায়তনে, টিএসসিতে বছরের বিভিন্ন সময়ে উৎযাপিত হয়ে থাকে। এই

অনুষ্ঠানগুলোতে বুদ্ধিজীবী, কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কবি-সাহিত্যিক, লেখক-লেখিকা, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার লোকেরা খুবই আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

- কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই ধরণের আয়োজকরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভা মুহাম্মাদ ﷺ -কে নিয়ে কোন সেমিনার-ওয়ার্কশপ করেন না। তাই ঐ শ্রেণীর নাগরিকগণ রসূল মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে তেমন কিছু একটা জানেন না। মাদ্রাসার হুজুর শ্রেণীরা শীতকালে প্যান্ডেল করে যে ওয়াজ মাহফিল করেন তাতে ঐ শ্রেণীর নাগরিকগণ অংশগ্রহণও করেন না। আর ঐ ওয়াজ মাহফিলের পরিবেশও তাদের জন্য মানানসই নয়।

- বাংলাদেশে নজরুল একাডেমী, বাংলা একাডেমী, ভাষা ইনস্টিটিটিউট, রবীন্দ্র কুঠি বাড়ি মিউজিয়াম ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা পরিষদ এবং গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে। অনেকে নজরুল ইসলামের উপর বা কবীগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর পি.এইচ.ডি করেন। কিন্তু মুহাম্মাদ ﷺ -কে নিয়ে কোন গবেষণার সুযোগ নেই, ইনস্টিটিউটও নেই। মুহাম্মাদ ﷺ -কে নিয়ে টিভিতে কোন টক শো হয় না। টি.এস.সিতে সপ্তাহব্যাপী কবিতা উৎসবের মতো মুহাম্মাদ ﷺ -এর জীবনী নিয়ে কোন উৎসব হয় না। যার কারণে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটি সম্পর্কে এযুগের আধুনিক ছেলেমেয়েরা অজ্ঞ থেকে যাচ্ছে।

সাহাবা (রা.)-দের সম্পর্কে না জানা

- রসূল ﷺ -এর পরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চারজন সফল রাষ্ট্রপ্রধান আবুবকর, ওমর, উসমান, আলী (রাদিআল্লাহু আনহুম) সম্পর্কেও আধুনিক যুগের ছেলেমেয়েরা তেমন কিছু একটা জানে না। এই চারজনকেই আল্লাহ তাদের জীবিত অবস্থায় জান্নাতের নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু)-র সময়কে বলা হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যুগ। তিনি প্রশাসন সিস্টেম প্রবর্তন করেন, যেমন ঃ তিনি যাকাতের মাল সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যাংক এবং রিজার্ভ ফান্ড চালু করেন, স্বেচ্ছাসেবকদের ভাতা প্রদান এবং নীতিমালা প্রণয়ন করেন। এছাড়া বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা, ভূমি কর ও অন্যান্য কর নির্ধারণ করেন, চাষাবাদের জন্য খাল খনন করেন। তিনি কুফা, বসরা, ফুসতাত, মুওতাত, মুওসাল শহরগুলোতে কৃষি উন্নয়ন করেন। বিজিত রাষ্ট্রসমূহকে প্রাদেশিক রাজ্যে বিভক্ত করেন। উশর আদায়ের জন্য

কর্মচারী নিযুক্ত করেন। জেলখানা ও পুলিশ বাহিনী গঠন করেন। মুক্ত আবহাওয়ার পরিবেশে সৈন্যদের জন্য শেল্টার তৈরী করেন। দেশের খবরাখবরের জন্য পত্রিকার ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন শহরে সার্কিট হাউজ তৈরী করেন। দরিদ্র ইহুদী-খ্রীষ্টানদের জন্য ফুড ব্যাংক চালু করেন। শিক্ষকদের জন্য বেতন ধার্য করেন। মদীনা হতে মক্কার পথে রেষ্ট হাউজ তৈরী এবং বিনা মূল্যে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। আজকের উন্নত দেশগুলোর যে ওয়েলফেয়ার সিস্টেম আছে তা ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থার আদলে তৈরী।

বাংলা একাডেমীর বই মেলা

- প্রতি বছর ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলা একাডেমীতে এক মাস ব্যাপী বই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই বই মেলাতে হাজার হাজার বই প্রকাশিত হয়। শতশত বইয়ের দোকানের মাঝে কোন ইসলামী বইয়ের দোকান থাকে না। শোনা যায় শুধু মাত্র ইসলামিক ফাউন্ডেশনের একটি স্টল থাকে। যাহোক, এই বই মেলাতে লক্ষ লক্ষ আধুনিক ছেলেমেয়েদের সমাগম ঘটে, তারা নানা রকম গল্প সমগ্র, কবিতা, উপন্যাস ইত্যাদি কিনে এবং আগ্রহ করে পড়ে।

- যদি এই বই মেলাতে কিছু উন্নতমানের এবং সহীহ (অথেন্টিক) ইসলামী বইপত্র পাওয়া যেতো তাহলে আমাদের ছেলেমেয়েরা সেখান থেকে কিছু ইসলামী বইও কিনতো এবং নিশ্চয়ই তা থেকে উপকৃত হতো। এছাড়া অন্যান্য উপন্যাসের পাশাপাশি রসূল ﷺ -এর তথ্যবহুল জীবনী পাওয়া গেলে অনেকেই মানব জাতির জন্য তাঁর অবদানের কথা জানতে পারতো। তাহলে হয়তো (তথাকথিত) আধুনিক ছেলেমেয়েরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটি সম্পর্কে আজেবাজে কটুক্তি করতো না।

আলেমদের গাফিলতি

- মুসলিম আলেমগণ (যারা ইসলাম মানেন, বুঝেন ও পালন করেন) তারা বর্তমানে আধুনিক ছেলেমেয়েদের কাছাকাছি আসতে পারছেন না। এসব ছেলেমেয়েরা ইসলামের প্রতিনিধি অর্থাৎ আলেমদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত স্ট্যাটাস অত ভালো নয় বলে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে না। আবার আলেমরাও ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদেরকে আধুনিক ছেলেমেয়েদের

কাছ থেকে দূরে রাখেন, তাদের কাছেও যান না আবার তাদেরকে নিজেদের কাছেও আসার পথও তৈরী করে দিচ্ছেন না। দীর্ঘ দিন ধরে এই দুই গ্রুপের মাঝে ব্যাপক ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে আছে যা দূর হওয়া প্রয়োজন।

- ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা এই ছেলেমেয়েরা যেমন জানেন না বা ইসলামের আসল রূপ ও সৌন্দর্য্য দেখার সৌভাগ্য তাদের হয়নি, ঠিক তেমনি আমরা যারা ইসলাম জানি, বুঝি, মানি ও ভালোবাসি, তারাও ইসলাম প্রচারের দায়িত্বকে ফরয মনে করে ইসলামকে তাদের কাছে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করিনি অথচ বিশাল অংকের টাকার চুক্তিতে ওয়াজ মাহফিল করে বেড়াচ্ছি।

ইসলামিক লাইব্রেরীর অভাব

- আমেরিকা, ক্যানাডা, সিঙ্গাপুরে দেশের প্রতিটি এলাকায় একটি করে উন্নতমানের রেফারেন্স লাইব্রেরী রয়েছে। অর্থাৎ পুরো দেশের আনাচে কানাচে শতশত লাইব্রেরী রয়েছে। যে কেউ বিনা পয়সায় মেম্বার হতে পারেন এবং লাইব্রেরীতে বসে পড়া-লেখা এবং রিসার্চ করতে পারেন এবং প্রয়োজনে বই, ডিভিডি বাসায় নিয়ে যেতে পারেন। প্রতিটি লাইব্রেরীতেই কম্পিউটার, প্রিন্টার এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা রয়েছে। সব সার্ভিসই ফ্রী। এই লাইব্রেরীগুলোতে বিভিন্ন ধর্মের উপর নানা ভাষায় বই রয়েছে।

- কিন্তু আমাদের দেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের একটি লাইব্রেরী ছাড়া দেশের আর কোথাও কোন ইসলামিক লাইব্রেরী নেই। অনেক এলাকাতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বা কোন সোসাল অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে লাইব্রেরী থাকতে পারে কিন্তু তা রয়েছে শুধুমাত্র গল্প-উপন্যাসে ভরপুর। সেখানে শুধু অথেন্টিক ইসলামী বইয়ের অভাব।

- বাংলাদেশ এখন মসজিদের জন্য বিখ্যাত এবং এই দেশ মসজিদের দেশ হিসেবে সারা পৃথিবীতে প্রথম স্থান পেয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে কোটি কোটি টাকা খরচ করে মসজিদ বানানো হচ্ছে কিন্তু মসজিদগুলোর তাকে হয়তো কিছু আরবী কুরআন রয়েছে তাও শুধু তিলওয়াত করার জন্য। কিন্তু ইসলামকে জানার জন্য, কুরআনকে জানার জন্য কোন

ইসলামী সাহিত্য এবং তাফসীর নেই। রসূল ﷺ -কে জানার জন্য কোন সীরাত গ্রন্থ নেই।

- প্রায় প্রতিটি শিক্ষিত পরিবারের ড্রইংরুমে একটি বইয়ের আলমিরা থাকে এবং সেখানে অনেক সাহিত্যের বই-ই থাকে কিন্তু শুধু থাকে না ইসলামের উপর অথেন্টিক বই। যদিও কারো কারো ঘরে 'মকসুদুল মোমিনুন' বা 'নিয়ামুল কুরআন' এই জাতীয় দুই একটা বই থাকে যা মানুষকে সঠিক ইসলাম থেকে আরো দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং ইসলামের নামে কিছু বিদ'আত ঘরের মধ্যে পালিত হয়।

- আমরা যদি ইতিহাস দেখি যে মুঘল সম্রাটরা কোটি কোটি রুপি খরচ করে প্রাসাদ বানিয়েছে, প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ তাজমহল নির্মাণ করেছে, মার্বেল পাথর দিয়ে খুবই চাকচিক্যময় মসজিদ নির্মাণ করেছে কিন্তু তারা মুসলিমদের সঠিক ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য কোন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেননি, লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেননি, ইসলামী গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেননি।

- ধনী আরব দেশগুলো ডোনেশন দিয়ে আমাদের মতো গরীব দেশেগুলোতে পাঁচওয়াক্ত সলাত আদায় করার জন্য অনেক মসজিদ তৈরী করে দিয়েছে, যা সলাত শেষে তালা মেরে রাখা হচ্ছে অন্য কোন কাজে লাগছে না। তারা আমাদের প্রতি দয়া পরবেশ হয়ে দেশের আনাচে কানাচে অনেক মসজিদ তৈরী করে দিয়েছে ঠিকই কিন্তু এই মসজিদগুলো আবাদ করার জন্য লোক তৈরীর ব্যবস্থা করেনি, কোন লাইব্রেরী বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেনি।

ভালর সাথে খারাপ মিলিয়ে ফেলা

- সবকিছুতে আমরা ভাল-খারাপ তালগোল পাকিয়ে ফেলেছি, মিক্সআপ করে ফেলেছি। আমরা অনেক অন্যায়কেই আর অন্যায় বলে মনে করি না। আমাদের বিবেক ভোতা হয়ে গেছে। সুদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া আজ একটা সাধারণ ও গ্রহণযোগ্য ব্যাপার। বাবা ঘুষ খান, ঘুষ দেন, সুদ খান, সুদ দেন, মিথ্যা বলেন, আমানত খেয়ানত করেন, অন্যের ক্ষতি করেন, সরকারের ট্যাক্স ফাঁকি দেন, গ্যাস-পানি-বিদ্যুতের বিল ঠিক মতো পরিশোধ করেন না। সন্তানরা এগুলো জন্মের পর থেকে দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এসবকে এরা আর অন্যায় বলে মনে করে না।

- আমরা নামাযও পড়ছি আবার ব্যবসায় মানুষকে ঠকিয়ে যাচ্ছি, রোযাও রাখছি আবার অশ্লীল নাটক-সিনেমাও দেখছি, বেপর্দা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, অন্যের গীবত করে বেড়াচ্ছি, পরনিন্দা-পরচর্চা করে বেড়াচ্ছি। ভাল-মন্দ আলাদা করতে পারছি না। সমাজের সবাই এভাবেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সন্তানরাও জন্মের পর থেকে এগুলো দেখে আসছে। ওদের চোখে এসবই স্বাভাবিক, গ্রহণযোগ্য বলে মনে হচ্ছে। এসব অন্যায়কে এরা ঘৃণা করতে শিখছে না, মাবাবাও তা শেখাচ্ছেন না।

ইসলামকে নিজেদের সুবিধামত কাস্টমাইজ করে নেয়া বা ব্যাখ্যা করা

- যদিও কোন পরিবার ইসলাম পালন করার চেষ্টা করেন তাদের মধ্যে থেকে অনেকেই ইসলামকে নিজেদের মতো করে কাস্টমাইজ করে নিয়েছেন। অর্থাৎ ইসলামের যা যা নিজের পালন করা সহজ হয় সেগুলো শুধু পালন করেন, আর ইসলামের যেগুলো পালন করা কঠিন বা যেগুলো পালন করতে গেলে কিছু সামাজিক ও আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করতে হয় সেগুলো ইসলাম থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন।

- সারা দিনে কিছু সময় ইসলাম পালন করেন আর কিছু সময় পালন করেন না। যেমন একজন মহিলা সাধারণত পর্দা করে চলেন কিন্তু যখন কোন অনুষ্ঠানে যান তখন আর পর্দা করেন না বরং পর্দা খুলে সেখানে সাজগোজ করে নিজেকে উপস্থাপন করেন।

- যখন ঘরে থাকেন তখন সলাত আদায় করেন কিন্তু যখন শপিংয়ে যান, সারাদিন মার্কেটে ঘুরে বেড়ান তখন আর সলাত আদায় করেন না। মনে হয় সলাতটা শুধু বাসায় থাকলে আদায় করতে হয়, বাইরে গেলে প্রয়োজন নেই।

- রমাদান মাসে ঢাকার গাউসিয়া-নিউমার্কেটে মহিলাদের চাপে ঢুকাই যায় না। সম্মানিত মহিলারা রোযাও রেখেছেন কিন্তু সারা দিন বেপর্দা হয়ে শপিং করছেন এবং যোহর-আসর-মাগরিবের সলাত আদায় করছেন না।

ব্রিটিশ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন

- ভারতবর্ষ প্রায় দুইশত বৎসর খ্রীষ্টানদের অধীনে থাকাকালে তৎকালীন এক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মি. গ্ল্যাডষ্টোন (১৮০৯-৯৮) একদিন একটি কুরআন উঁচু করে ধরে হাউজ অফ কমন্সে বলেছিলেন, - "দেখ, এটা হচ্ছে মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআন, মুসলিমগণ যদি এই কুরআনের সঠিক শিক্ষা লাভ করে তবে তোমরা কোন মুসলিম দেশেই তোমাদের শাসন চালাতে সক্ষম হবে না। তোমরা যদি মুসলিম দেশগুলির উপর নিরাপদে রাজত্ব করতে চাও, তাহলে এই কুরআনের শিক্ষা হতে মুসলিমদেরকে দূরে রাখতে হবে।" তাদের প্ল্যান অনুযায়ী মুসলিমদের মধ্যে বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিলেন যে- "মানুষের জীবনে দুইটি অংশ, একটি হলো দ্বীনদারী এবং আর অপরটি হলো দুনিয়াদারী।" দ্বীনদারী এবং দুনিয়াদারীর মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই, একটা থেকে অন্যটা সম্পূর্ণ আলাদা। দ্বীনদারীর ব্যাপার শুধু দেখবে মাদ্রাসার হুজুররা এবং দুনিয়াদারী হলো কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষিত মানুষের জন্য।

- তাদের আরো পরিকল্পনা হলো ঃ মাদ্রাসার সিলেবাস তৈরী করা এবং সেই সিলেবাসে যেন আল-কুরআন বলতে শুধু পরকাল সম্পর্কিত বিষয় ছাড়া অন্য কিছু না থাকে। তখন থেকেই মাদ্রাসায় শিক্ষায় বাস্তব জীবন সম্পর্কিত আল-কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সুকৌশলে বাদ দিয়ে দেয়া হয়েছে। চালু হলো না বুঝে কুরআনে হাফিজ, বিভিন্ন রকম কুরআন খতম, কুরআন দিয়ে নানা রকম তাবিজ-কবচ, চাল পড়া দিয়ে চোর ধরা, কুলখানী, মিলাদ, সবিনা খতম, হালাকা যিকর, মোরাকাবা, আওলীয়া হওয়ার জন্য সংসার ত্যাগ, পীর-মুরীদি, পীরদের জান্নাতের নিশ্চয়তা দান, কলব পরিষ্কার, নানারকম চিল্লা লাগানো, মাজারের খেদমত করা, মাজারে শির্ণি দেয়া, ফুল-ফল দেয়া, আগর বাতি জ্বালানো।

- ইংরেজরা সুকৌশলে শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে এমন দুই মেরুতে ভাগ করে দিলেন যে যারা মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হবে তারা administration-এ আসতে পারবেন না অর্থাৎ দেশ চালানোর মতো তাদের কোন যোগ্যতা থাকবেনা। যারা মাদ্রাসা থেকে পাশ করে বের হবে তাদের পেশা হবে সাধারণতঃ মুসলমানী করানো, বিয়ে পড়ানো, তারাবী সলাত পড়ানো, ইমামতি করা, মুয়াজ্জিনগিরী করা, জানাজা পড়ানো, খতম পড়ানো, মিলাদ পড়ানো, জীন-ভূত তাড়ানো, মাদ্রাসায় পড়ানো, এতিমখানার প্রিন্সিপাল

ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্যদিকে তারা সাধারণ স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে সাজালেন যেন তার মধ্যে আল-কুরআনের কোন প্রকৃত শিক্ষা না থাকে কারণ কুরআন হচ্ছে complete code of life। তাই যারা দেশ চালাবে, পার্লামেন্টে বসবে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় চালাবে, ইন্ডাসট্রিজ, ব্যাংক, কোর্ট, থানা, ক্যান্টনমেন্ট ইত্যাদির দায়িত্বে থাকবে তাদের মধ্যে থাকবে না কোন কুরআনের সঠিক শিক্ষা।

ইসলামের অনুসরণ করা অপশনাল বা ঐচ্ছিক ভাবা

- **আমাদের ইসলামের জ্ঞান** ঃ আমরা যারা general education-syllabus-এ শিক্ষা লাভ করেছি, যেমন ঃ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র, একাউনটেন্ট, পাইলট, লইয়ার, সাংবাদিক, আর্মি অফিসার, এমপি, মন্ত্রী ইত্যাদি প্রোফেশনে আছি তাদের ইসলামের উপর একাডেমিক জ্ঞান আসলে কতটুকু? বিষয়টি একটু গভীরভাবে ভেবে দেখা যাক। স্কুলের প্রাইমারী ক্লাশ থেকে শুরু করে এস.এস.সি পর্যন্ত আমাদের "ইসলাম ধর্ম" নামে একটি সাবজেক্ট ছিল। ঐ বইতে কী পড়েছিলাম তা হয়তো অনেকেরই পরিষ্কার মনে নেই, তাছাড়া ঐ "ইসলাম ধর্ম" নামের বইটির মধ্যে আল-কুরআনের বাস্তব এপ্লিকেশন সম্পর্কে কতটুকু বর্ণনা ছিল তাও ভেবে দেখার বিষয়। এবার আসি নবম ও দশম শ্রেণীতে আমরা এই বিষয়টি পড়েছি খুবই গুরুত্বসহকারে যার বেশীরভাগ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ছিল এস.এস.সি.তে লেটার মার্কস পাওয়া, ইসলামকে ভালভাবে জানা নয়। কারণ এই একটি বিষয়েই খুব সহজে লেটার মার্কস পাওয়া যায়।

- যাহোক, এস.এস.সি. পাশ করার পর কলেজ, তারপর ইউনিভার্সিটি, তারপর প্রফেশনাল লাইফ, তারপর বিয়ে-শাদী ঘর-সংসার। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এস.এস.সি.র পর থেকে শুরু করে বাকী জীবনের অংশটুকুতে ইসলামিক এডুকেশনের কোন ব্যবস্থা নেই। যে কুরআন guideline for whole mankind বাকী জীবনে সেই কুরআনিক শিক্ষার কোন ছিটাফোঁটাও নেই। তাহলে আমরা আমাদের জীবন পরিচালনা করছি কীভাবে? তাহলে কি আল্লাহর দেয়া জীবনবিধান ছাড়াই জীবন পরিচালনা করে যাচ্ছি? কিন্তু রসূল ﷺ বলেছেন ঃ দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেকটি মুসলিম নরনারীর জন্য ফরয। (ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)

- আবার যারা ইসলামিক স্টাডিস বা ইসলামিক হিস্ট্রিতে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি এবং পাশ করছি তাদের বেশীরভাগই এই বিষয় বেছে নিয়েছি কারণ ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষায় অন্য কোন ভাল বিষয়ে চান্স পাইনি বলে। তার মানে এই বিষয়ে পড়ছি ইসলামকে জানার জন্যে নয়, একরকম মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং শুধু মাত্র ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি অর্জনের জন্য। আমাদের পরিচিত একজন শিক্ষিকার ঘটনা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষণীয় হিসেবে তুলে ধরা যাক। তিনি ঢাকার প্রাণ কেন্দ্রের একটি কলেজের ইসলামিক স্টাডিসের প্রফেসর। আমরা তার বাসায় প্রায়ই বেড়াতে যেতাম। তাকে দেখতাম তিনি আমাদের সাথে গল্প করছেন আর ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার খাতা কাটছেন এবং নম্বর দিচ্ছেন। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা না পড়েই একটা করে পাতা উল্টাচ্ছেন আর খাতায় দাগ দিচ্ছেন। এভাবে তিনি একের পর এক খাতা দেখে যাচ্ছেন আর আমাদের সাথে গল্প করছেন। আমরা তাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে তিনি তো লেখা না পড়েই নম্বর দিচ্ছেন। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে ইসলামিক স্টাডিস বা ইসলামিক হিস্ট্রির খাতা এভাবেই দেখতে হয়, কোন পড়ার প্রয়োজন হয় না আর এই বিষয়ের খাতা সব examiner-রাই এভাবে দেখে থাকেন, এটাই নিয়ম।

- **বাস্তবতা** ঃ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে আমরা আমাদের মূল শিক্ষা জীবনে ইসলামের উপর একাডেমিক কোন শিক্ষা পাচ্ছি না। এদিক সেদিক থেকে বা কোন হুজুর থেকে কিছু সূরা-কারাত পড়েছি, দেখাদেখি ওযু-সলাত শিখেছি, অনেকে হয়তো ছোট বেলায় কায়দা পড়েছি, তারপর কুরআন তিলাওয়াত করতে পারি। এই হলো আমাদের ইসলামের উপর সত্যিকার জ্ঞান। আরো যারা একটু আগ্রহী তারা ইন্টারনেট থেকে মাঝে মধ্যে দু একটা ইসলামিক ভিডিও দেখি বা এক দুই পাতা আর্টিক্যাল পড়ি বা কোন ইসলামিক সেমিনার বা ওয়াজ মাহফিলে যাই। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে একটা বিষয়কে ভালভাবে জানার জন্য ধারাবাহিকভাবে কোন সিলেবাসভিত্তিক পড়াশোনা নেই। কিন্তু প্রফেশনাল লাইফে একটা বিষয়কে ভালভাবে জানার জন্য এবং আরো উন্নতির জন্য নানারকম শর্টকোর্স বা লংকোর্স করছি। যেমন ঃ যিনি আইটি প্রফেশনাল তিনি কোন ইউনিভার্সিটি থেকে এই বিষয়ে মাসটার্স-গ্রাজুয়েশন তো করেছেনই তারপরও আরো ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টের জন্য আপগ্রেড কোর্স করেন, ডিপ্লোমা করেন বা পোষ্ট-গ্রাজুয়েশন করে থাকেন।

- কিন্তু যে ইসলাম আমাদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, যে কুরআন আমাদের জীবন পরিচালনার গাইডলাইন, সেটা জানার জন্য কোন উদ্দ্যোগ কি আমরা নিয়েছি? তাহলে কি আমরা কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান ছাড়াই জীবন চালিয়ে যাচ্ছি? প্রফেশনাল লাইফে যদি একটা বিষয়কে জানার জন্য মাস্টার্স, গ্রাজুয়েশন, শর্টকোর্স, সার্টিফিকেশন কোর্স ইত্যাদি করতে হয় তাহলে আল্লাহর দেয়া জীবনবিধান জানার জন্য মাঝে মধ্যে দুই একটা হাদীস বা দুই একটা ইসলামের বই পড়লেই কি যথেষ্ট? বিষয়টা কি এতোই সহজ? ইসলামকে জানার জন্য মিনিমাম তো একটা সিলেবাস ভিত্তিক পড়াশোনা করা প্রয়োজন। তা না হলে কীভাবে নিজ পরিবারকে গাইড করবো? কীভাবে সন্তানদের প্রশ্নের উত্তর দেবো?

- ইসলামকে জানার জন্য যে গতানুগতিক মাদ্রাসার ডিগ্রি অর্জন করতে হবে তাও বলা হচ্ছে না। কারণ আমাদের দেশের মাদ্রাসার সিলেবাসের মধ্যেও একটা বড় ধরনের গ্যাপ রয়েছে যা পারিবারিক জীবন পরিচালনা থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব নয়। কারণ একজন মাদ্রাসার গ্রাজুয়েট একটি ফাইন্যানসিয়াল ইনিষ্টিটিউট চালাতে পারবেন না, তিনি একটি মালটিন্যাশনাল কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হতে পারবেন না বা তিনি প্লেন চালাতে পারবেন না বা তিনি ডাক্তারী করতে পারবেন না বা তিনি আর্কিটেক্চারাল ডিজাইন করতে পারবেন না অর্থাৎ মাদ্রাসা গ্রাজুয়েটরা দেশ পরিচালনার জন্য এডমিনিস্ট্রেশনে আসতে পারবেন না। আবার যারা এডমিনিষ্ট্রেশনে আছেন তারা নিজ পিতা বা মাতা মারা গেলে নিজে তাদের জানাযার সলাত পড়াতে পারবেন না, এমনকি কবরে লাশ নামানোর সময় কী বলতে হবে তাও জানবেন না। তাই এই দুই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই একটা বড় ধরনের গ্যাপ রয়েছে। আমাদের প্রয়োজন এই দুই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সমন্নয় সাধন। যেমন ঃ একজন থানার ওসি সলাতের ওয়াক্ত হলে থানার সকলকে নিয়ে ইমামতি করে জামাতের সাথে সলাত আদায় করবেন। বা একজন এমপি তার এলাকায় জুমার সলাতের খুতবা দিবেন এবং সলাত পড়াবেন।

ইবাদত সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকা

- আমরা অনেকেই মনে করি যে শুধু নামায-রোযা-হাজ্জ-যাকাতই ইবাদত। এর বাইরে আর কোন ইবাদত নেই।

- আসলে ইসলামের দৃষ্টিতে একজন মুসলিমের প্রতিটি কাজই ইবাদত যদি তা আল্লাহ ও তার রসূল ﷺ -এর নিয়ম অনুসারে করা হয়।

- একজন মুসলিমের সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতে ঘুমাতে যাওয়াসহ প্রতিটি স্টেপই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যদি তা ইসলামী নিয়মানুসারে হয়, আর একেই বলে Islamic way of life বা ইসলামী জীবন পদ্ধতি।

হুজুরদের স্বরণাপন্ন হওয়া

- ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে যখন সাভারের রানা প্লাজা (কয়েকটি গার্মেন্স) ধ্বসে পরলো, আমরা সবাই জানি ঘটনা। শতশত লোক ধ্বংসস্তুপের নিচে চাপা পরে রয়েছে এবং আর্মিরা খুবই আন্তরিকতার সহিত উদ্ধার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকেই ধ্বংসস্তুপের নিচে চাপা পরে মারাও গেছে। আমরা টিভিতে দেখেছি যে, মৃতদের আত্মার মাগফিরাতের জন্য ধ্বংসস্তুপের পাশেই আর্মিরা প্যান্ডেল করে দিয়েছেন এবং হুজুর ভাড়া করে এনে মাইকে কুরআন তিলাওয়াতের ব্যবস্থা করেছেন। হুজুররা সুর করে কুরআন তিলাওয়াত করে ডেডবডিদেরকে শুনাচ্ছেন! অথচ কুরআনে একটি আয়াতও নেই ডেডবডির জন্য।

- চিন্তা করার বিষয় যে, আমরা জানি আর্মি অফিসাররা হচ্ছেন একটি ভাল লেভেলের মেধাবি শিক্ষিত শ্রেণী। যারা পৃথিবীর যেকোন দুর্যোর্গ মোকাবেলা করার জন্য ক্ষমতা রাখেন, এমনকি একেকজন আর্মি অফিসার দেশের প্রধান হওয়ার মতোও যোগ্যতা রাখেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো এখানেও তাদের ইসলামিক নলেজের দুর্বলতা, তারা এতো যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া সত্বেও হয়তো এই বিষয়ে কোন হুজুরের স্বরণাপন্ন হয়েছেন যে মৃতদের জন্য কী করা যেতে পারে। তাই তারা যা ইসলামে নেই তা মৃতদের মাগফিরাতের জন্য করছেন।

সলাতে (নামাযে) কী পড়ি তা না বুঝা

- আমরা দৈনিক ১৭ রাক'আত ফরয সলাত এবং ১২ রাক'আত সুন্নাত সলাত আদায় করি। কিন্তু খুব কম লোকই অর্থ বুঝে সলাত আদায় করি। আমরা জানি না যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সলাতের মধ্যে কী বলছি, কী পড়ছি! রুকুতে "সুবহানা রব্বিআল আজিম" মানে কী? সিজদায় "সুবহানা

রব্বিআল আলা" মানে কী? তা জানি না। সলাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে কী কথোপোকথোন হচ্ছে তা জানি না। আল্লাহর কাছে কী চাচ্ছি তা নিজেই জানি না। অথচ আমরা সলাত আদায় করছি। যেসব কথার অর্থই জানা নেই, সেসব কথা যত ভালোই হোক না কেন তার কোন আসর আমাদের চরিত্রে আসবে কি করে?

ইসলামী নিয়মের অপব্যবহার

- আমাদের ইসলামের বুঝ বা understanding-টা এমন যে, রাস্তায় দেখা যায় বৃদ্ধা মা বোরকা পরে যাচ্ছে আর তার পাশে তার ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া যুবতী মেয়ে বেপর্দা হয়ে তার সাথে চলছে। দেখে মনে হচ্ছে যে ইসলাম পর্দার ব্যবস্থা করেছে বৃদ্ধাদের জন্য, আর যুবতীদের জন্য পর্দা নয়, তারা পর্দা করবে বৃদ্ধা হলে।

- আমাদের দেশের মুসলিমগণ সাধারণত হাজ্জ পালন করে থাকেন বৃদ্ধ বয়সে। নামায-রোযা যেমন প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরয, তেমনি হাজ্জও প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরয যদি আর্থিক ও দৈহিক সামর্থ্য থাকে। যখন সামর্থ হবে হাজ্জও তখনই ফরয হবে। বেশীরভাগ সময় দেখা যায় যে আর্থিক স্বচ্ছলতা বা দৈহিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমরা হাজ্জে না গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি বৃদ্ধ বয়সের জন্য, রিটায়ার্মেন্টের জন্য।

- একইভাবে আমাদের দেশে মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় এবং দাড়ি রাখা, তাও রেখে দেই বৃদ্ধ বয়সের জন্য, রিটায়ার্মেন্টের জন্য। ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী জামাতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় এবং দাড়ি রাখার সাথে বৃদ্ধ-যুবক কোন বিষয় নেই, অথচ এ দুটোই ওয়াজিব।

- রসূল ﷺ বলেছেন, হাশরের ময়দানে ৫টি প্রশ্নের উত্তর দেয়া না পর্যন্ত কোন আদম সন্তানই এক কদমও নড়তে পারবে না। (আত-তিরমিযী)

    ১. তার জীবনকাল সে কোন কাজে অতিবাহিত করেছে?
    ২. যৌবনের শক্তি-সামর্থ্য সে কোন কাজে লাগিয়েছে?
    ৩. কোন উপায়ে সে টাকা-পয়সা উপার্জন করেছে?
    ৪. এবং কোন পথে সে সেই টাকা-পয়সা খরচ করেছে?
    ৫. অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী সে কতটুকু আমল করেছে?

ফরয সলাত (নামায) আদায় না করা

- আমাদের দেশে কোন কলেজ বা ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া ছেলেমেয়ে যদি পাচঁ ওয়াক্ত সলাত আদায় করে, তার উপর কোন ছেলে যদি মসজিদে গিয়ে সলাত আদায় করে তাহলে তো সেই বাবামায়ের দুঃশ্চিন্তার অন্ত নেই ঃ আমার সন্তান এই বয়সে মসজিদে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করে কেন? সে কোন জঙ্গিদলের সাথে যোগ দেয়নিতো? আর যদি ছেলে মসজিদে গিয়ে প্রতিদিন ফজরের সলাত আদায় করে থাকে তাহলে তো কোন কথাই নেই! চিন্তা আরো বেশী!

- ইসলামিক ফাউন্ডেশন সারা দেশব্যাপী নামাযের উপর একটি সার্ভে করেছিল, পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে বাংলাদেশের ৯৮% মুসলিম নামায পড়ে না। অথচ আল্লাহ সূরা আনকাবুতের ৪৫ নং আয়াতে বলছেন "নিশ্চয়ই সলাত মানুষকে সমস্ত পাপকাজ ও অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখে"। যে দেশের ৯৮% মুসলিম নামায পড়ে না তাহলে কিভাবে তারা পাপ কাজ থেকে দূরে থাকবে? পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার হাতিয়ারই তো তারা ব্যবহার করে না।

- ইসলামের শারীআত অনুসারে ৭ বছর বয়স থেকে সলাতের অভ্যেস গড়ে তুলতে হয়। রসূল ﷺ বলেছেন ঃ "সাত বছর বয়স হলে তোমাদের সন্তানদের সলাত আদায়ের নির্দেশ দাও এবং দশ বছর বয়স হওয়ার পর এজন্য তাদের প্রতি কঠোর হয় এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।" (আবু দাউদ)

- সন্তানদের পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের ব্যাপারে নিজ ঘরে একটি সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলতে পারিনি। ছোট ছোট সন্তানদের নিয়ে পিতা, ভাই, মামা, চাচা ইত্যাদি পরিবারের পুরুষরা সলাত আদায়ের জন্য মসজিদে যাওয়ার অভ্যেস করিনি। সন্তানদের এ ব্যাপারে উৎসাহিত করিনি।

- যদি ছোট বাচ্চারা সলাতের জন্য মসজিদে যায় তাহলে দেখা গেছে যে, বড়রা তাদেরকে সাথে নিয়ে এক কাতারে দাঁড়ান না, তাদেরকে পিছনে ঠেলে দেয়া হয়। এমনকি মসজিদের মুয়াজ্জিন বা ইমাম সাহেব ও ছোট বাচ্চাদের মসজিদে দেখলে একরকম বিরক্তই হন। অথচ রসূল ﷺ যখন সলাতে সিজদায় যেতেন তখন তাঁর দুই নাতি তাঁর ঘাড়ের উপরে উঠে খেলা করতো।

- নফল সলাতের প্রতি গুরুত্ব দেয়া। যেমন সারারাত ধরে শবে বরাতে নফল ইবাদত করা হয় কিন্তু দেখা গেছে যে ফজরের ফরয সলাত আদায় না করেই সে ঘুমিয়ে পড়েছে। নফলের উদ্দেশ্যে ফরয ত্যাগ!

জুমা'র খুৎবা থেকে কোন শিক্ষাগ্রহণ না করা

- জুমা'র সলাতের প্রতিটি খুৎবা হওয়া উচিত একেকটা শিক্ষণীয় বিষয়। মুসল্লিরা জুমা'র সলাত শেষে ঘরে ফিরবে ইসলামী শিক্ষা নিয়ে। প্রতি সপ্তাহে খুৎবা শুনে মুসলিমদের ঈমান হবে মজবুত। কিন্তু আমাদের দেশে বাস্তাবে তার উল্টো, প্রতি সপ্তাহে গতানুগতিক খুৎবা শুনে কেউই তেমন কিছু একটা শিখে না। এছাড়া খুৎবা আরবী ভাষায় হওয়াতে সবাই বসে বসে ঝিমায়। ছেলেরা একে অপরে গল্প করে সময় কাটায়। অথচ খুৎবা মাতৃভাষায় অথবা মুসল্লীদের বোধগম্য ভাষাতেই দেয়া উচিৎ।

- আর একটা সমস্যা হচ্ছে যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ মসজিদগুলোতে মহিলাদের জন্য কোন সলাতের ব্যবস্থা নেই। মহিলারা এমনকি খুৎবা শোনার জন্য জুমা'র সলাতেও মসজিদে যেতে পারেন না।

- ইউরোপ আমেরিকার মসজিদগুলো হচ্ছে একেকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখান থেকে ছেলেমেয়েরা নিয়মিত Moral Education-এ শিক্ষাগ্রহণ করে থাকে। এখানে জুমা'র সলাতের খুৎবাগুলো আরবীতে না দিয়ে ইংরেজীতে দেয়া হয় যাতে সবাই বুঝে এবং সেখান থেকে ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্য শিক্ষাগ্রহণ করে।

মসজিদ ফ্যাসিলিটির সঠিক ব্যবহার না করা

- আমাদের দেশে কোটি কোটি টাকা খরচ করে মসজিদ বানানো হয় কিন্তু তার কোন সঠিক ব্যবহার নেই। অমুসলিম দেশ যেমন ঃ ইউরোপ-আমেরিকা-ক্যানাডা-অস্ট্রেলিয়া থেকে আমরা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারি। এখানে প্রায় প্রতিটি এলাকাতেই মুসলিমদের জন্য মসজিদ রয়েছে। এই মসজিদগুলো আমাদের দেশের মসজিদের মতো পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের পর তালা দিয়ে রাখা হয় না। এই মসজিদগুলোতে শুধু পাঁচ ওয়াক্ত সলাতই হয় না এছাড়া রয়েছে নানা রকম কমিউনিটি সার্ভিসেস। একেকটা মসজিদ একেকটা কমিউনিটি সেন্টারও বটে। যেমন ঃ এখানে বিয়ে-সাদী হয়,

বিয়ের অনুষ্ঠান হয়, আকীকা হয়, কনফারেন্স হয়, সেমিনার হয়, ওয়ার্কশপ হয়। এখানকার ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া উচ্চ শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা ছোটবেলা থেকেই মানসিকভাবে গড়ে উঠে যে মসজিদ হচ্ছে সবচেয়ে উন্নত স্থান। বিয়ের সময় তারা মনে করে না যে তাদের বিয়ে কোন আধুনিক কমিউনিটি সেন্টার বা হোটেলে হচ্ছে না কেন! বিয়ে ছাড়াও কমিউনিটির অন্যান্য প্রোগ্রামও মসজিদগুলোতে নিয়মিত হয়। প্রায় সকল মুসলিম পরিবারগুলোই এই মসজিদগুলোর সাথে নিয়মিত সংস্পর্শে থাকে।

- ইউরোপ-আমেরিকা-ক্যানাডা-অস্ট্রেলিয়ার একেকটা মসজিদ একেকটা ইনস্টিটিউট অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বটে। প্রায় প্রতিটি মসজিদের সাথেই রয়েছে অত্যাধুনিক ইংলিশ-আরবী মিডিয়াম স্কুল। এই স্কুলগুলো আমাদের দেশের গতানুগতিক মাদ্রাসার মতো নয়। এখান থেকে ছেলেমেয়েরা একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি কুরআন-সুন্নাহর নৈতিক শিক্ষাও গ্রহণ করে থাকে। একটি ছেলে বা মেয়ে আল-কুরআনে হাফিজও হয় আবার তার পাশাপাশি একজন সফল ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারও হয়। এই ধরণের ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারাই মসজিদগুলোতে ইমামতি করেন, জুম্মার খুতবা দেন।

- এখানকার মসজিদগুলোতে ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা আলাদা নানারকম রিক্রিয়েশনের ব্যবস্থা থাকে। যেমন ঃ মুসলিম বাবা-মায়েরা বিকেলে এবং বন্ধের দিনগুলোতে সন্তানদের নিয়ে মসজিদে চলে যান। সেখানে ছেলেরা আলাদা এবং মেয়েরা আলাদা টেবিল টেনিস, বাসকেট বল, ব্যাডমিন্টন, ফুটবল, হকি ইত্যাদি খেলে সময় কাটায়। এছাড়া রয়েছে কম্পিউটার ও ইন্টার্নেট ফ্যাসিলিটি।

- প্রতিটি মসজিদে রয়েছে মহিলাদের জন্য সলাতের খুব ভাল ব্যবস্থা। পিতা-মাতারা সন্তানদের সাথে নিয়ে পুরো পরিবারসহ মসজিদে গিয়ে সলাত আদায় করেন। অনেক মহিলারাই ওয়াক্তের সলাত, জুমু'আর সলাত, রমাদানে তারাবীর সলাত এবং রমাদানের শেষ দশদিনে তাহাজ্জুদের সলাত মসজিদে গিয়ে আদায় করেন। বিশেষ করে ইউনিভার্সিটির মুসলিম মেয়েরা শুক্রবারে তাদের ক্লাশের ফাঁকে মসজিদে গিয়ে জুম্মার সলাত আদায় করে আসে। জামাতে সলাতের সময় বড়রা শিশু-কিশোরদেরকে একই লাইনে তাদের সাথে দাঁড় করান, পিছনে ঠেলে দেন না। অনেক মসজিদ থেকেই তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদ সলাত ভিডিও টেলিকাস্ট করা হয়ে থাকে কারণ যে সকল মা-বোনরা এবং বয়স্করা মসজিদে আসতে পারেননি তারা যেন

বাসায় বসে তা উপভোগ করতে পারেন। সবচেয়ে শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, কোন কোন মসজিদে তারাবীর চেয়ে তাহাজ্জুদে মুসল্লি বেশী হয়।

- রসূল ﷺ -এর সময় এই মসজিদই ছিল পার্লামেন্ট, বঙ্গভবন, হাইকোর্ট, সুপ্রিমকোর্ট, সেকরেটারিয়েট এবং সলাতের জায়গা।

ইসলাম পালন করাকে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ভাবা

- ইসলাম সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা এমনই বেড়ে গেছে যে, কোন বাবা-মা/আত্মীয়-স্বজন যদি তাদের কলেজ বা ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া ছেলের পড়ার টেবিলে কোন হাদীসের বই বা কুরআনের এক খন্ড তাফসীর দেখেন তাহলেই তারা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। তারা ভাবেন, আমার ছেলে এই বয়সে কুরআনের তাফসীর বা হাদীস গ্রন্থ পড়ছে কেন? সে কোন জঙ্গি দলের সাথে জড়িয়ে যায়নি তো!

- বাবা-মায়েরা সন্তানদেরকে স্টুডেন্ট লাইফে কুরআন ও হাদীস পড়তে দেন না। তারা মনে করেন, এতে তার স্কুল-কলেজের পড়াশোনা নষ্ট হবে, সময় নষ্ট হবে। তাদের ভয়, হয়তো সে যোগ্য ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়র-ব্যরিষ্টার হতে পারবে না।

- আমাদের এক আত্মীয় তিনি নিজে কুরআন-হাদীস পড়তেন কিন্তু তার কলেজে পড়ুয়া ছেলে মেয়েদের পড়তে দিতেন না, নিজের পড়া হয়ে গেলে ট্রাংকে ভরে রাখতেন। তিনি সন্তানদের বলতেন যে এগুলো এতো অল্প বয়সে পড়া ঠিক না, পড়লে ক্ষতি হতে পারে, জীবন ঐ দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে। এগুলোর ভার এখন বইতে পারবে না। এতে ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টের ক্ষতি হবে। এখন জীবন গড়ার বয়স। তাহলে ভেবে দেখি যে, একজন নিজে কুরআন পড়ছেন অথচ তিনি নিজে এতোটা অজ্ঞ যে তার সন্তানদেরকে সেটা থেকে দূরে রাখছেন।

- পত্র-পত্রিকায় দেখা যায় পুলিশ যখন কোন কারণে একটি মাদ্রাসা তল্লাশি করে তখন পত্রিকাগুলো বিশেষ হাইলাইট করে লিখে কিছু জিহাদী বই পাওয়া গেছে এবং বেশ কিছু কুরআনের কপি জব্দ করা হয়েছে। আজকাল আল্লাহর কিতাব যা আমাদের ভাল থাকার জন্য গাইড বুক হিসেবে আল্লাহ তা'আলা পাঠিয়েছেন তাও আমরা আইনের লোকেরা অফেন্স মনে করে তা জব্দ করছি!

- জিহাদ শব্দটা তো আজ শুধু অমুসলিম নয় মুসলিমদের নিকটও জঘন্য ঘৃণায় পরিণত হয়েছে। অথচ জিহাদ কুরআনেরই একটি শব্দ যার অর্থ প্রচেষ্টা (কোন ভাল কাজে সাফল্যের জন্য প্রচেষ্টা)। আর আমরা মিডিয়ার বুদ্ধিজীবীরা তাকে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বানিয়েছি সন্ত্রাস, মারামারী, কাটাকাটি, বোমাবাজি বা Holy war!

আলেমদের নিয়ে ভুল ধারণা

- অনেকের অভিযোগ আলেমরা কেন রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলবে? দেশ নিয়ে ভাবার অধিকার আলেমদের কে দিল? আমরা যদি ইতিহাস দেখি, দেশ ও ধর্মের পক্ষে কথা বলার জন্য মুসলিমরা কারো কাছ থেকে অনুমতি নেয় না। এটা তার ঈমানী দায়বদ্ধতা। সে দায়বদ্ধতা থেকেই শুরু হয় যালিম শাসকের বিরুদ্ধে ঈমানদারের প্রতিবাদ। যে মু'মিনের জীবনে যুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নেই, তার অন্তরে কোন ঈমানই নেই। এজন্যই প্রাথমিক কালের মুসলিমদের প্রত্যেকেই ছিলেন মুজাহিদ। প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে শহীদের জন্ম হয়েছে। মু'মিনের দায়বদ্ধতা শুধু ইসলামের পক্ষে কথা বলা নয়, বরং যালিমের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রাম করা। অন্যায়ের প্রতিবাদে যালিমের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে কেউ যদি সামান্যতম অবহেলা করে তাহলে সে ব্যক্তি আর মুসলিম থাকে না। প্রকৃত মুসলিম তাই শুধু নামায-রোযা বা হাজ্জ-যাকাত পালন করে না। বরং ইসলামের বিপক্ষ শক্তির পূর্ণ পরাজয় ও ইসলামের শরিয়তি হুকুমের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার কাজে জান-মালেরও পূর্ণ বিনিয়োগ করে। এই আপোষহীন প্রচেষ্টার মাধ্যমেই তাঁর ঈমানী পরিচয় পাওয়া যায়।

- অনেকেই ইমামদের রাজনৈতিক বয়ান বা ভাষণেও আপত্তি তোলেন। তাদের দাবী হলো দেশের সমস্ত খারাপ লোক (ঘুষখোর, মদখোর, সুদখোর, ব্যাভিচারি, বিদেশের দালাল) রাজনীতি করতে পারবে, কিন্তু ইসলামের স্তম্ভ মসজিদের ইমামের রাজনীতি করার কোন অধিকার থাকতে পারে না।

- অথচ ইসলামের মহান নাবী ﷺ শুধু নামায-কালাম, হাজ্জ-যাকাত শিখিয়ে যাননি, তিনি রাজনীতি, প্রশাসন, সমাজনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, আইন-আদালত, ব্যবসা-বানিজ্য, পররাষ্ট্রনীতি ও সমরনীতি শিখিয়ে গেছেন। তিনি মানবজাতির জন্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ - কুরআনের ভাষায় 'উসওয়াতুন হাসানা'। তিনি মহান আল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী অনুকরণীয়

আদর্শ রেখে গেছেন কর্মজীবনের প্রতিটি অঙ্গনে। সেটি না হলে তাঁর নবুয়তই অপূর্ণাঙ্গ থেকে যেত। তাছাড়া জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তিনি যদি কোন আদর্শই রেখে না যান তবে তিনি কি উসওয়াতুন হাসানা তথা সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হওয়ার মর্যাদা রাখেন? মু'মিনের দায়িত্ব হলো তাঁর জীবনের পথচলার প্রতি কর্মে নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর আদর্শ খোঁজা এবং তা অনুসরণ করা। মদীনার ১০ বছরের জীবনের তিনি ছিলেন পুরাপুরি একজন রাষ্ট্রনায়ক। ছিলেন প্রশাসক ও জেনারেল। ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি। বহুমুখী সে কাজের জন্য কি তাঁর কোন সেনা নিবাস, সেক্রেটারিয়েট, থানা-পুলিশ বা কোর্ট বিল্ডিং ছিল? সবকিছুর কেন্দ্র ছিল মসজিদে নববী।

মৃতব্যক্তিকে নিয়ে নানা রকম কান্ড

- অনেকে জীবিত অবস্থায় ঠিক মতো ধর্ম-কর্ম পালন করেন না, বরং ধর্ম-কর্ম নিয়ে নানারকম বিপরীত লেখালেখি করেন, নানারকম আজেবাজে মন্তব্য করেন। যে নাকি জীবিত অবস্থায় এক ওয়াক্তও নামায পড়তো না কিন্তু দেখা যায় যে তার মৃত্যুর পর তার ভক্তরা এবং তার আত্মীয়-স্বজনরা তার জানাজার নামায নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায়, তাকে মসজিদের পাশে কবর দেয়ার জন্য হৈ-হুল্লা করে।

- মৃত ব্যক্তির মৃতদেহ কবরে রাখার সময় আমরা বলি "*বিসমিল্লাহি ওয়া 'আলা সুন্নাতি রসূলিল্লাহি*" অর্থ ঃ (আমরা এই মৃতদেহ) আল্লাহর নামে এবং রসূল ﷺ -এর আদর্শের উপর রাখছি। অথচ এই লোকটি জীবিত থাকা অবস্থায় সারাজীবন আল্লাহর বিরোধীতা করেছে, ইসলামের বিরোধীতা করেছে, রসূল ﷺ -এর আদর্শের বিরোধীতা করেছে। তার মৃত্যুর পর আমরা তার লাশকে কবরের মধ্যে রেখে যাচ্ছি আল্লাহ এবং রসূল ﷺ -এর আদর্শের উপর। বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখার।

মৃত্যুর পর ইসলামের অধিক ব্যবহার

- আমাদের দেশের অবস্থা দেখে মনে হয় মানুষের মৃত্যুর পরই ইসলামের ব্যবহার বেশী হয়, যদিও ইসলাম এসেছে জীবিতদের জন্য। মৃতদের ঘিরে

আমরা যেসকল কাজগুলো করি এর মধ্যে আবার অনেক কাজই ইসলামের অংশ নয়। যেমন ঃ

- কোন আত্মীয় মারা গেলে হুজুর ভাড়া করে এনে নানা রকম খতম পড়ানো যেমন ঃ জালালী খতম, সবীনা খতম ইত্যাদি। বা কেউ মৃত্যুশয্যায় থাকলে তার শিয়রে বসে সূরা ইয়াসিন পড়া, অনেকে মিলে সোয়া লক্ষবার খতমে ইউনুস পড়া, খতমে খাজেকান পড়া।

- তারপর লাশ কাফন-দাফন করানো, টুপি না থাকলেও পকেটের রুমাল মাথায় বেধে টুপির কাজ চালিয়ে নেয়া। তারপর আগরবাতি, মোমবাতি এবং ফুল নিয়ে কবরস্থানে যাওয়া। কবরে সুন্দর করে বেড়া দেয়া ইত্যাদি।

- মৃতবাড়ির লোকজন কিছুদিন নামায পড়া, নফল রোযা রাখা, গরীব মিসকিনদের খাওয়ানো, দান-খয়রাত করা, মহিলারা কিছুদিন মাথায় গোমটা দেয়া, পুরুষরা কিছুদিন পাঞ্জাবী-পায়জামা ব্যবহার করা, মাঝে মাঝে মসজিদে গিয়ে জামাতে নামায পড়া, তছবি হাতে রাখা, সিডি-ডিভিডিতে কুরআন তিলাওয়াত বাজানো, কিছুদিন টিভিতে নাচ-গান-নাটক না দেখা বা কম দেখা, হাসি-তামাসা কম করা ইত্যাদি।

- তিনদিনের দিন গরু-ছাগল জবাই দিয়ে শতশত লোক দাওয়াত দিয়ে কুলখানি করা। তারপর একইভাবে চল্লিশ দিনের দিন চেহলাম বা চল্লিশা করা।

- তারপর প্রতি বছর বছর শতশত লোক দাওয়াত দিয়ে অনুষ্ঠান করে মৃতব্যক্তির স্মরণে মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা।

- তারপর শ্বেত পাথর, মাবেল পাথর বা টাইলস দিয়ে কবরকে বাঁধাই করা। মাঝে মাঝে কিছু হুজুর ভাড়া করে নিয়ে গিয়ে কবরের কাছে কুরআন তিলালাওয়াত করানো এবং দু'আ-দুরুদ পড়ানো।

- কুরআনে একটি আয়াতও নেই মৃত মানুষের জন্য। যা আছে সব জীবিতদের জন্য। অথচ আমরা কুরআন তিলাওয়াত করে শুনাচ্ছি ডেডবডিকে। ডেডবডিকে শুনাচ্ছি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ যা প্রয়োজন ছিল জীবিত অবস্থায়।

অন্যান্য ফরয হুকুম ঠিক মতো পালন না করা

- মুসলিমদের ঠিক মতো যাকাত না দেয়া, রমাদানে ঠিক মতো রোযা (সিয়াম) পালন না করা, হাজ্জের সামর্থ্য থাকা সত্বেও হাজ্জ না করা, সাবালিকা হওয়ার পরও পর্দা না করা, হালাল-হারাম বেছে না চলা, ইসলামের দাওয়াতী কাজ না করা, প্রতিবেশীর হক আদায় না করা, বাবা-মার হক আদায় না করা, গরীব আত্মীয়ের হক আদায় না করা, এতিমের হক আদায় না করা ইত্যাদি ।

ইসলামিক কালচার অনুসরণ না করা

- ইসলামিক কালচার একজন মুসলিমের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তাই ইসলাম মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে এর উপর খুব জোর দিয়েছে। আল্লাহর কুরআন ও রসূল ﷺ -এর হাদীসে এর নানাদিক বর্ণনা করা হয়েছে এবং নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকল মুসলিমকে তা পালন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে কুরআন-হাদীস নির্দেশিত নিয়মগুলো মেনে চলার চর্চা যত অধিক করবে, একজন মুসলিম তত অধিক আল্লাহর প্রিয়পাত্র হতে পারবে। অন্যদিকে এই নিয়মগুলো অবহেলা করলে সে ইসলামের মূল শিক্ষা হতে দূরে সরে যাবে, ফলে আল্লাহর প্রিয় সে হতে পারবে না। এটা একটা সুস্পষ্ট ক্ষতি বটে। অথচ আমাদের দেশে খুব কম পরিবারই পাওয়া যাবে যেখানে ইসলামিক কালচাবের প্রচলন রয়েছে। ইসলামিক কালচারের মধ্যে রয়েছে যেমন ঃ

    ১. নাবী মুহাম্মাদের নাম মুখে বললে অথবা অন্য কাউকে বলতে শুনলে "সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম" (তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) বলা। এটা একটা দু'আ রসূলের জন্যে। তাঁর সহীহ হাদীস মেনে চলা অতি জরুরী ।

    ২. অন্য সব নাবীদের নাম নিলে "আলাইহিস সালাম"(তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলা ।

    ৩. সাহাবীদের কারো নাম মুখে বললে পুরুষ হলে "রাদিআল্লাহু আনহু" বলা এবং নারী হলে "রাদিআল্লাহু আনহা" (আল্লাহ তাদের উপর রাজী হোন) বলা ।

৪. কিছু করার শুরুতে "বিসমিল্লাহ" (আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি) বলা। এবং নিজ বাসায় ঢুকার সময়ও বিসমিল্লাহ বলে ঢুকা।

৫. কোন সুসংবাদ শুনলে অথবা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে "আলহামদুলিল্লাহ" (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর) অথবা "মাশা-আল্লাহ" (আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন) বলা। আল্লাহর দেয়া সব নিয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ঘনঘন 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা।

৬. কেউ বিদায় নেয়ার কালে পরস্পর সালাম বিনিময় করে বিদায় নেয়া।

৭. আশ্চর্যজনক কিছু শুনলে অথবা প্রশংসা করতে চাইলে "সুবহান আল্লাহ" (আল্লাহ অতি পবিত্র ও মহান) বলা।

৮. কাউকে কিছুর জন্যে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানাতে হলে "জাযাকাল্লাহু খাইরান" (আল্লাহ তোমাকে উত্তম পুরষ্কার/বিনিময় দিন) বলা।

৯. কোন সমস্যায় পড়লে "তাওয়াক্কালুল্লাহ" (আমি আল্লাহর উপর নির্ভর করি) বলা।

১০. হাঁচি দিলে "আলহামদুলিল্লাহ" (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য) বলা।

১১. অন্য কেউ হাঁচি দিতে শুনলে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" (আল্লাহ তোমার উপর রহমত করুন) বলা।

১২. কোন খারাপ কাজ করে ফেললে অথবা কোন নোংরা/আপত্তিকর কিছু হতে দেখলে অথবা তেমন সংবাদ শুনলে "আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ" (হে আল্লাহ! তোমার কাছে ক্ষমা চাই) বলা।

১৩. ঘৃণা প্রকাশ করতে হলে "নাউজুবিল্লাহ" (আমি আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি) বলা।

সালামের সঠিক ব্যবহার না করা

- আমাদের দেশে দেখা যায় যে, কোন অপরিচিত লোক কাউকে রাস্তা-ঘাটে সালাম দিলে ঐ ব্যক্তি সালামের উত্তর না দিয়ে সর্বপ্রথমে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন যে "ভাই আপনাকে তো চিনলাম না"! আমাদের আচরণ দেখে মনে হচ্ছে সালাম শুধু দিবে চেনা লোককে। অথচ রসূল ﷺ -এর প্র্যাকটিস ছিল পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে বেশী বেশী সালাম দেয়া,

কারণ সালাম হচ্ছে একে অপরের জন্য দু'আ। দু'আ করার জন্য পরিচয় জানা জরুরী নয়।

- আবার দেখা যায় যে, অপরিচিত কেউ সালাম দিলে আমরা উত্তর দিতে সংকোচ বোধ করি। তখন মনে হয় যে, লোকটি সালাম দেয় কেন? কোন উদ্দেশ্য আছে নাকি? আমাদের পরিচিত এক মাদ্রাসার শেষ বর্ষের ছাত্র দুঃখ করে বলেছিলেন যে, "আমরা কাউকে সালাম দিলে অপর পক্ষ সালামের উত্তর দিতে উৎসাহবোধ করেন না, হ্যান্ডসেক করতে গড়িমসি করেন। তারা মনে করেন যে এই হুজুর প্রকৃতির লোকটি আবার কোন সাহায্য চাইবে নাতো?"

- সালাম দেয়াটাকে অনেকেই ইসলামিক কালচার মনে করেন না, ভাবেন এটা সৌদি আরবের কালচার। যেমন অনেকে মনে করেন বোরকা পরাও সৌদি আরবের কালচার।

- আমাদের মধ্যে একটি ভুল ধারণা বিদ্যমান আছে যে বড়রা সবসময় ছোটদের থেকে সালাম আশা করেন। যেমন, শিক্ষক আশা করেন ছাত্রদের থেকে, বাবা-মা আশা করেন সন্তানদের থেকে, ইমাম সাহেব আশা করেন মুসল্লিদের থেকে। কিন্তু সালাম হচ্ছে একে অপরের জন্য দু'আ যার অর্থ হচ্ছে "তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।" রসূল ﷺ -কে কখনো কেউ আগে সালাম দিতে পারতেন না এবং তিনি ছোটদেরকেও সালাম দিতেন।

- ভুল সংশোধন ঃ সালামকে বিকৃত করা যাবে না অর্থাৎ "স্লামুয়ালাইকুম" বলা যাবে না, কারণ এই বিকৃত সালামের কোন অর্থ হয় না। তাদেরকে বলতে হবে সম্পূর্ণ সালাম পরিষ্কারভাবে দিতে "আস্সালামু আলাইকুম"।

ইসলাম যা বলে আমরা তার উল্টোটা করি

- **গোপনে দান** ঃ ইসলাম বলে ডান হাত দিয়ে দান করলে বাম হাত যেন না জানে। কিন্তু আমরা চাই সবাই যেন জানে, কোন না কোনভাবে যেন দানটা প্রকাশ পায়।

- **সদাকার প্রকৃত সওয়াব** ঃ দানকারী দান করে মনে করে যে সে গরীবের অনেক উপকার করছে। আসলে গরীব সদাকা গ্রহণ করে সদাকারীর

উপকার করেন। কারণ সদাকা গ্রহণকারী সদাকা গ্রহণ না করলে দানকারী আল্লাহর থেকে পুরষ্কার পেতো না।

- **দানের বিনিময়** ঃ ইসলাম বলে পুরষ্কার যে দান করে তার বিনিময়ে দান গ্রহণকারীর নিকট হতে কোন প্রকার প্রতিদান আশা করা যাবে না। দান হতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য। কিন্তু দান করে দাতা কোন না কোনভাবে দান গ্রহীতার নিকট থেকে প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা, সম্মান ইত্যাদি আশা করে।

- **দান করে খোঁটা না দেয়া** ঃ আল কুরআনের কড়া নির্দেশ হচ্ছে দান করে কাউকে খোঁটা দেয়া যাবে না। যেমন, তোমাকে তো আমি অনেক দিয়েছি, তোমার জন্য তো আমি অনেক করেছি। কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা গরীব আত্মীয়-স্বজনকে দান করে আবার খোঁটা দেই, তাদেরকে দানের কথা মনে করিয়ে দেই। এতে দানের ফযিলত বরকত নষ্ট হয়ে যায়।

- **হাজ্জ ফরয হিসেবে আদায়** ঃ সলাত-সিয়াম-যাকাতের মতো হাজ্জও একটি ফরয ইবাদত, সামর্থ্যবানদের জন্য এটি জীবনে একবার ফরয। কিন্তু হাজ্জ আদায় করার পর কোন না কোন ভাবে আমরা চাই লোকে আমাকে এখন আগের চেয়ে বেশী সম্মান করুক, বেশী পরহেজগার মনে করুক বা হাজী সাহেব বলে ডাকুক।

- **কুরবানী হতে হবে শুধু মাত্র আল্লাহর জন্য** ঃ পশু কুরবানী করতে হবে একমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য। মানুষকে দেখানোর জন্য এটা করা যাবে না। অনেকেই কুরবানী ঈদে কুরবানী নিয়ে এক প্রকার প্রতিযোগিতায় করেন, কে কত বড় গরু কুরবানী দিচ্ছে! কে কয়টি গরু কুরবানী দিচ্ছে! আমাদের সন্তানরা ছোট বেলা থেকে দেখছে কুরবানীর এই প্রতিযোগিতা এবং এভাবেই তারা এই ইবাদতটাকে পালন করতে দেখে আসছে।

- **বাবা-মায়ের প্রতি দায়িত্ব** ঃ বাবা-মা বৃদ্ধ হয়ে গেলে তাদেরকে এতো বেশী করে যত্ন করতে হবে যে তারা যেন উহ্ শব্দটিও না বলতে পারেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় বাবা-মা বৃদ্ধ হয়ে গেলে তাদেরকে আমরা বোঝা মনে করি। সন্তানরা সবাই মিলে বৃদ্ধ বাবা-মাকে নিয়ে ঠেলা-ঠেলি করি যে কার কাছে থাকবে। আমাদের সন্তানরা দেখছে তাদের বাবা-মায়েরা তাদের দাদা-দাদী নানা-নানীদের সাথে কিরূপ আচরণ করছে। আর তাই একসময় আমাদের সন্তানরাও বড় হয়ে আমাদের সাথে সেরূপ আচরণ করে।

- **গীবত করা** ঃ গীবত করা একটি কবীরা গুনাহ এবং গীবত করা নিজ মরা ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সমতুল্য। অথচ অন্যের গীবত করতে আমাদের খুবই মজা লাগে। যে কোন আড্ডায় অনুপস্থিত কোন ভাই বা বোনকে নিয়ে সমালোচনা করতে খুবই আনন্দ উপভোগ করি।

- **হিংসা করা** ঃ হিংসা করা কবীরা গুনাহ এবং যার অন্তরে তিল পরিমান হিংসা থাকবে সে জান্নাতে যেতে পারবে না। কিন্তু বাস্তবে অন্যের ভাল দেখলে সহ্য করতে পারি না। কেউ বাড়ি কিনলে, গাড়ী কিনলে, ভাল চাকুরী পেলে, সন্তানদের পরীক্ষায় ভাল রিজাল্ট দেখলে হিংসায় মরে যাই।

- **অন্যের প্রশংসা** ঃ অন্যের ভালোর জন্য দু'আ করতে হয় আরো ভাল করার জন্য প্রশংসা করতে হয়, উৎসাহ দিতে হয়। কিন্তু বাস্তবে অন্যের প্রশংসা শুনতেই পারি না, গা জ্বালা-পোড়া করে।

- **ভালটি অন্যের জন্য** ঃ ইসলাম বলে নিজের জন্য যা পছন্দ করবে অপর ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে যখন কোন কিছু কিনি তখন নিজের জন্য ভাল ভাল দেখে উৎকৃষ্টটা কিনি আর অপর ভাইয়ের জন্য উপহারস্বরূপ একটু কমদামী দেখে কিনি।

- **সত্য প্রকাশ করা** ঃ ইসলাম বলে সত্য বলা ফরয। কিন্তু বাস্তবে সত্য প্রকাশ করতে আমরা লজ্জা পাই। যেমন, আমি ছোট চাকুরী করি বা আমার ঢাকায় বাড়ি নেই বা আমার ডিগ্রি কম বা আমার শ্বশুর গরীব ইত্যাদি।

- **পর্দা করা ফরয** ঃ সলাত যেমন ফরয তেমনি নারীদের পর্দা করাও ফরয এবং তাদের সাজগোজ, রূপ-সৌন্দর্য্য পর পুরুষ থেকে ঢেকে রাখাও ফরয। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মেয়েরা সাধারণত সাজগোজ করে থাকে অন্যকে দেখানোর জন্য এবং রূপ-সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে কোন অনুষ্ঠানে গেলে। খুব কম মেয়েই আছে যে শুধু স্বামীকে দেখানোর জন্য সাজগোজ করে।

ভুল পন্থায় ঈদ উদযাপন ও রমাদানের পরের চিত্র

আমরা বিদায় জানাচ্ছি মহান রমাদানকে। এই তো বিদায় দিচ্ছি কুরআন তিলাওয়াত, তাকওয়ার অনুশীলন, ধৈর্য, রহমত, মাগফিরাত ও মুক্তি লাভের মুবারক মাসটিকে। তাহলে কি আমরা প্রকৃত তাকওয়া অর্জন করতে পেরেছি? যে ব্যক্তি মুবারক মাসটিতে নিজেকে সংশোধন করতে পারল না সে আর কখন

নিজের জীবন গঠন করবে? মহান রমাদান এমন একটি মাস যাতে এ সময়টিকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগিয়ে আমরা শরিয়ত-পরিপন্থী আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ ও চরিত্র সংশোধন করে নিজেদের আমল ঠিক নিতে পারি। আল্লাহ বলেছেন ঃ *"নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ পর্যন্ত কোন জাতির পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদেরকে পরিবর্তন করে নেয়।" (সূরা রা'দঃ ১১)*

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো আমরা রমাদানে আল্লাহর সাথে যে ওয়াদা করেছি তা ভঙ্গ করার অনেক চিত্রই রমাদান শেষ হওয়ার সাথে সাথে সমাজে ফুটে উঠে। যেমন,

- পুরো রমাদান মাস তারাবীহর (সুন্নত) সলাতে মুসল্লি দ্বারা মসজিদ পরিপূর্ণ থাকার পর অন্য মাসগুলোতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সলাতে মুসল্লির সংখ্যা কমে যায়। তার মানে ফরযের চেয়ে সুন্নাতকে বেশী গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে তাই সুন্নাত সলাতে মসজিদ ভরে যাচ্ছে কিন্তু ফরয পাঁচ ওয়াক্ত সলাতে মাত্র এক-দুই কাতার পূর্ণ হচ্ছে!

- সারা রমাদান মাস তাকওয়া অর্জন করে ঈদ উদযাপন করা হচ্ছে নাচ-গান ও সিনেমা এবং ইসলাম-বিরোধী কর্মকান্ড দিয়ে। ঘরে ঘরে নারীপুরুষের ফ্রী মিক্সিংয়ের মাধ্যমে ঘরোয়া পার্টি দিয়ে।

- টিভি চ্যানেলগুলো সপ্তাহব্যাপী নানারকম অনুষ্ঠান প্রচার করে। এক চ্যানেলের সাথে অপর চ্যানেলের প্রতিযোগিতা, কে কত নাটক-সিনেমা-নাচ-গান, ফ্যাশন শো, ম্যাগাজিন ইত্যাদি দেখাতে পারে। সারা মাস রোযা রেখে চাঁদ রাত থেকেই মুসলিমরা টিভির সামনে রিমোট হাতে বসে যায় অনৈসলামী অনুষ্ঠান দেখতে। অথচ এই সকল টিভি চ্যানেলগুলিই রমাদান মাসে নানা ধরনের ইসলামিক প্রোগ্রাম দেখিয়েছে। সাহরীর সময় কুরআনের তাফসীর শুনিয়েছে, নানা ধরনের প্রশ্ন উত্তর প্রোগ্রাম দেখিয়েছে। এ কেমন double-standard নীতিমালা!

- আমাদের দেশে দেখা যায় রমাদান মাসে জাঁকজমক করে পত্রিকায় এবং টিভিতে বিজ্ঞাপন দেয়া হয় যে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে এবার সারা দেশব্যাপী সিনেমা হলগুলোতে মুক্তি পাচ্ছে নাচেগানে মনমাতানো এবং প্রেমের ছবি। এই হচ্ছে একমাস তাকওয়া অর্জনের পর পবিত্র ঈদের উপহার।

- শুধু রমাদান মাসে পর্দা করা আর রমাদানের পরে ঈদের দিন থেকেই পর্দা ছেড়ে দেয়া। উদাহরণ স্বরূপ দেখা যায় আমাদের দেশে টিভিতে রমাদান মাস এলে মহিলারা খবর পড়ার সময় মাথায় কাপড় দেন আর ঈদের দিন থেকে মাথার কাপড় সরিয়ে নেন।

- এত বড় নিয়ামতের এটাই কি শোকর আদায়, এটাই কি আমল কবুল হওয়ার নিদর্শন? নিশ্চয়ই নয়। বরং এটা আমল কবুল না হওয়ার আলামত। কেননা প্রকৃত সিয়াম পালনকারী ঈদের দিন সিয়াম ছেড়ে দিয়ে আনন্দিত হবে এবং সিয়াম পূর্ণ করার তাওফীক পাওয়ার দরুন তার প্রতিপালকের প্রশংসা করবে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। সাথে সাথে এই ভয়ে কাঁদবে যে, না জানি আমার সিয়াম কবুল হয়নি। আমাদের পূর্বসূরীগণ রমাদানের পর ছয় মাস পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে সিয়াম কবুল হওয়ার দু'আ করতেন। আমল কবুল হওয়ার আলামত হল, পূর্ববর্তী অবস্থার চেয়ে বর্তমান অবস্থা উন্নত হওয়া। সত্যিকার মু'মিন বান্দা সর্বদাই আল্লাহর ইবাদত করবে। কোন নির্দিষ্ট মাস, জায়গা অথবা জাতির সাথে মিলে আমল করবে না।

- রমাদান মাসে আমরা সিয়ামরত অবস্থাতেই শপিং সেন্টারে গিয়ে প্রচুর অপচয়ের প্রতিযোগিতা করি। প্রয়োজনের চাইতে অধিক শপিং করছি। আমাদের সন্তানরাও ছোটবেলা হতেই এভাবে রমাদান মাসের ফযিলত হতে বঞ্চিত হচ্ছে এবং ওরাও বড় হয়ে সেগুলিই করছে যা আমরা করেছি।

অনেক স্কুল-কলেজে মেয়েদের হিযাব ছিনিয়ে নেয়া হয়

- আজকাল দেখা যাচ্ছে অনেক স্কুল-কলেজেই মেয়েদেরকে হিযাব পরতে দেয়া হয় না, বোরকা পরতে দেয়া হয় না। অনেক জায়গায়ই হিযাব পড়ার কারণে স্কুল-কলেজের কর্তৃপক্ষ ছাত্রীদেরকে স্কুল-কলেজ থেকে বের করে দিয়েছেন। এমনও ঘটনা ঘটেছে যে ছাত্রীরা ফুল হাতা জামা পড়ে স্কুলে যাওয়ার কারণে স্কুলের প্রিন্সিপাল ও কর্তৃপক্ষ কেচি দিয়ে ছাত্রীদের জামার হাতা কেটে দিয়েছেন। আমরা জানি যে স্কুল-কলেজ হচ্ছে চরিত্র গঠনের প্রতিষ্ঠান। একটি মুসলিম মেয়ের হিযাব হচ্ছে তার চরিত্রের একটি মূল্যবান অংশ। আর যে স্কুল-কলেজের প্রিন্সিপাল বা শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্রীদের চরিত্রের মূল্যবান অংশ পোশাক খুলে নেয় সেই জায়গাতো চরিত্র গঠনের

জন্য নয় বরং চরিত্র হরণের জায়গা। তাই কুরআন-সুন্নাহ মতে ও ইসলামিক স্কলারদের মতে সেইসকল স্কুল-কলেজে মেয়েদের পড়ানো জায়েজ নেই। সন্তানদেরকে সেই সকল স্কুল-কলেজে পাঠনো ঠিক নয়। হতে পারে তাদের লেখা-পড়ার মান অনেক উন্নত। কিন্তু সন্তানের চরিত্রই যদি চলে যায় তাহলে আর ঐ উন্নতমানের পড়াশোনা দিয়ে কী হবে! যে স্কুল-কলেজ সন্তানদের চরিত্র গঠনের জন্য সহায়তা করে সেখানে পাঠাতে হবে। প্রয়োজনে নিজেদের এই ধরণের আরো অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

- শিক্ষণীয় হিসেবে ভুক্তভুগী একজন ছাত্রীর বক্তব্য তুলে ধরা হলো। আমরা পত্রিকায় দেখেছি যে, ঢাকার উত্তরার একটি স্কুলের কর্তৃপক্ষ হিযাব পরিহিতা মেয়েদেরকে স্কুল থেকে বহিস্কার করে দিয়েছে। স্কুলের কর্তৃপক্ষের অভিযোগ যে মেয়েদেরকে হিযাব পড়তেই হবে কেন? তখন তাদের মধ্য থেকে একটি মেয়ে উত্তরে বলেছিল যে,"যে মহান আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় ফরয করেছেন, তিনিই মেয়েদের জন্য পর্দা বা হিযাব ফরয করেছেন, যার হুকুম পালন করার জন্য আমরা পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করি, তারই হুকুম পালন করার জন্য আমরা হিযাব পরি"। আমরা মুসলিমরা কি আমাদের সন্তানদের এভাবে গড়তে পারছি যেন আমাদের সন্তানরা সত্য কথা বলতে ভয় না পায়। যেভাবে এই মেয়েটি বলেছে?

তরুণদের ভাবনা

- এক তরুণের বক্তব্য। সে তার বন্ধু মহলে আড্ডার মাঝে কুরআন থেকে দু'একটা পয়েন্ট তুলে ধরেছে। এতে অন্যান্য বন্ধুরা মন্তব্য করছে যে, "তোর মাথায় ইসলামের ভূত চেপেছে, ইসলাম তোর ব্রেইন ওয়াশ করে দিয়েছে"। আমরা একটু গভীরে চিন্তা করে দেখি। যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং এই পৃথিবীতে সুখে শান্তিতে থাকার জন্য একটি সুন্দর জীবন বিধান দিয়ে দিয়েছেন আর আমাদের তরুণ সমাজ তাকে বলছে ভূত, তাকে বলছে ব্রেইন ওয়াশ!

- আমাদের তরুণ সমাজ আজকাল ইসলামকে শত্রু ভাবছে। তারা ইসলামকে ভয় পায়। তাদের ধারণা ইসলাম পালন করলে হয়তো জীবনে অনেক কিছুই করা যাবে না। এখন যা ইচ্ছে করছি তা হয়তো আর করা যাবে না।

তারা ইসলামী বই পড়ে মজা পায় না, এছাড়া তারা ইসলামী বই পড়তেও চায় না।

- আমাদের অধিকাংশ ট্রেডিশনাল হুজুররা অনেক সময় ইসলামকে এমনভাবে উপস্থাপন করেন যে, তরুণ সমাজের কাছে তা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তারা সারাক্ষণ নেগেটিভ ওয়াজ করতে থাকেন যে এইটা করা যাবে না... ঐটা করা যাবে না... ইত্যাদি ইত্যাদি। তারা কোন আশার আলো দেখান না। যার কারণে তরুণরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। অধিকাংশ হুজুরদের বক্তব্যের মধ্যে হয়তো কোথাও একটা বড় ধরণের গ্যাপ রয়েছে, যার কারণে কঠিন মনে হয়। আসলে ইসলাম মানুষের জীবনকে কঠিন করার জন্য আসেনি, এসেছে আরো সহজ করার জন্য।

- আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে, ইসলাম Extremism সমর্থন করে না। ইসলাম আত্মঘাতি বোমা হামলা (Suicide bombing) সমর্থন করে না। এগুলো ইসলামের অংশ নয়। কেউ বা কোন দল যদি এই ধরণের সন্ত্রাসীমূলক কর্মকান্ড করে তাহলে বুঝতে হবে যে এর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই, এটা তার বা তাদের নিজস্ব বিষয় এবং এর জন্য সে নিজে দায়ী। এর জন্য তাদেরকে আখিরাতে কঠিন শাস্তির সম্মুখিন হতে হবে। ইসলামের শত্রুরা মিডিয়ার মাধ্যমে এই অপকর্মগুলোকে ইসলামের সাথে সংযুক্ত করে মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নিতে চায়।

মধ্যযুগ বা জাহিলিয়াতের যুগ নিয়ে ভুল বুঝাবুঝি

- প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় এবং টিভি চ্যানেলগুলোতে দেখা যায় যে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা বলেন যে ইসলাম দ্বারা দেশ চালালে দেশ আবার মধ্যযুগে ফিরে যাবে, দেশ আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগে চলে যাবে, দেশ ১৪শ বছর পিছিয়ে যাবে।

- আমাদের কাছে হয়তো এই বিষয়টা পরিষ্কার না যে, আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগ বলতে আসলে কী বুঝায়? এই বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পাওয়ার জন্য আমাদের মুহাম্মাদ ﷺ -এর বিস্তারিত জীবনী পড়া প্রয়োজন। মুহাম্মাদ ﷺ ৪০ বৎসর বয়সে নবুয়ত পেয়েছেন (৬১১ খৃষ্টাব্দে)। নবুয়ত পাওয়ার বছর থেকে শুরু করে মোট ২৩ বছর সময় ধরে কুরআন নাযিল হয়েছে। আল কুরআনের একেকটা আয়াত নাযিল হয়েছে

আর তিনি তা সমাজে বাস্তবায়ন করেছেন। আল কুরআনের এই একেকটা আয়াতই হচ্ছে ইসলাম। পরিপূর্ণ ইসলাম আসার আগ পর্যন্ত সময়টাকে বলা হয় আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগ। আইয়ামে জাহিলিয়াত আরবী শব্দ এর মানে হচ্ছে অজ্ঞতার যুগ। ঐ সময়ে মানুষ ইসলাম বিরোধী সকল কাজ-কর্ম করতো। এখন আমরা নিজেদেরকে নিজে প্রশ্ন করতে পারি যে, ইসলাম সমাজে প্রতিষ্ঠা হলে কিভাবে দেশ আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগে চলে যাবে? ইসলামের মাধ্যমেইতো আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগ পরিবর্তন হয়ে সুস্থ সমাজে ফিরে এসেছে। আল কুরআনের একেকটা আয়াত নাযিল হয়েছে আর জাহিলিয়াতের যুগের একেকটা অন্যায় ও অপকর্ম দূর করা হয়েছে।

- ইসলাম আসার আগ পর্যন্ত সময়টা ছিল আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগ। বরং এখন দেখা যাচ্ছে আমরা মুসলিমরা দিন দিন ইসলাম ত্যাগ করে সমাজকে আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। যেমন একটি বাস্তব উদাহরণ দিলে বিষয়টা আরো পরিস্কার হবে। আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগে মেয়েরা সংক্ষিপ্ত কাপড় পরতো, অশালিন পোশাক পরে পর পুরুষকে আকর্ষণ করতো। এতে পুরুষরাও উত্তেজিত হতো, মেয়েদেরকে রাস্তা-ঘাটে ইভটিজিং (Eve Teasing) করতো, অসম্মান করতো। ইসলাম এসে মেয়েদেরকে সঠিক কাপড় পরিয়েছে, শালিন পোশাক দিয়েছে, বখাটেদের হাত থেকে রক্ষা করে অসম্মান থেকে সম্মান দিয়েছে। আর আজকে এই শতাব্দিতে এসে আমাদের মেয়েরা আবার আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগের ন্যায় সংক্ষিপ্ত কাপড় পরছে, অশালিন পোশাক পরে বাইরে যাচ্ছে আর নিজেরা পরপুরুষের কাছে অসম্মানিত হচ্ছে, সমাজে ইভটিজিংয়ের পরিমান বাড়িয়ে দিচ্ছে, নিজেদের বিপদ ডেকে আনছে।

যাকাতের সঠিক ব্যবহার না করা

- আল্লাহ বলেছেন ঃ তাদের জন্যে দুর্ভোগ যারা যাকাত দেয় না (সূরা হা-মীম সাজদাহ ঃ ৭) বেশীরভাগ মুসলিমই প্রতি বছর হিসাব করে ঠিক মতো যাকাত আদায় করেন না। যাকাত যাতে আদায় না করতে হয় বা যত কম যাকাত দেয়া যায় সে জন্য হুজুরদের কাছে যাওয়া হয় নানা রকম ফতোয়ার জন্যে।

- অনেকেই যাকাত দিয়ে থাকেন কমদামি শাড়ি ও লুঙি। আর এই সকল নিম্নমানের শাড়ি ও লুঙি তৈরীর জন্য এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী ফ্যাক্টরী খুলে বসেছে। তারা এই পণ্যের নামই দিয়েছে যাকাতের শাড়ি ও লুঙি। এতেই সবাই বুঝে যায় যে এই কাপড় সাধারণ লোকদের জন্য না। অথচ মহান আল্লাহ বলছেন তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ করবে তা অপর ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করবে। কিন্তু আমরা করছি তার উল্টো।

- যাকাতের এই কাপড় এতোই নিম্নমানের যে একবার বা দুবার ধোয়া হলেই দফা শেষ। এক শ্রেণীর বড়লোক ঘটা করে প্রচার করে যাকাতের এই নিম্নমানের শাড়ি-লুঙি বিতরণ করতে গিয়ে ভির সামলাতে না পেরে প্রতি বছর অনেক লোক মেরে ফেলেন।

- এই নিম্নমানের কাপড় বিতরণ ইসলাম কখনোই সমর্থন করে না। আর যাকাত প্রদানের সাধারণ নিয়ম হলো কোন ব্যক্তি বা পরিবারকে যাকাতের টাকা দিয়ে এমনভাবে সাবলম্বী করে দেয়া যেন তার আর দ্বিতীয়বার যাকাত নিতে না হয় এবং তিনি যেন পরবর্তীতে অন্যকে যাকাত দিতে পারেন। কিন্তু আমরা যা করছি এতে গরীব গরীব-ই থেকে যাচ্ছে, সমাজের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না।

একটা প্রচলিত ভুল ধারণার অবসান হোক

- আমাদের দ্বীন ইসলামের দাওয়াতী কাজের অংশ হিসেবে আমরা ২০০৭ সালে যাকাতের উপর কুরআন ও সহীহ হাদীসভিত্তিক এবং বাস্তবভিত্তিক একটি authentic বই-এর ৫০০ কপি ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী, প্রতিবেশী ও এলাকাবাসীর মধ্যে ফ্রী বিতরণ করি। সেই হিসেবে আমাদের এলাকার মসজিদের ইমাম সাহেবকেও একটা কপি তার সংগ্রহে রাখার জন্য দেয়া হয়। ইমাম সাহেব বইটি হাতে নিয়েই সর্বপ্রথম জিজ্ঞেস করেন, বইটি কে লিখেছেন? যখন উত্তরে বলা হলো বইটির লেখক সিঙ্গাপুরে বসবাসরত একজন ইঞ্জিনিয়র, তখন ইমাম সাহেব প্রশ্ন করলেন, উনি কি আলেম? উনি কি মাওলানা? উনি ইঞ্জিনিয়র হয়ে ইসলামের উপর বই লিখলেন কিভাবে? যাহোক যাকাতের উপর ঐ বইটি ইমাম সাহেব আর নিলেন না, ফেরত দিয়ে দিলেন।

- এখন প্রশ্ন ঃ 'আলেমের' সংজ্ঞা কী? উত্তরে এক কথায় বলা যায় যার ভেতর 'ইল্‌ম' আছে সেই আলেম। 'ইল্‌ম' অর্থ জ্ঞান এবং 'আলেম' অর্থ জ্ঞানী, আর 'ওলামা' হচ্ছে আলেমের বহুবচন। এই জ্ঞান হতে পারে ইসলামী অথবা নন ইসলামী। ইসলামের পরিভাষায় আরো পরিষ্কার ভাবে বলা যায়, যার ভেতর দ্বীন ইসলামের জ্ঞান আছে তিনি দ্বীনি আলেম। এখন একজন ইঞ্জিনিয়র, ডাক্তার, পাইলট, ব্যাংক ম্যানেজার, ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, ব্যরিষ্টার, এমপি, মিনিষ্টার, থানার ওসি বা একজন বাস ড্রাইভারও দ্বীনি আলেম হতে পারেন যদি তার ভেতর কুরআন ও সহীহ হাদীসভিত্তিক দ্বীন ইসলামের সঠিক জ্ঞান থাকে।

- এখন আসুন আমরা বিশ্লেষণে আসি। কুরআন নাজিলের উদ্দেশ্য কী? কুরআন-হাদীসের মধ্যে আছেটা কী? আমরা জানি কুরআনের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষ। উদাহরণস্বরূপ এই পৃথিবীতে যতো জিনিস তৈরী হচ্ছে, যেমন, রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, ফ্রিজ, গাড়ি, প্লেন, ট্রেন, সেলফোন ইত্যাদি বাজারজাত করার সময় কাম্প্যানী পণ্যের সাথে একটা করে অপারেটিং ম্যানিউয়্যালও দিয়ে দেয়। ঠিক তেমনি, আল্লাহ যখন মানুষকে তৈরী করে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তখনও একটা ম্যানিউয়্যাল সাথে দিয়ে দিয়েছেন, যার ভেতরে আছে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবন কিভাবে পরিচালনা করব। মহান আল্লাহ এতই দয়ালু যে তিনি শুধু ম্যানিউয়্যাল পাঠিয়েই ক্ষান্ত হননি, তিনি আবার সাথে একজন ট্রেনারও পাঠিয়েছেন যিনি ঐ ম্যানিউয়্যালটা তার বাস্তব জীবনে বাস্তবায়ন করে আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, আর সেই ট্রেনার হচ্ছেন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ। এবং সেই ম্যানিউয়্যালটা হচ্ছে আল কুরআন। রসূল ﷺ পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনা পর্যন্ত সবকিছুই নিজে করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।

- আল-কুরআন হচ্ছে মানব জাতির সকল সমস্যার সমাধান। যেমন ঃ ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, অর্থনীতি, পৌরনীতি, রাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধনীতি, শিক্ষানীতি, চিকিৎসানীতি, ধর্মনীতি, আইননীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি। There is no Deen without Dunya, অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম এসেছেই দুনিয়াকে চালানোর জন্য। মানুষের সামাজিক জীবনটা হচ্ছে social engineering, আর এই social engineering হচ্ছে Islamic science-এর একটা অংশ।

- একটা সাধারণ common-sense হচ্ছে যারা বাস্তব জীবনের সাথে জড়িত যেমন ঃ ইঞ্জিনিয়র, ডাক্তার, পাইলট, ব্যাংক ম্যানেজার, ব্যরিষ্টার, এমপি, মিনিষ্টার, থানার ওসি, ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার লোকেরা যদি কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর পড়াশোনা করে এই সমাজ এবং দেশকে পরিচালনা করেন তাহলেই কুরআনের সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব। আর যারা কুরআন-হাদীস পড়ছেন ঠিকই কিন্তু বাস্তব জীবনের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই তাহলে কে এই সমাজ বা দেশকে কুরআনের আলোকে পরিবর্তন করবেন? যেমন, যিনি finance বা economics-এ পড়াশোনা করেছেন বা M.B.A করেছেন তিনি যাকাত বা ইসলামিক ব্যাংকিং ভাল বুঝবেন। তাই আমাদের প্রয়োজন এমন শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে থাকবে সাধারণ শিক্ষা এবং ইসলামী শিক্ষার সমন্বয়।

- সত্যিকার চিত্রটা হওয়ার কথা ছিল এমন যে, যখন মাগরিবের আযান হবে ডিউটিরত থানার ওসি সকল পুলিশদের সাথে নিয়ে জামাতে সলাত আদায়ে দাঁড়িয়ে যাবেন এবং ইমামতি করবেন ওসি সাহেব নিজে, সলাত শেষে ১০/১৫ মিনিট কুরআন হাদীস থেকে ওসি সাহেব সিপাহীদের উদ্দেশ্যে শিক্ষাস্বরূপ নসিহত করবেন। একইভাবে যখন যোহরের আজান হয়ে যাবে তখন প্রত্যেকটা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীসাহেবগণ তার নিজ নিজ ডিপার্টমেন্টের সকলকে নিয়ে জামাতে সলাতের ইমামতি করবেন। আবার একইভাবে যোহর-আসর সলাতের আযান হলে ইউনিভার্সিটির ভাইস চান্সেলরের ইমামতিতে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা জামাতের সাথে সলাত আদায় করবেন। এভাবে যার যার এলাকার এমপি সাহেব জুম্মার সলাতের খুতবা দিবেন এবং ইমামতি করবেন। ঈদের সবচেয়ে বড় জামাতের ইমামতি করবেন রাষ্ট্রপতি নিজে এবং দেশবাসীর উদ্দেশ্যে খুতবা দিবেন। হ্যাঁ, কুরআন বলে যে, মুসলিমগণের মাঝে যারা সমাজ পরিচালনা করবেন বা দেশ পরিচালনা করবেন অথবা কোন নেতৃস্থানীয় স্থানে থাকবেন, তাদের অবশ্যই কুরআনের উপর যথেষ্ট দখল থাকতে হবে।

- আমাদের সকলের মধ্যে একটা ভুল ধারণা সবসময় কাজ করে যে, যারা মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছেন কুরআন-হাদীস নিয়ে শুধু তারাই ইসলাম চর্চা করবেন এবং এই বিষয়টা শুধু তাদের। আমরা যদি উন্নত বিশ্বের দিকে তাকাই তাহলে দেখি যে, হাজার হাজার ইসলামিক স্কলার ইউরোপ, আমেরিকা, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়ায় দ্বীন ইসলামের কাজ করে যাচ্ছেন যাদের

মাদ্রাসার কোন ড্রিগ্রি নাই অথচ তারা একেকজন বিভিন্ন বিষয়ের উপর ডক্টরেট। এদের আহ্বানে হাজার হাজার অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করছেন। যেমন ড. ইউসুফ ইস্টেস, ড. বিলাল ফিলিপস, ড. জাকির নায়েক, ড. ইউসুফ ইসলাম, ড. জামাল বাদই, ড. তৌফিক চৌধুরী, ড. আব্দুল্লাহ হাকীম কুইক, ড. নদভী, ড. রাহমেত শাহ খান, ড. রেদা বদির, নুমান আলী খান, আব্দুর রহমান গ্রীন প্রমুখ স্কলারগণ কোন ট্র্যাডিশন্যাল মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন নাই আবার উনাদের মধ্যে অনেকেই ইসলামের উপর যথেষ্ট রিসার্চ করেছেন, তারপর পৃথিবীর বিভিন্ন বড় বড় ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন এবং দ্বীনের প্রচারের জন্য সারা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে সেমিনার করে যাচ্ছেন।

- সকলের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে ইউরোপ, আমেরিকা, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকায় অনেক ভাল ভাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, কলেজ, এডুকেশন সেন্টার বা ইন্সিটিটিউট আছে, যারা ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর মাস্টার্স, গ্রাজুয়েশন, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেশন কোর্স ইত্যাদি দিয়ে থাকে, যে কেউ এই ধরনের কোর্সে অংশগ্রহণ করে ইসলামের উপর বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী হতে পারেন। এছাড়া এই আজকাল অনেক ভাল ভাল অনলাইন ইসলামিক ইউনিভার্সিটি রয়েছে। যেমন- www.islamiconlineuniversity.com

- এই কোর্সগুলো আমাদের দেশের গতানুগতিক মাদ্রাসার কোর্সের মতো নয়, এই কোর্সগুলো কুরআন ও সহীহ হাদীসভিত্তিক বাস্তব জীবনধর্মী এবং খুবই হাই কোয়ালিটি সম্পন্ন, অর্থাৎ কোর্সগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা যে ইসলামের সাথে আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে integrated করা হয়েছে। আর যারা ক্লাশ নিয়ে থাকেন অর্থাৎ লেকচারার তারাও খুবই প্রফেশনাল।

- এই উত্তর আমেরিকাতে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর কনফারেন্স, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, ট্রেনিং, সর্ট কোর্স, লং কোর্স ইত্যাদি নিয়মিত হচ্ছে যা খুবই কোয়ালিটি সম্পন্ন। আর এই ধরনের প্রোগ্রামের শিক্ষক এবং বক্তা হিসেবে আসছেন সারা পৃথিবীর সব A-class ইসলামিক স্কলারগণ। আলহামদুলিল্লাহ, এই ধরনের প্রোগ্রাম এবং কোর্সে আমাদের মতো অনেকেই সপরিবারে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছেন এবং একাডেমিক ক্যারিয়ারের পাশাপাশি Islamic Studies-এর উপর পড়াশোনা করে সঠিক দ্বীন ইসলাম বুঝার চেষ্টা করছেন।

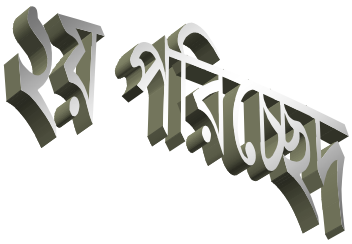
শেষ পরিচ্ছেদ

অপসংস্কৃতি

বিজাতীয়দের প্রভাব

- আমাদের সন্তানদের ইসলাম বিমুখ করার পেছনে যতোগুলো শক্তি কাজ করছে তার মধ্যে অন্যতম হলো বিজাতীয় দেশ। ইসলামের শত্রুরা সুকৌশলে আমাদের মধ্যে তাদের অশ্লিল সংস্কৃতি ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

- ডিস এবং ক্যাবল কানেকশনের কারণে শতশত বিজাতীয় চ্যানেল আমাদের দেশে প্রচারিত হচ্ছে। তাদের সিরিয়াল-নাটক-সিনেমা-নাচ-গান, ম্যাগাজিন, অখাদ্য-কুখাদ্য সব আমাদের মধ্যে চলে আসছে।

- এখন এমন হয়েছে যে, বাংলাদেশের একটি ছোট্ট শিশুও হিন্দিতে কথা বলতে পারে এবং হিন্দি কথা বুঝে। অথচ ১৯৫২-তে আমরা উর্দুর কালো থাবা থেকে বাংলা ভাষাকে রক্ষার জন্য জীবন দিয়েছি। আর আজ উর্দুর বদলে হিন্দি এসে বাংলা ভাষাকে আক্রমণ করছে।

- বিজাতীয় ফ্যাশন ও সংক্ষিপ্ত কাপড়-চোপড়ে আমাদের বাজার সয়লাব। বাংলাদেশে এক ঈদ-উল-ফিতরে মার্কেটে মেয়েদের একটা পোশাক উঠেছিলো যে পোশাকটির নামকরণ করা হয়েছিলো এক পর্ন-অভিনেত্রীর নামানুসারে এবং বেশ কাটতি হয়েছিলো সেই পোশাকের। আমরা অভিভাবক হিসেবে একবার চিন্তা করে দেখি, যে দেশের ৯৮% মুসলিম, সেই দেশে পর্ন-অভিনেত্রীর নামে পোশাক বের হয় আর আমাদের সন্তানরা সেই পোশাক পড়ে গর্ববোধ করে। আমরা অভিভাবকগণ আমাদের সন্ত ানদের কতটুকু শিক্ষা দিতে পেরেছি যে, তারা পর্ন-অভিনেত্রীকে আদর্শ মনে করে!

মিডিয়ার প্রভাব

- কিছু জ্ঞানপাপী এবং বুদ্ধিজীবী অর্থলিপ্সায় পড়ে মিডিয়ার মাধ্যমে নিয়মিত ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে যাচ্ছেন।

- নাটক-সিনেমায় সাধারণত খারাপ চরিত্রের অভিনেতাদের মুখে দাড়ি লাগিয়ে, মাথায় টুপি পরিয়ে, পায়জামা-পাঞ্জাবি পড়িয়ে, মাথায় পাগড়ী পড়িয়ে দেখানো হচ্ছে। ভাবখানা এমন যে হুজুর-মাওলানারা হলেন যত বাজে কাজের মূল।

- নাটক-সিনেমায় কোন মহিলাকে বোরকা পরিয়ে তাকে দিয়ে খারাপ কাজের অভিনয় করাচ্ছে। সমাজকে বুঝাতে চাচ্ছে যারা পর্দা করে যারা বোরকা পরে আসলে তারা বোরকার আড়ালে খারাপ কাজ করে থাকে।

- টিভিতে যেসব বিজ্ঞাপন দেয়া হয় তার বেশীরভাগই আপত্তিজনক, আমাদের ছেলেমেয়েরা সেগুলো থেকে কী শিখে? দিন দিন এগুলো দেখে তাদের কোমল অন্তরে কু-প্রভাব ফেলছে, তাদেরকে কু-শিক্ষা দিচ্ছে। আজ একটি শিশু ছেলে ছোট বেলা থেকেই টিভিতে দেখছে একটি যুবতী মেয়ে অর্থনগ্ন হয়ে সাবান দিয়ে গোসল করছে বা একটি যুবক অপর একটি যুবতীর হাত ধরে দৌঁড়াদৌঁড়ি করছে।

- টিভিতে প্রায় প্রতিটি নাটক-ই প্রেমের নাটক। এছাড়া পরিবারের সবাই মিলে দেখছি কীভাবে পরকীয়া প্রেম করতে হয়। এই বিষয়টা যেন আমাদের দেশে খুবই স্বাভাবিক, এতে আপত্তিকর কিছু নেই!

- মোবাইল ফোন কম্পানী বিজ্ঞাপন দিচ্ছে যে একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে রাতভর গল্প করছে কারণ রাত ১২টার পর বিল কম বা ফ্রী টক টাইম।

- আমরা কি কখনো গভীরভাবে চিন্তা করে দেখি যে আমার কলেজ পড়ুয়া মেয়ে গভীর রাত পর্যন্ত একটা ছেলের সাথে গল্প করছে এর ফলে তার নৈতিক চরিত্র কোন দিকে ধাবিত হচ্ছে? আর আমরা পিতামাতা হয়েও এগুলোতে কিছুই মনে করছি না!

- সঠিক ইসলামকে তুলে ধরার জন্যে ভালো মিডিয়া ও পত্র-পত্রিকা বা বইপত্র তেমন একটা নেই। বাজারে অনেক বই পাওয়া যায়, কিন্তু মানসম্পন্ন ও রুচিশীল ইসলামী বইয়ের খুব অভাব।

- প্রতিদিন অনেকগুলো দৈনিক পত্রিকা বের হয়, এছাড়া বের হয় বিনোদনমূলক সাপ্তাহিক ও মাসিক। এগুলোর অনেক অংশ জুড়েই থাকে মেয়েদের অশ্লীল ছবি, বিজ্ঞাপন ও নিউজ যা বাসার সকলেই ঐ টিভির মতো নিউজ পড়ার পাশাপাশি অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও তা উপভোগ করে থাকে।

ড. জাকির নায়েকের শর্ত

- ড. জাকির নায়েকের একটি উচুমানের ইসলামী স্কুল আছে। ড. জাকির নায়েক ক্যানাডার একটি কনফারেন্সে বলেছিলেন যে, তার এই স্কুল থেকে তার চেয়েও আরো উন্নতমানের শতশত Comparative religion-এর স্কলার প্রতিবছর বের হবে, ইনশাআল্লাহ। এই স্কুলে সন্তান ভর্তি করার পূর্বশর্ত হচ্ছে "বাড়ি থেকে ডিশ এন্টেনার লাইন আগে কাটতে হবে"।

- সন্তানের চরিত্র গঠনে একটি ভারসাম্যপূর্ণ স্ট্রাটেজীর অংশ হিসেবে হলিউড-বলিউডের কুখাদ্যের বিপরীতে যে সকল পদক্ষেপ আমরা নিতে পারি তার মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ হলো নিজ বাড়িতে একটি পারিবারিক পাঠাগার (Family Library) প্রতিষ্ঠা করা। ছোটদের উপযোগী ইসলামিক ডিভিডি, ভিসিডি ইত্যাদি সংগ্রহ করতে পারি। আল-কুরআনের তাফসীর, সহীহ হাদীস গ্রন্থ, রসূল ﷺ -এর জীবনী, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামের ইতিহাস, ইসলামী সমাজ, চার খলিফার বিস্তারিত জীবনী, সাহাবীদের জীবনী, অন্যান্য নাবীদের জীবনী, Comparative religion, ইসলামী শিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে নিজ ঘরে একটি পারিবারিক ইসলামিক লাইব্রেরী তৈরী করতে পারি। নিজে পড়তে পারি, সন্তানদেরও পড়ার উৎসাহ দিতে পারি।

- আমাদের মেয়ের বয়স দশ বছর। আলহামদুলিল্লাহ, তার জন্মের পর থেকে এ পর্যন্ত তাকে কোন হিন্দি সিনেমা, সিরিয়াল, নাটক, নাচ-গান স্পর্শ করেনি অর্থাৎ এই ধরণের কিছু সে দেখেনি। কারণ আমাদের বাসায় কখনোই ডিসের লাইন ছিল না এবং আজও নেই। হ্যাঁ, সে টিভি দেখে, আমরা তাকে খুব বড় স্ক্রিনের টিভি কিনে দিয়েছি যেন সে উৎসাহ পায় এবং তার সাথে ডিভিডি প্লেয়ার সংযুক্ত করে দিয়েছি। আমাদের বাসায় ইসলামিক ডিভিডি দিয়ে তাকে একটি লাইব্রেরী করে দিয়েছি। তার বুঝ হওয়ার পর থেকেই টিভি দেখার প্রয়োজন হলে সে নিজেই লাইব্রেরী থেকে ডিভিডি বাছাই করে তা নিজে নিজে প্লে করে উপভোগ করে।

- এছাড়া ইন্টারনেট তো রয়েছেই। কম্পিউটারে পাসওয়ার্ড দেয়া রয়েছে। তার নির্দিষ্ট সময়ানুযায়ী তাকে কম্পিউটার ব্যবহার করতে দেই এবং কতগুলো ইসলামিক ওয়েবসাইট তাকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছি যেখান থেকে সে শিক্ষামূলক কিছু উপভোগ করে।

টিভিতে নিউজ বা খবর দেখা

- অনেক ইসলামী পরিবার বাসায় ডিস এন্টেনার লাইন নিয়েছেন খবর (নিউজ) দেখার জন্য। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে যে ২৪ ঘন্টার মধ্যে খবর হচ্ছে মাত্র অল্প কিছু সময়। আর বাকী পুরো সময়টাতেই প্রচার হচ্ছে অনৈসলামী অনুষ্ঠান। পরিবারে বাবা-মা, ছেলেমেয়ে সবাই মিলে আস্তে আস্তে খবরের পাশাপাশি অন্যান্য অনুষ্ঠান দেখাতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। এমন কি খবরের মাঝখানেও কয়েকবার বেপর্দা মেয়েদের বিজ্ঞাপন দেয়া হচ্ছে, তাও সবাই মিলে উপভোগ করছে!

- যে সকল মেয়েরা সাধারণত টিভিতে খবর পড়েন তারা দেখতে হয় খুবই সুন্দরী, আকর্ষণীয় ফিগার, কণ্ঠস্বর হয় খুবই আকর্ষণীয় আর বয়স তো অবশ্যই কম। তার উপর আকর্ষণীয় সাজগোজ। এটা তাদের কোন দোষ নয়। টিভিতে আজকাল খবর পড়ার জন্য চাকুরীর যোগ্যতারই অংশ এটা। কিন্তু সমস্যাটা হলো ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে। যারা খবর দেখতে বসেন তারাও খবর উপভোগ করার পাশাপাশি খবর পাঠিকাকেও দেখতে থাকেন।

- ইসলামের নামেও কিছু কিছু টিভি চ্যানেল বের হয়েছে। তারা ইসলামী অনুষ্ঠানের মাঝে মাঝে নাচ-গান সম্মিলিত বিজ্ঞাপন দিয়ে যাচ্ছে। কোথাও রেহাই নেই।

টক শো (Talk Show)

- প্রতিটি চ্যানেলে প্রতিদিন কয়েকটি করে টক শো হয়। এই টক শোগুলোতে যারা গেষ্ট স্পিকার হিসেবে আসেন তারা সবাই উচ্চ শিক্ষিত, সরকারের আমলা, এমপি, মন্ত্রী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, প্রফেসর, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র, ব্যরিষ্টার, রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার, রাজনীতিবিদ ইত্যাদি লেভেলের। আলহামদুলিল্লাহ, এই টক শোর মাধ্যমে দেশের অনেক উপকার হচ্ছে। আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে অনেক সমস্যা চিহ্নিত হচ্ছে এবং অনেক

সমস্যার সমাধানও বের হয়ে আসছে। দুই গ্রুপের বা দুই বক্তার আলাপ আলোচনায় অনেক সত্য বের হয়ে আসছে এবং দেশের জনগণ যা জানতো না তা প্রকাশ্যে জেনে যাচ্ছে।

- যেহেতু এই অনুষ্ঠানটি খুবই জনপ্রিয় তাই পরিবার-পরিজন নিয়ে অনেকেই উপভোগ করেন। এই টক শোর মাধ্যমে আমাদের সন্তানেরাও অনেক সময় দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যায়। কারণ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিরাই জাতির সামনে অবাধে মিথ্যা তথ্য তুলে ধরেন, অনেকে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষী মনোভাব প্রকাশ করেন, অনেকে ইসলামকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু আপত্তিকর দৃশ্য শিশুদের মনে কু-প্রভাব ফেলে

- পিতামাতারা যখন সন্তানদের নিয়ে বাইরে বের হন তখন রাস্তা-ঘাটের নানা রকম আপত্তিকর দৃশ্য কোমল মনের সন্তানদের হৃদয়ে আঘাত হানে। যেমন,
  - রাস্তা-ঘাটে, পার্কে, শপিং সেন্টারে, ইউনিভার্সিটিতে ইয়ং ছেলেমেয়েরা (বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড) সকলের সামনে একে অপরের হাত ধরে নির্দ্বিধায় হাঁটাহাঁটি করছে।
  - পার্কে একে অপররের সাথে এমন আচরণ করে যেন তারা bed-roomএ অবস্থান করছে।
  - এডাল্ট মেয়েরা অশালীন পোশাক পরে সর্বত্র চলাফেরা করছে।
  - কমার্শিয়াল বিজ্ঞাপন হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় ব্যানার এবং পোষ্টারে মেয়েদের অশ্লীল ছবি টাঙানো আছে।

পর্নগ্র্যাফীর সহজলভ্যতা

- খুব সহজেই এখন বাংলাদেশে পর্নগ্র্যাফীর সিডি-ডিভিডি পাওয়া যায়। এছাড়া তো রয়েছে আনলিমিটেড ইন্টারনেট ভার্শন। আমাদের মেয়ে বা ছেলে সারারাত কম্পিউটারে কী এতো এসাইনমেন্ট করছে পিতামাতা হিসেবে আমরা কি কখনো খোঁজ-খবর নিয়ে দেখেছি?

- এখন পর্নগ্র্যাফী শুধু কম্পিউটারে নয়, এটি চলে এসেছে ছেলেমেয়েদের হাতের মুঠোতে, মোবাইলে। এমনও জানা যায় যে গ্রামের কৃষক ছেলেরাও এখন তার মোবাইলে পর্নগ্র্যাফী উপভোগ করে।

- ইউনিভার্সিটির কোন কোন হলের 'কমন রুমের' টিভিতে সকল ছাত্ররা একসাথে সারারাত পর্নগ্র্যাফী উপভোগ করে।

- আরো লোমহর্ষক ঘটনা হলো, আজকাল ইউনিভার্সিটি-কলেজের ছেলেরা বয়ফ্রেন্ড-গ্লার্লফ্রেন্ড জীবনের অংশ হিসেবে মাঝে মধ্যে সুযোগ পেলেই একান্তে সময় কাটায় এবং যৌন সম্পর্ক গড়ে তুলে। অনেক ছেলেরাই তার গ্লার্লফ্রেন্ডের অজান্তে সেই দৃশ্য ওয়েব ক্যামেরা দিয়ে অথবা হিডেন ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে রেকর্ড করে ইন্টারনেটে আপলোড করে থাকে। আমাদের মুসলিম ঘরের ইউনিভার্সিটি-কলেজের অনেক ছেলেমেয়েদের পর্নগ্র্যাফীর ভিডিও ক্লিপ এখন ইন্টারনেটে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন স্টারদের অনুসরণ করার প্রবণতা

- আমাদের যুবতী মেয়ে ক্রিকেট তারকাদেরকে শয়নে-স্বপনে ধারণ করে, তাদের ছবি বালিশের নিচে নিয়ে ঘুমায়, তাদের পোষ্টার নিজ রুমের দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখে, এতে আমরা পিতামাতারা কিছুই মনে করি না।

- আমাদের কলেজ বা ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া ছেলে ইন্ডিয়ান নায়িকাদের পোষ্টার ঘরে টাঙ্গিয়ে রেখেছে এতে আমরা কিছুই মনে করছি না। আমাদের মেয়ে কোন আধুনিক যুবক গায়কের আদর্শ অনুসরণ করছে তাতে আমরা কিছুই মনে করছি না।

- কোথাও একটি কন্সার্ট হচ্ছে, সেখানে লাইন দিয়ে উচ্চ মূল্য দিয়ে টিকেট কিনে আমাদের মেয়ে তা উপভোগ করে গভীর রাতে বাসায় ফিরছে এতে আমরা পিতামাতারা কিছুই মনে করছি না। কন্সার্ট দেখতে গিয়ে গানের সাথে সাথে ছেলেমেয়েরা একাকার হয়ে নাচানাচি করছে এতে আমরা কিছুই মনে করছি না।

- আমাদের ছেলেমেয়েরা কার আদর্শ অনুসরণ করে বড় হচ্ছে আমরা বাবা-মায়েরা তা কখনো গভীরভাবে চিন্তা করে দেখিনি। আবার অনেকে দেখেশুনেও কিছুই মনে করছি না।

আইনের লোকের ক্ষমতার অপব্যবহার

- আমাদের দেশের অবস্থা এখন এমন হয়ে গেছে যে কেউ নিজ বাসায় আল-কুরআনের তাফসীর সমগ্র, হাদীস গ্রন্থ, ইসলামী বইপত্র রাখতে রীতিমতো ভয় পান, কখন এসে পুলিশ হামলা করে!
- অনেকে কুরআন-হাদীস এবং ইসলামী বইপত্র নিয়ে রাস্তা-ঘাটে চলাচল করতেও নিরাপদ মনে করেন না, কখন পুলিশ এরেষ্ট করে এবং জিহাদী বই পাওয়া গেছে বলে কোর্টে চালান করে দেয়!
- একজন মুসলিমের জন্য দাড়ি রাখা ওয়াজিব। কিন্তু দেশের পরিস্থিতি এখন এমন অবস্থানে দাঁড়িয়েছে যে পুরুষরা দাড়ি রাখতে ভয় পান কখন মৌলবাদী বলে পুলিশ এরেষ্ট করে ফেলেন। যুবকরাতো দাড়ির বিষয়ে আরো বেশী ভীত-সন্ত্রস্ত। তাহলে দেখা যাচ্ছে, যারাও ইসলাম প্রাকটিস করতে চায়, তারাও করতে পারছে না।

ফান্ডামেন্টালিষ্ট বা মৌলবাদী বলে গালি দেয়া

- দাড়ি-টুপি যেন আমাদের দেশে একটি অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক শ্রেণীর লোকের তো দাড়ি-টুপি দেখলেই শরীর জ্বালা-পোড়া করে। তারা পরিবেশটা এমন তৈরী করেছেন যে দাড়ি-টুপি মানেই ফান্ডামেন্টালিষ্ট, মৌলবাদী, সন্ত্রাসী।
- অথচ আমরা একটু গভীরভাবে চিন্তা ও পড়ালেখা করলেই জানতে পারি যে ফান্ডামেন্টালিষ্ট বা মৌলবাদী কাকে বলে। যিনি কোন একটি বিষয়ের উপর খুব ভালভাবে গভীরভাবে জানেন অর্থাৎ যিনি কোন একটি বিষয়ের মূল বা ফান্ডামেন্টালস সম্পর্কে জ্ঞাত তাকেই ফান্ডামেন্টালিষ্ট বা মৌলবাদী বলা হয়। যেমন কেউ যদি অংকের মূল ফরমূলা বুঝেন এবং তা নিয়ে গবেষণা করেন তিনি অংকের ফান্ডামেন্টালিষ্ট বা মৌলবাদী। আবার যিনি কেমিস্ট্রির মূল তথ্য ভাল করে বুঝেন তিনি কেমিস্ট্রির ফান্ডামেন্টালিষ্ট বা মৌলবাদী। আবার যিনি কোন একটি ধর্মের মূল বিষয়গুলো খুব ভাল করে বুঝেন এবং জানেন তিনি হচ্ছেন ঐ ধর্মের ফান্ডামেন্টালিষ্ট বা মৌলবাদী, হতে পারে সেটা হিন্দু ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম বা ইসলাম ধর্ম। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে যে মৌলবাদী বলে গালি দেয়া হচ্ছে শুধু মাত্র ইসলাম ধর্মের আলেমদেরকে।

- যে সকল মুসলিম নরনারী আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী অর্থাৎ কুরআন এবং রসূলের সূন্নাহ অনুযায়ী ইসলামের সকল নিয়ম কানুন মেনে জীবনযাপন করেন তাদেরকে ধিক্কার দিয়ে বলা হচ্ছে ধর্মীয় গোড়ামির শিকার, ফান্ডামেন্টালিষ্ট। অথচ আল্লাহ বলছেন তোমরা ততক্ষণ প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না পরিপূর্ণভাবে ইসলাম মেনে চলবে।

টেকনোলজির অপব্যবহার

- আমরা আমাদের সন্তানদের পারসোনাল কম্পিউটার, ল্যাপটপ, নোটবুক, আইপ্যাড, ট্যাবলেট, আইফোন, আইপড, পিএস গেমিং ডিভাইস, এক্সবক্স গেমিং ডিভাইস সাথে লার্জ স্ক্রীন থ্রীডি টিভি ইত্যাদি কিনে দিচ্ছি। কিন্তু আমাদের সন্তানেরা এগুলো দিয়ে কী করছে তার কি কোন খোঁজ-খবর রাখছি? এগুলো কতটুকু সঠিক কাজে ব্যবহার করছে আর কতটুকু বাজে কাজে ব্যবহার করছে তার কি কোন ট্র্যাক রাখি? বাস্তবে দেখা গেছে যে কলেজ-ইউনিভার্সিটির কাজের পাশাপাশি তারা এগুলোতে পর্নগ্রাফী দেখছে, আজেবাজে নাচ-গান দেখছে, ইন্টারনেটে অবৈধ চ্যাটিং করছে, আল্লাহ রসূলের বিরুদ্ধে ব্লগিং করছে! মোবাইলে গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ডের সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করছে! আমরা বাবা-মারা এতে কিছু মনে করছি না।

- ডিশের লাইনের অপব্যবহার - বাংলাদেশে এখন এক ডজনেরও উপরে রয়েছে দেশী টিভি চ্যানেল। আর ক্যাবলের বদৌলতে তো রয়েছে শতশত আজেবাজে চ্যানেল। টিভি খুললেই অশ্লীলতা। আর এই অশ্লীলতা দেখতে দেখতে অবস্থাটা এমন হয়ে গেছে যে সকলের কাছে তা খুবই নরমাল। পরিবারের সবাই মিলে একসাথে দেখছে অশ্লীল হিন্দি নাচ-গান, সিনেমা আর পরকীয়া প্রেমের নাটক ইত্যাদি। এতে কেউ কিছু মনে করছে না।

ফেইসবুকের অপব্যবহার

- আমাদের সন্তানেরা দিন-দিন ফেইসবুকের মাধ্যমে নানা অপসংস্কৃতিতে আসক্ত হয়ে পড়ছে। কিন্তু আমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছি যে এর নেগেটিভ দিকগুলো কী কী? অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে এই আসক্তি এতো প্রকট আকার ধারণ করেছে যে তা কন্ট্রোলের বাইরে চলে যাচ্ছে।

যেমন নিম্নে ফেইসবুকের কিছু নেগেটিভ দিক তুলে ধরা হলো। এই বিষয়ে আমাদের বাবা-মায়েদের সময় থাকতে সচেতন হওয়া উচিত।

১) অনেক ক্ষেত্রেই সন্তান তার আশেপাশের অন্যদের কেয়ার করে না। তখন সে শুধু তার নিজের জগৎ নিয়ে মত্ত থাকে।

২) সামাজিক বন্ধন কমে যেতে থাকে। সে আস্তেআস্তে তার সামাজিক দায়িত্ব থেকে দূরে সরে যেতে থাকে।

৩) সময়ের অপব্যবহার। আমাদের সন্তানেরা যে কিভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা ফেইসবুকের মধ্যে সময় কাটায় তা হিসাব করলে দেখা যাবে যে তারা জীবনের একটা দীর্ঘ মূল্যবান সময় নষ্ট করে ফেলছে, যা অন্য কিছু দিয়ে ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়।

৪) দীর্ঘক্ষণ ফেইসবুকে সময় কাটানো মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবে স্বাস্থের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

৫) পরিবারের অন্যান্যদের সাথেও সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। দিন-দিন তার কাছে পরিবারের সদস্যদের চেয়ে বন্ধু-বান্ধবদের গুরুত্ব বেশী হতে থাকে।

৬) তৃতীয় পক্ষের সাথে দ্বন্দ্ব। ফেইসবুকের মাধ্যমে অনেক অপরিচিত লোকদের সাথে বন্ধুত্ব হয়। এই গ্রুপে থাকে বিভিন্ন বয়সের পুরুষ ও মহিলা। কার চরিত্র কেমন কেউ জানে না। এমন অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে যে একে অপরের সাথে দেখা-সাক্ষাতের মাধ্যমে বড় ধরণের ক্রাইমের সাথে জড়িয়ে পড়েছে।

৭) ব্ল্যাকমেইল। ফেইসবুকে সাধারণত সবাই তাদের নানা রকম নানা ভঙ্গির ছবি আপলোড করে দিয়ে থাকে। সকলেই সকলের ছবি দেখতে পায়। যেকেউ এখান থেকে ছবি ডাউনলোড করে নিয়ে cutting and pasting এর মাধ্যমে বা এনিমেশনের মাধ্যমে অন্যান্য এডাল্ট ছবির সাথে মিলিয়ে পর্নগ্র্যাফি তৈরী করতে পারে।

৮) Islamic point of view। আমি যদি মেয়ে হয়ে থাকি তাহলে আমি আমার ছবি অন্যকে দেখাবো কেন? আমার ছবি দেখে পরপুরুষরা তো খারাপ চিন্তাভাবনা করতে পারে। যেখানে ইসলাম মেয়েদেরকে

কোমল স্বরে পরপুরুষের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেছে সেখানে নিজের নানা ভঙ্গির ছবি তো ওদের সামনে তুলে ধরার প্রশ্নই উঠে না।

৯) আরেকটি কমোন চিত্র প্রায় দেখা যায় যে, কোন কোন ফেইসবুক ইউজার ভালোর সাথে মন্দ মিলিয়ে ফেলছেন। যেমন সে আল-কুরআনের আয়াত অথবা সুন্দর সন্দর হাদীস শেয়ার করছেন অথবা কোন ইসলামী শিক্ষণীয় আর্টিক্যাল পোষ্ট করছেন আবার তার পাশাপাশি হিন্দি গান, বা কোন ইন্ডিয়ান নায়ক-নায়িকার ছবিও পোষ্ট করছেন!

- **ফেইসবুকের সঠিক ব্যবহার** ঃ উপরে আমরা ফেইসবুকের নেগেটিভ দিক সম্পর্কে কিছু তথ্য তুলে ধরেছি। কিন্তু এর পজিটিভ দিকও রয়েছে। হ্যাঁ, আমরা এই ফেইসবুককে সঠিক কাজে লাগিয়ে আবার অনেক উপকারও পেতে পারি। যেমন ঃ কেউ ফেইসবুকের মাধ্যমে friend circle তৈরী করে তাদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াতি কাজ করতে পারে, তাদেরকে নিয়মিত সঠিক দ্বীন সম্পর্কে সচেতন করতে পারে, নানারকম ইসলামিক ডকুমেন্টারির ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করতে পারে, ভাল ভাল স্কলারদের লেকচারের লিংক শেয়ার করতে পারে, বিভিন্ন রকম শিক্ষণীয় আর্টিক্যালস পাঠাতে পারে। এটাকে আমরা ডিজিটাল দাওয়াত বলতে পারি। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আজকাল মানুষ পড়ার চাইতে ভিডিও দেখতে বেশী পছন্দ করে। তাই আমাদেরও উচিত এই সুযোগকে কাজে লাগানো। ইসলামের দাওয়াতি কাজে এই আধুনিক টেকনোলজির সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা যেতে পারে। কারণ রসূল ﷺ বলেছেন "আমার কাছ থেকে একটি বাক্য হলেও তা লোকদের কাছে পৌঁছে দাও" (সহীহ বুখারী)। এটা প্রতিটি মুসলিম নরনারীর জন্য সার্বক্ষণিক ফরয কাজ।

ব্লগিং-এর অপব্যবহার

- ইনফরমেশন টেকনোলজি কোম্পানীগুলো ব্লগিং কমিউনিকেশন ম্যাথড আবিষ্কার করেছিলেন ইউজারদের ভালোর জন্য। বিশেষ করে যারা গ্রুপিংয়ের মাধ্যমে রিসার্চ করেন, মতামত ব্যক্ত করেন, সাজেশন আদান-প্রদান করেন, নলেজ শেয়ার করেন ইত্যাদি। পৃথিবীর কোন দেশে এই ব্লগিংয়ের অপব্যবহার হয়নি যা বাংলাদেশীরা করেছে। ইনফরমেশন

টেকনোলজির একটা সুবিধাকে উন্নয়নের কাজে না লাগিয়ে নেগেটিভ কাজে ব্যবহার করে নিজেরা নিজেরা বিভেদ সৃষ্টি করে একরকম গৃহ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

- মনে হচ্ছে বাংলাদেশে মানুষজন ব্লগিং ইনটারফেইস ব্যবহার করে-ই একজন আরেক জনের দোষ ধরার জন্য; খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এক ভাই অপর ভাইয়ের ভুল-ত্রুটি বের করার জন্য; একজন অপরজনকে গালি-গালাজ করার জন্য; অপমান করার জন্য; তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার জন্য; হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য। সামনা-সামনি যে কাজ করতে পারছে না সেই কাজ ইচ্ছে মতো ব্লগিংয়ের মাধ্যমে করে মনের ঝাল মিটাচ্ছে।

- ব্লগিংয়ের মাধ্যমে cyber bulling শুধু নিজেদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। একসময় একে অপরের ধর্মীয় অনুভুতিতে আঘাত হানছে। বিশেষ করে ইসলামের উপর নানাভাবে আক্রমণ করছে! যা পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মের লোকেরা করছে না। কারা করছে এই কাজ? যারা মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে তারাই তাদের সৃষ্টা মহান আল্লাহ তা'আলাকে নিয়ে নানা রকম কটুক্তি করছে, রসূল ﷺ -কে নানা রকম অবমাননা করছে।

- আল্লাহ ও রসূলকে অবমাননা করা, ইসলামকে অবমাননা করাটা যেন নতুন প্রজন্মের কাছে একটি আধুনিকতার অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মূল কারণগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে সন্তানদের উপর বাবা-মার কোন কন্ট্রোল নেই এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে ওদের প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা নেই।

নাটক-সিনেমার প্রভাব

- আমি কি কখনো চিন্তা করেছি যে আমি এবং আমার পরিবারের সবাই মিলে নিয়মিত কী ধরণের নাটক-সিনেমা (অপসংস্কৃতি) দেখছি? এই ধরণের নাটক-সিনেমা, হিন্দি সিরিয়াল, হিন্দি মুভি আমাদেরকে কুরআনের পথ থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অনেক হিন্দি মুভির মধ্যেই থাকে হিন্দুদের পূজা যা আমি দেখছি এবং শিরকের প্রশ্রয় দিচ্ছি। আবার হিন্দি মুভি যখন শুরু হয় তখন দেব-দেবীর নামে শুরু হয়। আসুন, একটিবার গভীরভাবে ভেবে দেখি ঃ আমার ঘরে আমি এই টেকনোলজির মাধ্যমে আধুনিক উপায়ে হিন্দুদের মূর্তি পূজার আশ্রয় দিচ্ছি তার মানে

নিজেদের ঘরেই ভার্চুয়াল পূজা হচ্ছে। কত বড় শিরকি অপরাধ এটা একবার ভেবে দেখেছি কি কখনো?

- আমাদের মাঝে এমন অনেকেই আছেন যারা মনে করেন যদি নাটক সিনেমায় অশালীন কিছু না থাকে তাহলে তাতে সমস্যা নেই। আবার অনেকে মনে করেন যদি নাটকে/নাটিকায় নামায আদায়ে, রোযা রাখায় উৎসাহিত করা হয়, তাহলে সেই নাটক দেখা যাবে। অথচ তারা এটা ভেবে দেখেন না যে, এমন ভালো নাটকে যারা স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করছেন তারা কি সত্যিই স্বামী-স্ত্রী? এমন বেশ কিছু ইসলামী নাটক দেখা গেছে যেখানে নারী পুরুষের পর্দার বিষয়টি আদৌ খেয়াল রাখা হয়নি।

দিন দিন চিত্ত বিনোদনের আমূল পরিবর্তন

- আগে আমাদের দেশে একটি মাত্র টিভি চ্যানেল ছিল যা হচ্ছে বিটিভি। বুঝার সুবিধার্থে আমরা দুই একটা বিষয় উদাহরণস্বরূপ আনতে পারি। যেমন, বিটিভিতে একসময় ছায়াছন্দ নামে মাসে একটি গানের অনুষ্ঠান দেখানো হতো। তাও অনুষ্ঠানটি দেখানো হতো রাত ১০টার ইংরেজী সংবাদের পর যখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পরে। আমরা জানি যে তখনকার যুগে বাংলাদেশী সিনেমাগুলোও ছিল অনেকটা শালিন। শালিন বলে দাবি করে এটাও বলতে চাইছি না যে সেগুলি ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয ছিল। কিন্তু অন্তত শালিনতা ছিলো। ছায়াছন্দে যদি কোন নাচ-গান একটু অশালিন মনে হতো তাহলে পরিবারের বড়রা তা নিজেরাও দেখতেন না এবং অন্যদেরকেও দেখতে দিতেন না, টিভি বন্ধ করে রাখতেন। তখন বিটিভিতে মাসে মাত্র একটি বাংলা সিনেমা দেখানো হতো তাও বেশীরভাগ সময় সামাজিক। বিটিভিতে সপ্তাহে একটি বা দুটি শালিন ইংরেজী মুভি বা সিরিয়াল দেখানো হতো। বিটিভি যে কোন ইংরেজী মুভি প্রচারের আগে নিজেদের সেন্সরবোর্ড দ্বারা আগে দেখে নিতো এবং যদি কোন অশালিন দৃশ্য থাকতো তা তারা কেটে নিতো। এখন এই যুগে মুসলিম ঘরে ঘরে শতশত অশালিন চ্যানেল, পরিবারের সবাই মিলে কী উপভোগ করছে পূর্বের সাথে তুলনা করে তা কি একটি বার চিন্তা করে দেখেছি যে আমরা কোথায় পৌঁছে গেছি?

- এভাবে দিন গড়িয়ে বছর কেটে যাচ্ছে আর আমরা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি! ঘরে ঘরে একসময় আসলো ভিসিপি, তারপর আসলো ভিসিআর,

তারপর আসলো সিডি প্লেয়ার, তারপর ডিভিডি প্লেয়ার, আরও আধুনিক কিছু ইত্যাদি। একসময় আমাদের দেশের লোকেরা মিডিলিষ্টে চাকুরী করতেন। তারা যখন দেশে আসতেন তখন বিদেশ থেকে আর কিছু আনেন আর নাই আনেন সবাই সাথে করে অন্ততপক্ষে একটি ভিসিয়ার নিয়ে আসতেন। এই শুরু হয়ে গেল মুসলিম ঘরে ঘরে শয়তানের অশ্লিল নাচ-গান। আমরা ছোটবেলায় মিডিলিষ্ট থেকে আসা আত্মীয়-স্বজনের নিকট থেকে শুনেছি যে, হিন্দি ক্যাসেটের বদৌলতে আরবের লোকেরা নাকি অনর্গল হিন্দিতে কথা বলতে পারে, ঐ দেশের একটি ছোট বাচ্চাও অমিতাভ বচ্চনকে চিনে! এটি আশির দশকের কথা।

- দিন আরো গড়াতে থাকলো! আমরা উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি! তার পরের উন্নতি হচ্ছে ঘরে ঘরে, বাসে, ট্রেনে, নাইট কোচে, লঞ্চে, স্টিমারে, হোটেলে, রেস্টুরেন্টে, চায়ের দোকানে, গ্রামে, হাটে, বাজারে সর্বত্রই একই আওয়াজ শোনা যাচ্ছে - "হাওয়া হাওয়া ও হাওয়া খুশবু লুটাদে....." । শুনেছি যে এই জনপ্রিয় গানের কথাগুলোর অর্থ ভাল নয়। যাহোক দেশের বা সমাজের এই যে উন্নতি (?), এতে আমরা মুসলিম পরিবারের লোকেরা কিছুই মনে করছি না!

- হিন্দি সিনেমার গানের টপ টেন আর ড্যান্স ড্যান্স অনুষ্ঠান মুসলিম ঘরে ঘরে ঢুকে গেল। সাধারণত আইটেম সং বা সবচেয়ে যৌন আবেদনময়ী হিন্দি সিনেমার গানগুলোই হয় টপ টেন। কোন কোন বাংলাদেশী চ্যানেলে অনুষ্ঠানের মাঝে মাগরিবের আযান দেয়, পরিবারের কেউ কেউ ড্যান্সের মাঝে গিয়ে তাড়াহুড়ো করে মাগরিব পড়ে এসে আবার বসে রিমোট হাতে। যে নাকি ড্যান্সের মাঝে ছিল মাগরিবের সলাতের মধ্যে তো তার চোখে ঐ দৃশ্যই ভাসার কথা। এক প্রতিবেশী আপাকে দেখতাম তিনি তসবীহ হাতে গুনছেন আর একের পর এক হিন্দি সিনেমা দেখে সময় কাটাচ্ছেন। যাহোক আমরা যে মুসলিম পরিবারগুলো কী করছি তা হয়তো নিজেরাই জানি না। প্রায় প্রতিটি মুসলিম পরিবারেই সাংঘর্ষিক বিষয়গুলো গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে গেল।

- বিবেকবান পিতামাতার শিক্ষণীয় হিসেবে বর্তমানের টিভিতে প্রচারিত একটি নাটকের ঘটনা তুলে ধরা যাক। নাটকের নায়িকা তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে অবৈধ সম্পর্কের কারণে প্রেগনেন্ট হয়ে গেছে। বেশ কয়েকদিন যাবত বয়ফ্রেন্ড নায়িকার সাথে যোগাযোগ করছে না, তাই নায়িকা

বয়ফ্রেন্ডের খোঁজে তার এপার্টমেন্টে গেছে। সেখানে গিয়ে সে তার রুমমেট থেকে জানতে পারলো যে তার বয়ফ্রেন্ড এই বাসা ছেড়ে চলে গেছে! যাহোক নায়িকার পেটের সন্তান কিছুটা বড় হয়ে যাওয়াতে সে আর নিজের বাসায়ও ফিরে যেতে চাচ্ছে না। নায়িকা এবার তার বয়ফ্রেন্ডের রুমমেটের সাথেই বসবাস করা শুরু করলো। এবার রুমমেট নায়িকাকে প্রস্তাব দিচ্ছে গর্ভপাত করে ফেলার জন্য। কিন্তু নায়িকা এতে রাজি না। তখন রুমমেট নায়িকাকে প্রশ্ন করছে, লোকে যখন জিজ্ঞেস করবে যে এই সন্তানের পিতা কে তখন তুমি কী বলবে? নায়িকা উত্তর দিচ্ছে, বলবো "ঈশ্বরের সন্তান"। পাঠক আমি হয়তো সচেতন। আমি হয়তো এমন নাটক/সিনেমা দেখি না। কিন্তু আমি কি নিশ্চিত যে, আমার সন্তান এমন নাটক/সিনেমা দেখছে না? যদি নিশ্চিত না হই তাহলে একবার ভেবে দেখি আমাদের সন্তানরা কি ধরনের কন্টেন্ট গ্রহণ করছে! কতো ভয়ংকর দিকে চলে যাচ্ছে একের পর এক ভবিষ্যত প্রজন্ম।

নাটক-সিনেমার মাধ্যমে ব্রেইনওয়াশ

- আমরা জন্মের পর থেকেই শিখছি যে 'সাদা' মানেই ভালর প্রতীক আর 'কালো' মানেই খারাপের প্রতীক। যেমন শোক দিবসে কালো ব্যাজ, কালো পতাকা, কালো পোশাক। আবার খারাপ দিনকে কালো দিবস বলা ইত্যাদি। একইভাবে ভালোর প্রতিক হিসেবে আমরা দেখছি সাদা, যেমন সাদা পোশাক, সাদা পতাকা, শান্তির প্রতিক সাদা পায়রা ইত্যাদি। অর্থাৎ দিনের পর দিন এমন ভাবে আমাদের মনে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে যে সাদা মানে ভাল আর কালো মানে খারাপ, যা মোটেও ঠিক নয়।

- একইভাবে কিছু সংখ্যক ইসলাম বিদ্বেষী লোক দিনের পর দিন নাটক-সিনেমার মাধ্যমে আমাদের মনে ঢুকিয়ে দিয়েছে যে খারাপ চরিত্রের লোক মানেই মুখে দাড়ি, মাথায় টুপি-পাগড়ী, গায়ে জুব্বা ইত্যাদি। ভাবখানা এমন যে হুজুর-মাওলানারা হলেন যত বাজে কাজের মূল। এই কাজ এক দিনের নয় দুই দিনের নয়, বছরের পর বছর ধরে করে আসছে। বাংলাদেশের ৮৩% লোক মুসলিম হয়েও তা দেখে আসছে, সহ্য করে আসছে। যারা নাটক-সিনেমার মাধ্যমে ইসলামকে এভাবে দীর্ঘদিন ধরে উপস্থাপন করে আসছে তাদের সংখ্যা কিন্তু খুব বেশী নয় কিন্তু এরা বিশাল প্রভাব বিস্তার করে আসছে মিডিয়ার মাধ্যমে।

- এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার মিডিয়ার মাধ্যমে এটাকে সাপোর্ট করে ধামাচাপা দিতে চান। যেমন তারা বলতে চান যে অনেক নাস্তিকের মুখেও তো দাড়ি আছে তাতে কী হয়েছে? হ্যাঁ, আমরা জানি অনেক নাস্তিকরা বড়বড় দাড়ি রাখেন, বড়বড় মোছ রাখেন, চুল কাটেন না। কবি রবীন্দ্র নাথের মুখেও দাড়ি আছে, শিখদের মুখেও লম্বা দাড়ি আছে, তারাও পাগড়ী পরেন, হিন্দুরাও পাঞ্জাবী-পায়জামা পরেন, ইহুদীরাও লম্বা দাড়ি রাখেন, মাথায় টুপি পরেন, খ্রিষ্টান পাদ্রিরাও মুসলিম ইমামদের মতো জুব্বা পরেন, খ্রিষ্টান নান মহিলারাও হিজাব এবং বোরকা পরেন। তাই বলে নাটক সিনেমায় যাদেরকে নিয়ে কটাক্ষ করা হয় সেই গ্রুপ আর এই গ্রুপ এক নয়। এটা একটা কমনসেন্স যা সকলেই বুঝে।

ভুল সংস্কৃতি চর্চা করার প্রভাব

- শিরক হচ্ছে আল্লাহ-বিরোধী কাজ। মনে রাখতে হবে যে শিরকের গুনাহ আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করবেন না। আমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছি যে আমাদের মনে কালচার আর ফ্যাশনের নামে আল্লাহ-বিরোধী বিশ্বাস নিয়মিত ঢুকছে? যেমন, বৈশাখী মেলার নামে অনেক কাজকর্মই হয়ে থাকে যা সুস্পষ্ট শিরক এবং ইসলাম বিরোধী। বৈশাখী মেলার মঙ্গল শোভা যাত্রার জন্য যেসকল মূর্তি বানানো হয় তা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

- আমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছি যে আমরা সাধারণত কী ধরণের গান শুনে থাকি? রবীন্দ্র সঙ্গীত বলি, আর পল্লীগীতি বলি, আর মারফতি বলি, আর দেশাত্মবোধক বলি, আর লালনগীতি বলি, আর ব্যান্ড সঙ্গীত বলি এই ধরণের গানের অনেক কথাতেই রয়েছে শিরক!

- রক সঙ্গীত ঃ আজকালকার ছেলেমেয়েরা এটা খুব ভালবাসে। আমরা কি জানি এই রক সঙ্গীত (Rock music)-এর অনেক গায়করাই রীতিমতো ইবলিসের (শয়তানের) পূজা করে থাকে? এবং তাদের গানের কথাগুলো হচ্ছে ঐ শয়তানের ইবাদত? যেমন ঃ এ ধরণের একটি গানের লাইন "হে আমার প্রভু শয়তান ... আমাকে টানতে টানতে হেলে (জাহান্নামে) নিয়ে যাও ....."। এই সকল রকষ্টারগণ বিভিন্ন সময় নানা ধরনের চ্যারিটি কাজও করে থাকে। আর আমাদের সন্তানদের চোখে এরা আদর্শ মানুষরূপে গণ্য হয়। আমরা যারা মা-বাবা আমাদের দায়িত্ব সন্তানের চোখের সামনে সত্য ও মিথ্যাকে তুলে ধরা।

- এক মিনিট নিরবতা পালন ঃ বিভিন্ন জায়গায় মাথা নত করে সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি সুস্পষ্ট শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এই বিষয়গুলো আমরা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে না জানার কারণে নিয়মিত ভুল করেই যাচ্ছি, আর এই ভুল এমন এক ভুল যা কবীরা গুনাহ, যে গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না।

- সংস্কৃতির মাধ্যমে গণমানুষের মননশীলতা ও চিন্তাধারা গঠিত হয়। কিন্তু সাংস্কৃতিক অংগনে ইসলামের উপস্থিতি একেবারেই কম। মানসম্পন্ন ইসলামী গান-কবিতা, নাটক নেই।

মোমবাতি জ্বালানোর ইতিহাস

- স্যাটেলাইট টিভি আর ইন্টারনেটের বদৌলতে ঘরে ঘরে দেখেছি কিভাবে ভিন্ন ধর্মের মানুষেরা তাদের নিহত আত্মীয়স্বজনদের জন্য শোক প্রকাশ করে থাকে। যেমন তারা মৃতর জন্য ফুল দেয়, কার্ড দেয়, মোমবাতি জ্বালায়। তারপর থেকে আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে কিছু হলেই মোমবাতি জ্বালিয়ে নানা রকম শোক পালন বা উৎসব পালন করা হয়। এর আগে এই মোমবাতি জ্বালানোটা এতোটা প্রকট ছিল না। দিনের পর দিন এই মোমবাতি প্রজ্জ্বলন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মহল্লা, শহর, বিভাগ অর্থাৎ দেশের সর্বত্র পৌছে গেছে।

- অনেকেরই প্রশ্ন এই মোমবাতি জ্বালালে ক্ষতি কী? ইসলাম কেন এর বিরোধিতা করে? আসুন সংক্ষেপে এর ইতিহাস আলোচনা করি ঃ

  ইসলামী সন ৪০০ হিজরীর পূর্বেই সকল অগ্নিপূজকদের রাজ্যসমূহ মুসলিমদের দখলে এসে যায়। এরই মধ্যে 'বারামাকা' নামক এক শ্রেণীর অগ্নিপূজক প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করে কিন্তু সত্যিকার অর্থে মনেপ্রাণে তারা অগ্নিপূজকই থেকে যায়। তাই এরা মুসলিমদের ছদ্মাবরণে অগ্নিপূজার এক নতুন পন্থা হিসেবে উদ্ভাবন করে শবে বরাত নামক বিদ'আতটি। 'সলাতুর রাগায়েব' নামে চালু করে একটি সলাত (নামায)। এই সলাত ১০০ রাক'আত। এটাই শবে বরাতের সলাত বা সলাত বলে খ্যাত। তারা এ সলাতের জন্য জাঁকজমকের সাথে মুসলিমদের লেবাসে মসজিদে হাজির হত, সাধারণ মুসলিমদের মত সলাত আদায় করতো, কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল অগ্নিপূজা।

- এরা শবে বরাতে এই সলাতের জন্য মসজিদের ভিতরে ও বাইরে অসংখ্য আলো জ্বালাতো, সম্পূর্ণ মসজিদকে আলোতে ডুবিয়ে রেখে অগ্নিপূজার মন্দিরে পরিণত করতো। এভাবে আগুন দিয়ে গোটা মসজিদকে সাজিয়ে যখন সলাত আদায় করতো তখন তাদের চারদিকেই থাকতো আগুন। এই সলাত আদায় করার উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি নয় বরং আগুন পূজা ও আগুনকে সিজদাহ করানো। বারামাকা নামক সেই মুসলিম নামধারী ছদ্মবেশী অগ্নিপূজকদের ফাঁদে পা দিয়ে সরলমনা মুসলিমরাও মাসজিদে জমা হতো। আর এভাবেই তখন থেকে সওয়াবের কাজ মনে করে চলে আসছে শবে বরাত নামক বিদ'আতি প্রথাটি।

- আমাদের দেশেও এই দিনে আলোকসজ্জা করা হয় এবং একটি বিদ'আতি কাজকে গুরুত্ব দিয়ে সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়, আর আমরা সঠিক না জানার কারণে দেশবাসীরাও তা আনন্দের সাথে উদযাপন করি। যে সব ধরণের কাজ বা অনুষ্ঠান ইবাদত বা সওয়াবের কাজ বলে কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা স্বীকৃত নয়, রসূল ﷺ নিজে যা কখনো করেননি বা কাউকে কখনো করতে বলেননি, তাঁর সাহাবাদের সময়ও তা ইবাদত হিসেবে প্রচলিত ছিলো না এমন সব কাজ বা অনুষ্ঠানাদি সওয়াবের উদ্দ্যেশে পালন করার নামই বিদ'আত। রসূল ﷺ বলেছেন ঃ

দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নতুন আবিস্কৃত বিষয় বিদ'আত, প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক পথভ্রষ্টতার পরিণাম হল জাহান্নাম। (সহীহ মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

- তাই সওয়াবের কাজ হোক আর নাই হোক আগুন জ্বালিয়ে কোন প্রকার অনুষ্ঠান বা উৎসব করা ইসলাম-বিরোধী এবং এটি শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের দেশের মানুষ এই মোমবাতি জ্বালানোতে এতোটাই অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে অনেকেরই হয়তো এটা মেনে নিতে কষ্ট হবে। বিশেষ কারণে এভাবে মোমবাতি জ্বালানোকে মঙ্গল প্রদীপ নাম দিয়ে কাজটাকে আরো প্রবিত্রতার রূপ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ২০১৩ ইং সনে একটা ইস্যুতে ফেসবুকের মাধ্যমে প্রচার করে বাংলাদেশের একটা বড় অংশ (বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম) নির্ধারিত একটা রাতে যার যার বাসা অফিস দোকানে ১ মিনিট মোমবাতি জ্বালিয়েছে।

- তাই এই বিষয়ে আরো পরিষ্কার হওয়ার জন্য "ইসলামী আকীদার" উপর আরো অনেক গভীর জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। কারণ একজন মুসলিমের

ঈমানের মূলধনই হচ্ছে সহীহ আকীদা, কারো আকীদাই যদি ঠিক না থাকে তাহলে তার ঈমান নিয়ে সংশয় দেখা দেবে। তাই আগুন নিয়ে মুসলিমরা কী কী করতে পারবে আর কী কী করতে পারবে না তা প্রতিটি মুসলিমেরই জানা থাকা অবশ্যই কর্তব্য, কারণ এটি ঈমানের অংশ।

- **সমাধান ঃ** কয়েকটা বিষয় নিয়ে বাংলাদেশে ভুলবুঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় তর্কবিতর্ক হচ্ছে। বিষয়টা সকলের নিকট পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। সে বাঙালি হোক আর অবাঙালি হোক অন্য ধর্মের লোকেরা অবশ্যই মোমবাতি জ্বালিয়ে উৎসব করতে পারবে, শোক পালন করতে পারবে এতে ইসলামের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে কোন মুসলিম এই ধরণের কোন কাজ করতে পারে না, অর্থাৎ আগুন নিয়ে কোন উৎসব করতে পারে না। আরো অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কোন মুসলিম শিখা অর্নিবানে সম্মান প্রদর্শন করতে পারে না, কোন গেইমস বা অলিম্পিকের শুরুতে মশাল জ্বালাতে পারে না, মঙ্গল প্রদীপ জ্বালাতে পারে না, মঙ্গল শোভা যাত্রায় অংশগ্রহণ করতে পারে না, পহেলা বৈশাখ উদযাপন করতে পারে না, শহীদ মিনারে ফুল দিতে পারে না, কোন সৃতিসৌধে ফুল দিতে পারে না, কোথাও মাথা নত করতে পারে না, একমিনিট নিরবতা পালন করতে পারে না।

- এই বিষয়গুলো নিয়ে যেন আমরা নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি না করি। এর সাথে দেশের প্রতি ভালবাসার বা শ্রদ্ধার কোন সম্পর্ক নেই এবং এবিষয়ে কোন ভুলবুঝাবুঝির সৃষ্টি করা ঠিক নয়। এগুলো কোন ব্যক্তির মতামত নয়, বিষয়গুলো ইসলাম সমর্থন করে না। এই বিষয়গুলো মুসলিম বাদে সকল ধর্মের লোকেরাই পালন করতে পারবেন এবং তাদেরকে কোন প্রকার বাধাও দেয়া যাবে না। যদি কেউ নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবি করেন আর তিনি যদি এই কাজগুলো করেন তাহলে গুনাহগার হবেন। এবিষয়ে এটাই শেষ কথা।

- মুসলিমদেরতো প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করার কথা কিন্তু মুসলিম নামধারী কিছু মানুষ ঠিক মতো সলাত আদায় করেন না, রোযা রাখেন না, যাকাত দেন না, মিথ্যা কথা বলেন, চুরি করেন, ডাকাতি করেন, সুদ খান, ঘুষ খান, যিনা করেন, মানুষকে ঠকান, গীবত করেন, বেপর্দা চলেন, ওজনে কম দেন, আমানত খিয়ানত করেন, অন্যের হক নষ্ট করেন। এই কাজগুলো ইসলাম কখনোই সমর্থন করে না তারপরও মুসলিম

নামধারী কিছু মানুষ এগুলো অহরহ করে যাচ্ছে। আর এর জন্য তাদেরকে অবশ্যই কাল কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এসময় তাদের পক্ষে কথা বলা বা সুপারিশ করার জন্য কেউ থাকবে না।

গল্প-উপন্যাসের প্রভাব

- আমরা কি কখনো গভীরভাবে খেয়াল করেছি যে আমরা কী ধরনের বই বা গল্প-উপন্যাস-কবিতা পড়ছি? এবং এই ধরণের অনেক গল্প-উপন্যাস বা কবিতার মাধ্যমে খুব ধীরে ধীরে (স্লো-পয়জনিং) আমরা নানা রকম শিরকে আক্রান্ত হচ্ছি?

- আজকাল হাইস্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরাই বেশী গল্প-উপন্যাস পড়ে থাকে। এই পাঠক সমাজের জন্য এক শ্রেণীর লেখক-লেখিকাও তৈরী হয়েছে। তারা বেশীরভাগ সময় এই বয়সের ছেলেমেয়েদের উপযোগী করে তাদের মনের খোরাক যুগিয়ে গল্প-উপন্যাস লিখে থাকে। এই সকল গল্প-উপন্যাসগুলো যদি খুব গভীরভাবে বিশ্লেষণ (এনালাইসিস) করলে দেখা যাবে যে এদের একটি বিরাট অংশই আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে ইসলাম হতে দূরে সরে যেতে সহায়তা করছে। অল্প বয়স থেকে এই ধরণের লেখা পড়তে পড়তে একসময় মগজ ধোলাই (ব্রেইনওয়াশ) হয়ে যায়। ফলে বিভিন্ন রকমের ইসলাম-বিরোধী চিন্তা ভাবনা মাথার মধ্যে তৈরী হয়।

তাগুতের প্রভাব

- তাগুত হলো আল্লাহ বিরোধী শক্তি, এবং সেটা কোন মানুষও হতে পারে অথবা মানুষের তৈরী আইন-কানুনও হতে পারে।

- তাগুত বলতে সুস্পষ্টভাবে এমন শাসককে বুঝায় যে নিজে আল্লাহর আইন মানে না এবং অন্যকেও না মানতে বাধ্য করে। এবং যে আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে অন্য কোন আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে। আবার তাগুত বলতে এমন বিচার ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়েছে যা আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার আনুগত্য করে না এবং আল্লাহর কিতাবকে চূড়ান্ত সনদ হিসেবে স্বীকৃতিও দেয় না।

- তাই তাগুত অর্থ হলো যে কোন আল্লাহ বিরোধী বিদ্রোহী শক্তি। কাফির ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহকে অস্বীকার করে মাত্র। কিন্তু তাগুত মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব করতে বাধা দেয়, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার আনুগত্য করতে বাধ্য করে এবং রাষ্ট্রে ইসলাম-বিরোধী কার্যক্রম বিস্তার করতে সহায়তা করে। তাগুতের ভালো উদাহরণ হলো ফিরাউন যে মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য করতে বাঁধা দিত। আল কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

  হে নাবী! তুমি কি তাদেরকে দেখোনি, যারা এই মর্মে দাবী করে চলছে যে, তারা ঈমান এনেছে সেই কিতাবের প্রতি যা তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এবং সেই সব কিতাবের প্রতি যেগুলো তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছিল; কিন্তু তারা নিজেদের বিষয়গুলোর ফায়সালা করার জন্য 'তাগুতে'র দিকে ফিরতে চায়, অথচ তাদেরকে তাগুতকে অস্বীকার করার হুকুম দেয়া হয়েছিল? শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে সরল সোজা পথ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। (সূরা আন নিসা ৪ ঃ ৬০)

- কুরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও আল্লাহ বিরোধী তাগুতকে অস্বীকার করা, এ দু'টি বিষয় পরস্পরের সাথে অংঙ্গাগীভাবে জড়িত (Interconnected)। আল্লাহ ও তাগুত উভয়ের সামনে একই সাথে মাথা নত করাই হচ্ছে সুস্পষ্ট মুনাফিকী।

বিভিন্ন ফিলোসফি বা মতবাদের প্রভাব

- এগুলো শত শত বছরের আনইসলামী চিন্তাধারা। তর্ক শাস্ত্র (লজিক), - বিভিন্ন রকম ইজম যেমন ঃ কমিউনিজম, ক্যাপিটালিজম, সেক্যুলারিজম; বিভিন্ন রকম ফিলোসফি যেমন ঃ গ্রীক ফিলোসফি, পারসিয়ান ফিলোসফি, সম্রাট আকবরের প্রতিষ্ঠিত দ্বীন-ই-ইলাহী; বিভিন্ন রকম সংস্কৃতি যেমন ঃ ধ্রুপদী সংস্কৃতি, লালন সংস্কৃতি; বিভিন্ন রকম কলা যেমন ঃ শিল্পকলা, ললিতকলা ইত্যাদিও আমাদের সন্তানদের উপর দীর্ঘদিন ধরে প্রভাব ফেলে আসছে।

- ফিলোসফি মানে হচ্ছে অলীক, অস্তিত্বহীন বস্তুর পেছনে ধাওয়া করা। যেমন বলা হয়ে থাকে ঃ Philosophy is like searching for a black cat in a dark room where the cat is absent. ফিলোসফি হচ্ছে কল্পনা, যার সঠিক কোন ভিত্তিই নেই। এসব মানুষের জীবনে কোনই কাজে

আসে না। বরং সেসব মানুষকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দেখানো সরল-সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে নয়, পথভ্রষ্ট করে দেয়।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রভাব

- স্কুল, কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির অনেক শিক্ষকরাই নাস্তিক অর্থাৎ আল্লাহকে বিশ্বাস করেন না। এই সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মহান আল্লাহ তা'আলা যথেষ্ট ট্যালেন্ট দিয়েছেন অথচ তাদের এই ট্যালেন্টকে তারা আল্লাহ যে নেই তা প্রমাণ করার কাজে ব্যয় করেন। তাদের ট্যালেন্ট ও নানা ধরনের গুণের কারণে এক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী অনুসরণ করে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারকারী ধর্মবিরোধী নাস্তিকে পরিণত হয়।
- আবার দেখা যায় অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকারা নাস্তিক নয় অর্থাৎ তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করেন কিন্তু আল্লাহকে মানেন না। ইসলামের কথা শুনলেই তাদের মাথা ব্যথা করে। তারা আসলে ইসলাম বিদ্বেষী।

স্কুল-কলেজের প্রভাব

- স্কুল ম্যানেজমেন্ট যদি ইসলামী মনমানসিকতার না হয় তাহলে তাও শিক্ষার্থীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে।
- যেমন, স্কুলে যদি যোহর ও আসর সলাতের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে তো তা কারোরই পড়া হয় না। তার উপর যদি স্কুল থেকেও কোন চাপ না থাকে তাহলে তো কোন কথাই নেই।
- কোন কোন স্কুলের কর্তৃপক্ষ মেয়েদেরকে হিজাব করতে দেয়া হয় না, ছাত্রীদেরকে বেপর্দা হতে বাধ্য করে।
- এতো গেল বাংলা মিডিয়ামের স্কুলগুলোর কথা। কিন্তু নন-ইসলামিক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর অবস্থাতো আরো খারাপ। সেখানে তো ইসলাম চর্চা করার কোন সুযোগই নেই, যদি কোন ছেলেমেয়ে আগে থেকে কিছুটা ইসলামী মনমানসিকতার হয়েও থাকে তাহলে তাও তারা দিন দিন হারিয়ে ফেলে।
- আমরা যারা ইসলাম প্রাকটিস করি, সন্তানদের স্কুল নির্বাচনে যথেষ্ট সচেতন থাকবো। বাংলাদেশের ৭ বছরের দু'টি মেয়ের ঘটনা না বলে পারছি না।

মেয়ে দু'টি তাদের স্কুলকে খুব ভালোবাসতো। চমৎকার সেই স্কুলের পাঠ দান পদ্ধতি। টিচারগণও খুব আপন যোগ্যতা সম্পন্ন। অনেক প্রশংসা ঐ স্কুলের। ঐ স্কুলে ৪ বছর ধরে অধ্যায়ন করে আসছিলো তারা। ৭ বছরের মেয়ে একদিন তার টিচারকে প্রশ্ন করেছিলো অনেকটা এভাবে "এই স্কুলের মেয়েরা তো হিজাব করে না। আমি এখন মাঝে মাঝে হিজাব করি। যখন বড় হবো তখন সব সময় হিজাব করবো ইন্‌শাআল্লাহ। আমি কি তখন স্কুলেও হিজাব পড়ে আসতে পারবো?" এমন প্রশ্নের উত্তরে টিচার বলেছিল "না"। এই ঘটনা ছাড়াও আরো কিছু Anti-Islamic কার্যকলাপের জন্য এত পছন্দের আর ভালোবাসার স্কুল ত্যাগ করার জন্য মেয়ে দুটি তাদের মা-বাবাকে জানায়। এবং পরের বছরেই তারা অন্য স্কুলে চলে যায় যেখানে ইসলামী পরিবেশ আছে।

বিভিন্ন রকম ড্রাগ এবং মদ/বিয়ার পানের প্রভাব

- ইউনিভার্সিটি-কলেজের ছেলেমেয়েরা অনেকেই নিজেদের অজান্তে ড্রাগ এডিকটেড হয়ে পড়ছে। তারা হয়তো কোন বন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রথমে টেস্ট করতে গিয়েছিল। তারপর থেকে একটু একটু করে একসময় পুরোদমে এডিকটেড হয়ে পড়েছে। বাব-মায়েরা শুরুতে বুঝতে পারেন না কিন্তু যখন জানেন তখন আর তেমন কিছু করার থাকে না। অধিকাংশ বাবা-মায়েরাও সন্তানদেরকে ড্রাগের ক্ষতিকর বিষয়গুলি নিয়ে পূর্ব থেকে ধারণা দেয় না।

- মদ একসময় আমাদের দেশে খুব একটা সহজলভ্য ছিল না। বড় বড় হোটেলগুলোতে বিদেশী এবং হাই অফিসিয়ালদের জন্য রাখা হতো। কিন্তু এখন সিনারিও পাল্টে গেছে। মদ ও বিয়ার এখন চাইলেই পাওয়া যায়। ইউনিভার্সিটি-কলেজের ছেলেরা কোন না কোনভাবে এই পানীয়টার সাথে পরিচিত হয়ে যাচ্ছে, তারপর বন্ধু-বান্ধব মিলে নিয়মিত আড্ডাতে মদ/বিয়ার পান করা হয় ও ড্রাগ ব্যবহার করা হয়। এই খবর অনেক বাবা-মারাই জানেনই না, কারণ বাবা-মায়ের জন্য বিষয়টি ধরা খুবই কঠিন।

- কিছুদিন আগে (২০১৩) এক পুলিশ অফিসারের মাদকাসক্ত তরুণী কণ্যা নেশার টাকা না পেয়ে বাবা-মাকে খুন করিয়েছে- এটাই হলো আজ আমাদের প্রিয় বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা।

জুয়া খেলা ও সিগারেট খাওয়ার প্রভাব

- শুনলে অবাক হতে হয় যে কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া অনেক ছেলেরাই একত্রে বসে নিয়মিত টাকা দিয়ে জুয়া খেলে। বাবা-মা হয়তো এই ধরণের কথা কল্পনাও করতে পারেন না। কিন্তু এটা এতো বেশী বিস্তার লাভ করেছে যে আমাদের সন্তানদের জীবন ধ্বংস করে দিচ্ছে। ইউনিভার্সিটি-কলেজে পড়ুয়া ছেলেদের নিজস্ব রুম থাকে, সেখানে তার প্রাইভেসি থাকে। বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে যখন তারা আড্ডা দেয় তার কোন কন্ট্রোল বাবা-মার কাছ থাকে না। আর এই সুযোগ অনেকেই নেয় এবং দরজা বন্ধ করে জুয়া খেলে আর পর্নগ্র্যাফী দেখে।

- বিশেষ করে ছেলেরা কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে উঠে নিজেকে বড় ভাবতে থাকে, mature মনে করতে থাকে। আর এই ভাব প্রকাশের অংশ হিসেবে তারা বন্ধু-বান্ধবদের পাল্লায় পরে এক টান দুই টান দিতে দিতে সিগারেট পানে অভ্যস্ত হয়ে যায়। একটি গ্রুপে যে ছেলেটি সিগারেট খায় না, মদ খায় না, জুয়া খেলে না তাকে immature মনে করা হয়।

ছেলেমেয়েদের আপত্তিকর আনন্দ ফুর্তি (Fun)

- কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া অনেক ছেলেমেয়েরাই একত্রে বসে যখন আড্ডা দেয় তখন তারা নানা রকম আনন্দ ফুর্তি করে থাকে। ফুর্তিরও একটি মাত্রা আছে, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে ফুর্তির নামে তারা মাত্রা ছাড়িয়ে আপত্তিকর কাজকর্ম করতে থাকে। যেমন ঃ

    - ✍ আল্লাহ-রসূলকে নিয়ে নানা রকম কটূক্তি করা।
    - ✍ কুরআনকে নিয়ে কটূক্তি করা।
    - ✍ রসূল ﷺ -এর স্ত্রীদের নিয়ে আজেবাজে কথা বলা।
    - ✍ নামায-রোযা-হাজ্জ নিয়ে বাজে মন্তব্য করা।

- এখানেই শেষ নয়। তারা একে অপরের বাবা-মাকে নিয়েও ফান করে, মুরুব্বীদের নিয়ে ফান করে, মসজিদের ঈমাম-মুয়াজ্জিনকে নিয়ে ফান করে, আলেম-ওলামাদের স্ত্রীদের নিয়ে ফান করে, বোরকা পরিহিতা মহিলাদের নিয়ে ফান করে, নিকাব করা মহিলাদের নিয়ে ফান করে, দাড়ি-টুপি নিয়ে ফান করে।

- এখানে তাদের তেমন একটা দোষ দেয়া যাবে না। কারণ তারা এর জন্য কোন সঠিক শিক্ষা নিজ ঘর বা স্কুল বা সমাজ থেকে কোন দিন পায়নি। সব কিছুর একটা সীমা আছে, আমরা ভুলেই যাই যে সীমা লংঘনকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।

বুদ্ধিজীবীদের প্রভাব

- অনেক মুসলিম নামধারী বুদ্ধিজীবী আছে তারা আল্লাহর দেয়া ঐ বুদ্ধিকে আল্লাহরই বিরুদ্ধে কাজ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে। তারা বিভিন্ন রকম গবেষণা করে বের করার চেষ্টা করছেন যে কুরআনে কী কী ভুলভ্রান্তি আছে, ইসলামে কী কী shortcomings আছে বা ইসলামের কোন কোন বিষয়গুলো ঠিক নয় বা ইসলামের কোন কোন দিকগুলো backdated। রসূল ﷺ তার জীবনে কী কী ভুল (?) কাজ করেছেন ও তাঁর কোন হাদীসগুলো ঠিক নয় (?) ইত্যাদি। নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ কুরআনে যে বিষয়গুলোকে হারাম করেছেন তারা তার থেকে কিছু কিছু বিষয় যুক্তি দিয়ে হালাল করার চেষ্টা করছেন। কেউ কেউ আবার কুরআনকে revise করার জন্য প্রস্তাব দিচ্ছেন। তারা তাদের বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে কুরআন-হাদীসের বাইরে তাদের চোখে দেখা ইসলামের ভুল-ভ্রান্তির সমাধান পেশ করছেন, ইসলামকে আধুনিক করার চেষ্টা করছেন। নাউযুবিল্লাহ। তাদের এই অক্লান্ত প্রচেষ্টাও এক প্রকারের জিহাদ আর তা হচ্ছে শয়তানের পথে জিহাদ এবং আল্লাহ ও রসূল ﷺ -এর বিরুদ্ধে জিহাদ।

সংস্কৃতিমনাদের প্রভাব

- বছরের পর বছর ধরে দেখা গেছে সাধারণত যারা সংস্কৃতিমনা, নাটক, সিনেমা, গান-বাজনা, নৃত্য, কবিতা, আর্ট-কালচার ইত্যাদিতে জড়িয়ে পড়েন তাদের মনের মধ্যে একটা ধারণা জেঁকে বসে যে ইসলামের বিরোধীতা করতে হবে। ইসলাম থেকে দূরে সরে থাকতে হবে, ইসলাম পালন করলে সংস্কৃতিমনা হওয়া যাবে না। এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভুল।
- অথচ তাদের কেউ মারা গেলে তখন মৃত সংস্কৃতিমনার জন্য বিরাট জানাযা ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। ভাবটা এমন যেন মৃত্যুর পরেই

শুধু ইসলামের দরকার আছে, জীবিত অবস্থায় ইসলামের কোন প্রয়োজন নেই। যদিও ইসলাম এসেছে জীবিত মানুষের কল্যাণের জন্য।

- কোন কোন সংস্কৃতিমনার লাশ আবার ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী লাশ দাফন না করে কোন প্রতিষ্ঠানে দিয়ে দেয়া হয় ও মৃতের স্মরণে সংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রগতিশীলতার প্রভাব

- আমরা অনেকেই নিজেকে প্রগতিশীল মনে করি। বাস্তবে দেখা গেছে যে প্রগতিশীল হলে সর্বপ্রথমে জীবন থেকে ইসলামকে বাদ দিতে হবে। আর সুযোগ পেলেই ইসলামকে নানা ভাষায় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে হবে। অনেক প্রগতিশীলরাই মুসলিম পরিবারের সন্তান। এই প্রগতিশীলদের অন্য ধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সানন্দে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় কিন্তু তাদেরকে একমাত্র ইসলামী কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে সাধারণত দেখা যায় না।

ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশার প্রভাব

- আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা (গায়রে মুহাররাম) মহিলাদের নিকট গমন করা থেকে দূরে থাক।" (সহীহ বুখারী)
- আমর ইবনুল আস (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন, "নাবী ﷺ স্বামীদের অনুমতি ব্যতিরেকে মহিলাদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেছেন।" (তাবারানী)
- আল্লাহর রসূল ﷺ আরো বলেছেন, "যেই পুরুষ স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন মহিলার শয্যায় বসবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার জন্য একটি বিষধর অজগর সাপ নিযুক্ত করে দেবেন।" (মুসনাদে আহমাদ)
- রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোন মুহাররাম সংগী ছাড়া কোন মহিলা সফর করবে না এবং কোন মুহাররামকে সংগে না নিয়ে কোন পুরুষ কোন মহিলার কাছে যাবে না।" (সহীহ বুখারী)
- রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যেই ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী সেই ব্যক্তি কখনো একাকীত্বে কোন মহিলার নিকট বসবে না যদি সেই মহিলার

কোন মুহাররাম পুরুষ উপস্থিত না থাকে। কেন না তা করা হলে তৃতীয় পুরুষ হিসেবে উপস্থিত থাকে শয়তান।" (আহমাদ)

- আমর ইবনুল আস (রাদিআল্লাহু আনহু) কোন প্রয়োজনে আলী ইবনু আবী তালিবের (রাদিআল্লাহু আনহু)-র বাড়িতে যান। তিনি আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে পেলেন না। তিনি ফিরে গিয়ে আবার এলেন। এবারও আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে পেলেন না। ফিরে গিয়ে তৃতীয়বার এসে তিনি আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে পেলেন। আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন, "আপনার প্রয়োজন যখন ফাতিমার সাথে সম্পর্কিত ছিলো আপনি ফিরে না গিয়ে তার কাছে গেলেন না কেন?" জবাবে তিনি বললেন, "মহিলাদের স্বামীদের অনুপস্থিতিতে তাদের কাছে যেতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।" (সহীহ বুখারী)

- উপরের হাদীসগুলো থেকে আমরা অনায়াসেই বুঝতে পারছি যে ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা কীভাবে তাদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমরা হাদীসগুলি জানি না বলে ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশার বিষয়টিকে খারাপ চোখে দেখছি না। বরং হয়তো বাবা-মায়েরাই অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্রয় দিচ্ছি এবং এভাবে আমরাই আমাদের সন্তানদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরতে সাহায্য করছি।

বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড পিকআপ-ড্রপ

- ২০১৩ সালের কথা। ধানমন্ডি স্টার কাবাবে গিয়েছি পরের দিনের একটি প্রোগ্রামের বিরিয়ানির অর্ডার দেয়ার জন্য। যেতে যেতে একটু রাত হয়ে গিয়েছিল, আনুমানিক রাত ১১। আশ্চর্যের বিষয় হলো এতো রাতে গিয়েও দেখি স্টার কাবাব এর ৫-৬ তলা পুরো রেস্টুরেন্টটি কাস্টমারে পরিপূর্ণ। প্রতিটি টেবিলেই রয়েছে জোড়ায় জোড়ায় ইয়ং কাপল। অধিকাংশরাই বিশেষ সাজে সজ্জিত। তাদের সাজ সজ্জা, মেলামেশার ঢং দেখেই বোঝা যাচ্ছিল তারা বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে আছে অর্থাৎ বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড। তখন মনে প্রশ্ন জাগল এতো রাতে এতো কাপল কেন? পরে জানতে পেরেছি আজ ভ্যালেন্টাইস্ ডে।

- যা হোক এখন বাবামায়েদের নিকট প্রশ্ন, আমার যুবতী মেয়ে অথবা আমার যুবক ছেলে এতো রাতে কোথায় গেছে? কী করছে? আমার কী একটিবারও

চিন্তা হয় না! হয়তো রাতে এক সময় বয়ফ্রেন্ড মেয়েকে বাসায় ড্রপ করে দিয়ে যাবে। আমি বাবা-মা হিসেবে এই বিষয়টি কতো সহজভাবে নিচ্ছি! ওয়াষ্টার্ন দেশগুলোতে যেমন একজন মা খুবই চিন্তামুক্ত থাকে যদি তার মেয়ের একটি বয়ফ্রেন্ড থাকে। আজ আমাদের দেশের বাবামায়েদেরও হয়তো এই ধরনের মনমানসিকতা গড়ে উঠছে, যে আমার মেয়েতো তার বয়ফ্রেন্ডের সাথেই আছে, নিরাপদেই আছে। আমরা বাবা-মায়েরা কি এখনও বুঝতে পারছি না যে, আমাদের উদাসীনতার কারণেও আমাদের ছেলেমেয়েরা ইসলাম হতে দূরে সরে যাচ্ছে?

বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড কালচারের প্রভাব

- **একজন অভিভাবকের প্রশ্ন** ঃ বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচুর মিনি চাইনিজ রেষ্টুরেন্ট এবং সাইবার ক্যাফে গড়ে উঠেছে কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময় ও ভয়ের কারণ হলো যে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যবসার নামে চলে চরম বেহায়াপনা। বিভিন্ন স্কুল-কলেজে পড়ুয়া ছাত্ররা প্রেমের নামে প্রতারণা করে ছাত্রী মেয়ে বান্ধবীদেরকে নিয়ে এ সমস্ত চাইনিজ ও সাইবার ক্যাফেতে সারাদিন আড্ডা দেয় এবং মেয়েদের সরলতার সুযোগ নিয়ে তাদের ইজ্জত লুণ্ঠন করে। আমাদের কোমলমতি মেয়েদেরকে ব্ল্যাক মেইলিং করে তাদের পর্নো সিডি/ডিভিডি বাজারে ছেড়ে অশ্লীলতার এ মহোৎসব শুরু করেছে, বিশেষ করে স্কুল-কলেজ পড়ুয়া বোনেরা এর শিকার হয়ে জীবনের মহামূল্যবান সম্পদ হারাচ্ছে। এ সম্পর্কে ইসলামের বিধান কী?

- **উত্তর** ঃ এ সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য পরিষ্কার। ইসলাম অন্যায়কে কখনোই মেনে নেয় না। অসৎ কর্মকে কখনোই সমর্থন করে না। পাপ ও ঘৃণাজনক কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগায় না। পৃথিবীর বুকে একমাত্র ইসলামই সর্বক্ষেত্রে মানবতার কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় সদা সচেষ্ট। তাই উল্লিখিত পরিস্থিতিতে যারা অন্যায় বৃদ্ধি করার মতো পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরী করে দিচ্ছে (সরকার এবং প্রতিষ্ঠানের মালিক পক্ষ) আর যারা অন্যায় কাজে লিপ্ত হচ্ছে (ছাত্র-ছাত্রী বা যুবক-যুবতীরা), সবার জন্যই ইসলামী বিধান অনুযায়ী শাস্তি অবধারিত।

- অবশ্য এ প্রশ্নে অভিভাবক ছাত্রী বা মেয়েদের অবলা বা সরলা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এমন ক্ষেত্রে ছাত্রী বা মেয়েদের প্রতি লক্ষ্য করে জবাব হচ্ছে ঃ এগুলো আরও বাড়বে যদি মেয়েরা তাদের সম্মান সম্পর্কে সতর্ক না

হয়। এখন প্রশ্ন ঃ মেয়েরা ছেলেদের সাথে বন্ধুত্ব করতে যাবে কেন? এবং তাদের দাওয়াতে কোন রেষ্টুরেন্টে অথবা কোন সাইবার ক্যাফেতে তারা যাবে কেন? আর যখন প্রশ্নকর্তা বলছেন 'মেয়েদের সরলতা নিয়ে' ছেলেরা এমনটি করছে। এক্ষেত্রেও দায়ী মেয়েরা কারণ এমন সরলতার কোন দাম নেই। সরলতার কারণে কি কেউ বিষ খায়? সরলতার কারণে কি কেউ গলায় দড়ি দিয়েছে বা পানিতে ডুবে মরেছে! এরকমতো হয় না। এটা কি ধরনের সরলতা?

- যুবতী মেয়ের ভাবা উচিত তার জীবনের মূল্যবান সম্পদ তার সতীত্ব। যার সাথেই টেলিফোনে কথা হোক আর ক্লাসমেট হোক বা অন্যকেউ হোক, যে কারো সাথে বন্ধুত্ব বানিয়ে কোন জায়গায় বেড়াতে যাবার অর্থ সরলতা নয় বরং এটা চরম বোকামি ও জেনে শুনে নিজের ঘাড়ে ভয়ংকর বিপদের বোঝা চাপানো। একবার নির্জনে এসব তথাকথিত ছেলেবন্ধুর সাথে ঘনিষ্টতা করলে নিজের দুনিয়া ও আখিরাত দুটোই নষ্ট হবে। তার পরবর্তী জীবন আর সহজ থাকে না। খুব কঠিন হয়ে যায়। অনেকে সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যাও করে। এসব ঘটনা দেশের নামকরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও খুব দেখা যাচ্ছে।

- এসব বিপদ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো ছাত্রী জীবনে কোন ছেলেদের সাথে অবৈধ মেলামেশা বা প্রেমে লিপ্ত না হওয়া। বিয়ের আগে প্রেম অর্থাৎ বিবাহ-বহির্ভূত প্রেম ইসলাম হারাম করেছে। ইসলামে এটা জায়েয নেই। এতে নিজের সর্বনাশ করা ছাড়া আর কোন লাভ নেই। কাজেই এটাকে সরলতা বা কোমলতা কোনভাবেই বলা যায় না। এটা যেন ইচ্ছে করেই সাপের কামড় খাওয়া বা ইচ্ছে করে গর্তে পড়ে আত্মহত্যা করার শামিল।

- সুতরাং কোন (তথাকথিত) পুরুষ বন্ধুর সাথে কোন মেয়ে ঘরের বাইরে যাওয়া মোটেই উচিৎ নয়। ছেলেমেয়েদের নৈতিক শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে পিতা-মাতাদেরকে আরো বেশী সতর্ক হওয়া উচিত। আল্লাহ আমাদেরকে ও আমাদের সন্তানদেরকে হিফাযত করুন।

'লিভ টুগেদার' ও "এম.আর." অতি সাধারণ বিষয়

- ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে বিয়ে না করে একটি ছেলে ও একটি মেয়ের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করা ইসলামী শরীআত অনুসারে হারাম, শক্ত গুনাহের কাজ। অথচ এই বিষয়টি এখন বৈধ ও গ্রহণযোগ্য কাজে পরিণত হয়েছে।

- শুধু এম.আর. (M.R.) অর্থাৎ গর্ভপাত (Abortion) করার জন্য ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য শহরগুলোর আনাচেকানাচে শতশত ক্লিনিক হয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় এদের কমিশনভিত্তিক এজেন্ট নিয়োগ করা রয়েছে। এই ক্লিনিকগুলোর মূল ব্যবসাই হচ্ছে অবৈধ গর্ভপাত করানো। একটি দৈনিক প্রত্রিকার সাক্ষাৎকারে একজন মহিলা ডাক্তার দুঃখ করে বলেছেন যে এই কাজের জন্য তারা সবচেয়ে বেশী কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অবিবাহিতা মেয়েদেরকে পেয়ে থাকেন।

- অবৈধ গর্ভপাত করানো খুব সহজলভ্য হওয়াতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে অবৈধ মেলামেশাও বেড়ে গেছে। তারা এখন আর অনৈতিক কাজ করতে মোটেও চিন্তা করে না।

- কনডম (condom)-এর অপব্যবহার ঃ 'কনডম' আমাদের দেশে আনা হয়েছিল বিবাহিত দম্পতিদের জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু বর্তমানে অবিবাহিত যুবক-যুবতীরা এর সাহায্য নিয়ে অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণ (unwanted pregnancy) এড়িয়ে অবাধে বিবাহ-বহির্ভূত যৌনকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। তবে যারা ফেসে যাচ্ছে তারাই ক্লিনিকে দৌঁড়াচ্ছে M.R. করার জন্যে।

'ভ্যালেন্টাইন'স ডে'-র প্রভাব

- বেশ কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে 'ভ্যালেন্টাইন'স ডে' বা 'ভালবাসা দিবস' নামে এই নতুন দিবসটি খুব উৎসাহ সহকারে উদযাপন করা হচ্ছে। আগে শুধু এ দেশেই নয়, বেশির ভাগ মুসলিম দেশেই এটা পালিত হতো না। 'ভালবাসা দিবসে'র ইতিহাস ও ভিত্তি কী তা বেশির ভাগই জানে না।

- খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রোমানরা এটা শুরু করেছিল পৌত্তলিক পার্বণ হিসেবে। 'উর্বরতা ও জনসমষ্টির দেবতা' লুপারকাসের সম্মানেই এটা করা হতো। এর প্রধান আকর্ষণ ছিল লটারি। 'বিনোদন ও আনন্দে'র জন্য

যুবকদের মাঝে যুবতীদের বণ্টন করে দেয়াই ছিল এ লটারির লক্ষ্য। পরবর্তী বছর আবার লটারি না হওয়া পর্যন্ত যুবকেরা এ 'সুযোগ' পেত।

- বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম। মূলতঃ ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী 'ভালবাসা দিবস' বলতে কিছু নেই। প্রতিটি মুসলিমের জন্য প্রতিটি দিবসই ভালবাসার দিবস। আসলে Islam শব্দের উৎপত্তিই হচ্ছে peace থেকে। তাই ইসলাম বছরের ৩৬৫ দিনই শান্তির কথা বলে, ভালবাসার কথা বলে। ইসলামে ভালবাসাবিহীন কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম বলে প্রতিটি মানুষ প্রতিটি মানুষকে বৈধভাবে ভালবাসবে, একজন আরেকজনের মঙ্গল কামনা করবে। এর মধ্যে থাকবে না কোন কৃত্রিমতা, থাকবে না কোন লৌকিকতা, থাকবে শুধু পবিত্রতা।

- অভিভাবকগণ এতক্ষণ আমরা ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা হতে শুরু করে বয়ফ্রেন্ড/গার্লফ্রেন্ড, লিভটুগেদার, এম.আর ইত্যাদি নিয়ে আলোকপাত করলাম। আজ হতে অনেক বছর আগে হয়তো আমরা পারিবারিক পর্যায়ে আমাদের সন্তানদের অবাধ মেলামেশা মেনে নিয়েছি। সেটাই ক্রমে এখন জাতীয় পর্যায়ে পালিত হয় নির্দিষ্ট একটা দিনে। একবার ভেবে দেখি, অন্যায় কাজটা এতোটাই সহনশীল হয়ে গেছে যে, আজ ঢাকঢোল পিটিয়ে নির্দিষ্ট দিনে সকলে মিলে একসাথে অন্যায় সম্পর্কের চর্চা করে যাচ্ছে। ভয়াবহতাটা কি উপলব্ধী করতে পারছি? এভাবে হয়তো ভবিষ্যতে একটা সময় সীমালঙ্ঘন করে ফেলবে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম।

কো-এডুকেশনের প্রভাব

- কো-এডুকেশন মানে ছেলেমেয়েরা একই সময়ে একই স্থানে, একই শ্রেণীকক্ষে বসে পড়ালেখা করা। যার দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল অনেক ক্ষেত্রেই খারাপ হচ্ছে। এতে নানা ধরণের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রেই ছেলেমেয়েদের মাঝে অবৈধ সম্পর্কের প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। যদিও পশ্চিমা দৃষ্টিতে ও আইনানুসারে এই সম্পর্ক বৈধ। চলুন এ সম্পর্কে বাংলাদেশের একটি চিত্র দেখি।

- বাংলাদেশ অবজার্ভার পত্রিকায় ডা. সাবরিনা কিউ রশীদ একটি আর্টিক্যালে লিখেছেন, 'পূর্বে কখনো আমরা ডাক্তারেরা এত অধিক সংখ্যক অবিবাহিত অল্প বয়স্ক মেয়েকে গর্ভবতী হতে দেখিনি'। তিনি এ মন্তব্য সহশিক্ষা

প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের সম্পর্কে করতে গিয়ে প্রবন্ধে উল্লেখ করেন - ছাত্র-ছাত্রীদের পারস্পরিক কথাবার্তা শেষ পর্যন্ত আর শুধু কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এগুলো পরবর্তীতে স্পর্শ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এ বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যৌন হরমোনের নিঃসরণ হওয়ায় যে কোন স্পর্শ শরীর ও মনে আগুন ধরিয়ে দেয়। এটি ছেলেদের ক্ষেত্রে বেশি ঘটে। কেননা মেয়েরা একটু ঠাণ্ডা হলেও ছেলেরা অনেক বেশি আবেগপ্রবণ। সুতরাং মেয়েরা ছেলেদের বন্ধু হিসেবে নিতে চাইলেও ছেলেরা তার চেয়ে অনেক বেশি ভাবে।

- সেজন্য ডা. সাবরিনা সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের ছেলেদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা না করতে এবং নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করে চলতে বলেছেন। ডা. সাববিনা রশীদের পরামর্শ যুক্তিযুক্ত। বাংলাদেশের মতো একটি মুসলিমপ্রধান দেশের চিত্র যদি হয় এমন তাহলে আমাদের অবশ্যই সেটা গুরুত্বসহকারে ভেবে দেখতে হবে।

- তাছাড়া চিন্তা করা উচিত যে ছেলেমেয়েদেরকে দুটো ভিন্ন আঙ্গিকে, ভিন্ন মেজাজে, ভিন্ন চাহিদা ও শারীরিক গঠনে, ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন বস্ত্র পরিধান করার আদেশ দিয়ে স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন। তাহলে কিভাবে তাদের মধ্যে স্রষ্টার আদেশ ব্যতিরেকে মিল বা বন্ধুত্ব হতে পারে? (বিয়ে ছাড়া কি সম্ভব!) তবে যেহেতু এদের সাথে ক্লাস করতেই হচ্ছে কাজেই তাদের উভয় পক্ষেরই আচরণ অত্যন্ত ফর্মাল হওয়া উচিত, ঘনিষ্ট নয়, যাতে ক্ষতিকর কিছু ঘটার সুযোগ না থাকে।

- ইসলাম ছেলেমেয়েদেরকে অবাধে চলাফেরা করা, বিনা প্রয়োজনে পাশাপাশি বসে কথা বলা, রাস্তা দিয়ে যাওয়া, শপিং মলে একসাথে কেনাকাটা করতে যাওয়া ইত্যাদি নিরুৎসাহিত করেছে। অফিসে বা কর্মস্থলে পুরুষ ও মহিলা একটা নিরাপদ দূরত্ব ব্যতিরেকে পাশাপাশি কাজ করাও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ছেলে ও মেয়ে উভয়েই মানুষ; কিন্তু তাদের মাঝে ভিন্নতাও আছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মেয়েদের দেহকে কোমলরূপে সৃষ্টি করেছেন। নম্রতা, বিনয়, মায়া মমতার আধিক্য এবং প্রখর সৌন্দর্যানুভূতি তাঁদের চরিত্রের ভূষণ। ফলে তারা সহজেই অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন।

- আমরা যতক্ষণ আল্লাহর হুকুম বা বিধান মেনে চলবো, ততক্ষণ আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি আমাদের পক্ষ হয়ে আমাদের সাহায্য করবে। যেমন আগুন

সাহায্য করেছিল ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম)-কে। পানি সাহায্য করেছিল মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে, ছুরি সাহায্য করেছিল ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-কে। আর যদি আল্লাহর বিধান অমান্য করে নিজের খুশিমতো খামখেয়ালীভাবে চলাফেরা করি, তবে আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। যেমন লোহিত সাগরের (Red Sea) পানি ফিরাউনের বিরুদ্ধে লড়েছিল, আল্লাহর সৃষ্টি মশা যেমন নমরূদের বিরুদ্ধে লড়েছিল, আবাবিল পাখি যেমন লড়েছিল বাদশা আবরাহা ও তার বিরাট হাতী ও সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে ইত্যাদি।

উচ্চ শিক্ষিতদের চিন্তাধারা

- একটি ইউনিভার্সিটি চত্তরে রাতভর নাচ-গান-আলোচনা সভাতে শতশত ছেলেমেয়ে একসাথে অনুষ্ঠান উপভোগ করছে। যুবতী মেয়েরা সারা রাত সেখানে কাটাচ্ছে, অনেক অভিভাবকরাই সেটা ভাল চোখে দেখছেন না। এই বিষয়ে কিছু টিভি চ্যানেলে সামান্য কিছু আলাপ আলোচনা হচ্ছে।

- এরকম একটি টকশোতে ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসরও এসেছিলেন বক্তা হিসেবে। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে "এই যে যুবতী মেয়েরা রাতভর সেখানে কাটাচ্ছে আপনি এ বিষয়ে কী মনে করেন বা আপনার অভিমত কী?" তিনি উত্তরে বলেছিলেন যে "এতে অবাক হওয়ার কী আছে, আমি তো এতে খারাপ কিছু দেখছি না, আমিওতো আমার ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া মেয়েকে গতরাত থেকে সেখানে নিজে দিয়ে এসেছি।"

অবৈধ বা হারাম উপার্জনের প্রভাব

- প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর জন্য হালাল রুজির সন্ধান করা অবশ্যকর্তব্য। কেননা হালাল সম্পদ বা খাদ্যই হলো ইবাদত কবুলের শর্তসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রধান শর্ত। হালাল উপায়ে অর্জিত ও শরীয়ত অনুমোদিত অর্থ-সম্পদ বা খাদ্যগ্রহণ ছাড়া আল্লাহর দরবারে কোন ইবাদতই কবুল হয় না। জীবিকা নির্বাহের জন্য উপার্জনের গুরুত্ব ইসলামে যেমনি রয়েছে, ঠিক তেমনি হালাল উপার্জনের গুরুত্বও অত্যধিক। ইসলাম অর্থসম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের পার্থক্য সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির জন্য কল্যাণকর যাবতীয় ব্যবস্থাকে ইসলাম হালাল করেছে।

- পাঠক, আমি/আপনি যদি এক বা একাধিক সন্তানের অভিভাবক হয়ে থাকি, নিজেকে প্রশ্ন করে দেখি তো আমার সন্তানকে কখনো হালাল/হারাম উপার্জন নিয়ে সুপরামর্শ দিয়েছি কিনা বা এ বিষয়ে আল্লাহর কি হুকুম তা জানিয়েছি কিনা?

- ইসলাম মানুষের জন্য হালাল ও হারামের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নিরূপণ করেই থেমে থাকেনি, বরং হালাল উপার্জনের দিয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশনা। (রেফারেন্স সূরা জুমা ৬২ ঃ ৯-১০) ফরয ইবাদত সমূহের আদায়ের পর এ মহতি কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করা হয়েছে। উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল ও বৈধ উপায় অবলম্বন করা ব্যবসায়ীসহ সকল মানুষের উপর ইসলামের একটি অলঙ্ঘনীয় বিধান। যারা উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল ও হারামের প্রশ্নে সতর্কতা অবলম্বন করে না তাদের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ ﷺ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ মানুষের নিকট এমন একটি সময় আসবে যখন সেই ব্যক্তি কোন উৎস থেকে সম্পদ আহরণ করছে, তা হালাল না হারাম, সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ করবে না। (সহীহ বুখারী)

- হালাল উপার্জন (ইনকাম) ইবাদত কবুল হবার পূর্বশর্ত। হারাম খেয়ে আমরা যতই সিজদা দেই না কেন, কোন লাভ নেই। হারাম উপার্জনে পালিত সন্তান ইসলামী তরীকায় মানুষ হবারও কোন সম্ভাবনাই নেই।

সর্বত্র দুর্নীতির প্রভাব

- আমরা জানি যে সারা বিশ্বে বাংলাদেশ দুর্নীতিতে কয়েকবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আমাদের দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতির ভয়াবহতা আমরা সকলেই কমবেশী জানি। এই দুর্নীতি দেখতে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি, আর সেই সাথে আমাদের বিবেকও ভোঁতা হয়ে গেছে।

- আমাদের সন্তানেরা জন্মের পর থেকেই দেখে আসছে দুর্নীতির দাপট। নিজের বাবা, মা, চাচা, মামা, খালু, ভাই, বোন সকলেই কম বেশী দুর্নীতি করছে। দুর্নীতি করছে করছে মন্ত্রী, এমপি, মেয়র, কমিশনার, চেয়ারম্যান, শিক্ষক-শিক্ষিকা, পুলিশ, বিডিআর, ডাক্তার, নার্স, কম্পাউন্ডার, ইঞ্জিনিয়র, কন্ট্রাক্টর, জজ, উকিল, মোক্তার, পিয়ন, ব্যবসায়ী, সরকারী, আধাসরকারী, বেসরকারী কর্মকর্তারা। এদের লিস্ট করে শেষ করা যাবে না।

- আমাদের এক পরিচিত ভাই তিনি একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর ডাইরেক্টর। তিনি তার স্ত্রীকে নিয়ে বিদেশে যাচ্ছিলেন বেড়াতে। তাদের ভিসাসহ সকল কাগজ-পত্রই রয়েছে ঠিক মতো। কিন্তু ঢাকা এয়ারপোর্টে কাস্টমস অফিসার তাদেরকে আটকিয়েছে যে 'আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে যে বিদেশে যাচ্ছেন তার ফরেন মিনিষ্ট্রি থেকে এন.ও.সি লাগবে'। তখন ঐ ভাই একটু বিরক্ত হয়ে কাস্টমস অফিসারকে বলছেন 'ভাই কেন দুই নাম্বারী করছেন?' প্রতি উত্তরে কাস্টমস অফিসার বলছেন যে 'দুই নাম্বারীর দেখেছেন কি? দশ নাম্বারী করার জন্য ঘুষ দিয়ে এই পদে চাকুরী নিয়েছি।'

- পাঠক আপনি/আমিও হয়তো নিজ সন্তানকে ওর শিশুকাল হতে দুর্নীতি শেখাচ্ছি, সেটা কি জানি? যেমন ঃ

  - ✓ হয়তো সন্তানকে ডাক্তার দেখাতে গিয়েছি। আমার এপয়েন্টমেন্ট অনেক পরে, আর অপেক্ষা করতে ইচ্ছে করছে না। তখন আমি হয়তো সন্তানকে কোলে রেখেই ঘুষ দিয়ে সময়টা আগিয়ে নিলাম!
  - ✓ ট্রাফিক সার্জন হয়তো আমার গাড়ির কাগজ পত্রে সমস্যা পেলো তখন আমি কিছু ঘুষ দিয়ে মুক্তি পেলাম!
  - ✓ সন্তানকে ভাল স্কুলে ভর্তির জন্য ডোনেশন (ঘুষ) সংক্রান্ত কার্যকলাপ হয়তো সন্তানের সামনেই করলাম বা সন্তানের সামনেই এ বিষয়ে কথা পাকাপাকি করলাম!
  - ✓ আমার সন্তান হয়তো পরীক্ষায় ফেল করেছে কিন্তু আমি অবৈধ পথে সেটাকে পাশ করিয়ে নিলাম!
  - ✓ টেলিফোন আসলে সন্তানকে দিয়ে ফোন রিসিভ করিয়ে তাকে বলছি বলো বাবা বাসায় নেই!
  - ✓ এসব ঘটনা আমাদের সন্তানরা শিশুকাল হতে দেখে দেখে বড় হচ্ছে। আর এদের মাঝেই কেউ কেউ বড় হয়ে ঘুষ নেবার কাজটা করছে, দুর্নীতি করছে!

- পাঠক দেখুন, আমরা মা-বাবারা যদি ইসলামের পথে থাকতাম এবং সকল ক্ষেত্রে ন্যায়ের উপর থাকতাম কেবল মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, আমাদের সন্তানরাও সেভাবেই বড় হতো এবং ইসলাম হতে দূরে সরে যেতো না।

রাজনৈতিক প্রভাব

- ছেলেমেয়েরা কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পরপরই তারা নানাভাবে রাজনীতির সাথে জড়িয়ে যায়। বিভিন্ন নেতার আদর্শ অনুসরণ করে। তখন তাদের কাছে ইসলামের আদর্শের চেয়ে তার দলের আদর্শ বড় হয়ে দাঁড়ায়। এভাবেই দিন দিন তার চারিত্রিক আদর্শ গড়ে উঠতে থাকে। আমরা যদি বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকাই তাহলে দেখি যে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কোন রাজনীতি নেই। ছাত্রছাত্রীরা কোন রাজনীতি করে না। অথচ তারা জীবনে খুবই উন্নতি করছে।

- **ছাত্র রাজনীতি** ঃ উন্নত দেশগুলোর ইউনিভার্সিটিতে কোন রাজনীতি নেই। শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীরা কোন প্রকার রাজনীতি করেন না। তারা পড়া-লেখা নিয়ে এতোই ব্যস্ত থাকেন যে এগুলো করার সময় কোথায়? এছাড়া কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির কোর্সগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা যে কেউ নিয়মিত পড়া-লেখা না করলে এবং ক্লাসে উপস্থিত না হলে পরীক্ষায় কোনভাবেই পাশ করতে পারবে না। কেউ কোন অস্ত্র বহন করতে পারে না আর রাজনৈতিক দলগুলোও কাউকে কোন অস্ত্র সাপ্লাই দেয় না।

- **ইউনিভার্সিটিতে ভিপি পদ** ঃ উন্নত দেশগুলোর ইউনিভার্সিটিগুলোতে কোন দলাদলি নেই, কোন ক্যাডার নেই, ভিপি বলতে কোন পদ নেই, কেউ ভিপি পদের জন্য ইলেকশানও করে না। ছাত্রদের মধ্যে কেউ কাউকে চাপাতি দিয়ে কোপায় না বা ছাত্রীদের মধ্যে চুল ধরে টানাটানিও হয় না। ইউনিভার্সিটির হল দখল হয় না, খুনাখুনীও হয় না। ছাত্রদের এরকম কাজকর্ম কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

- পাঠক আপনি/আমি যদি এই সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উচ্চ পদস্থ কেউ হই তাহলে মনে রাখবো এটা আমারই দায়িত্ব। আল্লাহ আমাকে এই পদে এনে দিয়েছেন এবং এটা আমার জন্য একটা পরীক্ষা। আমি কি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করছি দেশের শিক্ষা পদ্ধতিতে সঠিক পরিবর্তন আনতে বা শিক্ষার পরিবেশ সুস্থ রাখতে?

ইসলামের দৃষ্টিতে "শহীদ" কে?

- এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের দেশের বেশীরভাগ মানুষই পরিষ্কার ধারণা রাখে না। যে কাউকে যখন তখন শহীদ উপাধি দিয়ে দেয়া হয়। যেমন

দেখা গেছে যে হিন্দু মারা গেলেও বলা হয় শহীদ, আবার নাস্তিক মারা গেলেও তাকে শহীদ উপাধি দেয়া হয় এবং বিরাট আয়োজন করে স্বঘোষিত নাস্তিকের জানাজা পড়ানো হয়। কী আশ্চর্য!

- এবার জানা যাক ইসলামের দৃষ্টিতে আসলে শহীদ কে? সহীহ বুখারীর হাদীস অনুযায়ী ৫ প্রকার 'প্রকৃত মুসলিম' মারা গেলে শহীদ হয়। যেমন ঃ ১) মহামারীতে ২) পেটের পীড়ায় ৩) পানিতে ডুবে ৪) ধ্বংসস্তূপে চাপা পরে এবং ৫) আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে। অন্যান্য বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। শুধু শেষের বিষয়ে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর পথে কাজ করতে গিয়ে, দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে, দ্বীনের কথা বলতে গিয়ে, দ্বীনের জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে মারা যান শুধু মাত্র তাকেই শহীদ বলা হয়। তবে কে শহীদ, কে জান্নাতী, কে জাহান্নামী এই ডিকলারেশনের অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি। এই অধিকার শুধু মহান আল্লাহ তা'আলার। কেউ আল্লাহর এই অধিকার নিজের হাতে নিতে পারবে না। কে সত্যিকারভাবে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছে সেটাও তো সিদ্ধান্ত হবে কিয়ামতের দিনে। আমরা রসূল ﷺ -এর জীবনীতে দেখেছি যে কোন এক ব্যক্তি রসূল ﷺ -এর সাথে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মারা গেছেন কিন্তু তাকেও শহীদ বলা হয়নি। তাই কারো অন্তরের খবর একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলাই জানেন।

- ইসলামের দৃষ্টিতে পরিস্কারভাবে আমাদের জানা থাকা প্রয়োজন যে কোন হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, ইহুদী, নাস্তিক, মুরতাদ, মুনাফিক, বেনামাযী কখনো শহীদ হতে পারে না। কারণ বিষয়টা তাদের জন্য না। শহীদ হতে হলে প্রকৃত ঈমানদার, মু'মিন, মুসলিম হতে হবে, আংশিক ঈমানের অধিকারী হলেও হবে না। অর্থাৎ যদি আমি ইসলামের কিছু অংশ মানবো আর কিছু অংশ মানবো না বলে মত পোষণ করি তাহলে আমি প্রকৃত মুসলিম হতে পারবো না। যেমন শরীয়া মতে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াক্ত সলাত আদায় না করলে সে আর মুসলিম থাকে না। এর বিস্তারিত কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলিল আমরা ৪র্থ পরিচ্ছেদে দেখতে পাবো, ইনশাআল্লাহ।

- আমি সারা জীবন ইসলামের বিরোধিতা করলাম, ইসলামের কোন আইন মানলাম না, ইসলামের পক্ষে এক কলম লিখলাম না, ইসলামের পক্ষে কোন কথা বললাম না, ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দিতাম, বেপর্দায় চলতাম আর অতি সহজেই শহীদ হয়ে গেলাম! তা হবে না।

- একবার ভেবে দেখি, আমরা ইসলাম সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করি না বলে শহীদের মতো এতো মর্যাদার বিষয়টিতেও ভুল ধারণা পোষণ করি। আমাদের মাঝে যদি জ্ঞানের ঘাটতি থাকে তাহলে আমাদের সন্তানরা কিভাবে যোগ্য মুসলিম হবে?

নাস্তিকের হাজ্জ পালন ও মুসলিম হবার দাবি

- অনেক নাস্তিকরাও আজকাল হাজ্জ করে, নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে। কিন্তু এটি কি কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার? হাজ্জ তো অনেক খারাপ লোকও করে। এধরনের দুশ্চরিত্র লোক তো মাথায় টুপি লাগায়, লম্বা দাড়িও রাখে। তাতে কি তার আল্লাহভীতি বা ধর্মপরায়ণতা বাড়ে? এই ধরনের লোকেরা এবং ওদের কাজকর্ম অনেকটা দায়ী যার কারণে মুসলিম পরিবারের সন্তানরা ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়।

- ঈমানের প্রতিফলন হয় ব্যক্তির কথা-বার্তা, আচার-আচরণ ও কাজকর্মে। ঈমান যাচাই হয়, লড়াইয়ের ময়দানে ব্যক্তিটি কোন পক্ষকে (আল্লাহ না তাগুত) সমর্থন করে সংগ্রাম করলো তা থেকে। কতো দাড়ি টুপিধারী ব্যক্তিই তো আজ ইসলামের শত্রুদের সাথে মিশে ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করছে। কত মুসলিম নামধারী ব্যক্তিই তো অতীতে ব্রিটিশ, সোভিয়েট রাশিয়া ও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের বাহিনীতে যোগ দিয়ে মুসলিম ভূমিতে মুসলিমদের হত্যা করেছে।

- প্রশ্ন হলো, যে সকল নাস্তিক হাজ্জ করে আসার খবর বয়ান করেন তারা কি বাংলাদেশে একটি দিনও ইসলামের পক্ষে একটি কথা লিখেছেন বা ময়দানে নেমে একটি বারও ইসলামের পক্ষে আওয়াজ তুলেছেন? হাজ্জ তো ইব্রাহীম (আ.)-এর সুন্নাত। তাঁর মহান সুন্নাত হলো আল্লাহর সকল হুকুমের প্রতি বিনা দ্বিধায় অবিলম্বে লাব্বায়েক তথা আমি হাজির বলা। অথচ নাস্তিকরা তো লাব্বায়েক বলছেন ইসলামের প্রতিষ্ঠা প্রতিহত করার অঙ্গীকার নিয়ে। তাদের আনুগত্য হলো তাগুত (আল্লাহ বিরোধি শক্তি) ও শয়তানের প্রতি। অথচ আমরা দেখছি এক শ্রেণীর নাস্তিক ইসলামের শত্রু পক্ষের সাহায্যকারী রূপে কাজ করছেন। ফলে একবার নয়, হাজার বার হাজ্জ করলেও এসব নাস্তিকের হাজ্জের কি সামান্যতম মূল্য থাকে?

- নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর পিছনে কত মুনাফিক বছরের পর বছর নামায পড়েছে। কিন্তু তাতে কি তাদের আদৌ কোন কল্যাণ হয়েছে? কল্যাণ তো তারাই পেয়েছে যারা আল্লাহর দ্বীনের প্রতিষ্ঠায় আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে রণাঙ্গণে নেমেছে এবং কুরবানী করেছে। পবিত্র কুরআনে তো সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও" (সুরা সাফ আয়াত ১৪)। লক্ষ্য এখানে আল্লাহর দ্বীনের বিজয়। বলা হয়েছে,"হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসার কথা বলে দিব যা তোমাদেরকে বেদনাদায়ক আযাব থেকে বাঁচাবে? সেটি হলো তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আন এবং আল্লাহর রাস্তায় জান ও মাল দিয়ে চেষ্টা-সাধনা কর, সেটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা বুঝতে পারতে।"- (সুরা সাফ আয়াত ১০-১১)।

তাওরাত ধর্মগ্রন্থে আল্লাহর নির্দেশ

- অনেকে মনে করেন যে সৃষ্টিকর্তা (আল্লাহ) বলতে কিছু নেই। আবার অনেকে মনে করেন সৃষ্টিকর্তা আছে কিন্তু তাঁর সাথে আবার অন্যকেউ শরীক করেন। আল্লাহর কাছ থেকে মূসা (আ.)-এর কাছে ইহুদী জাতির জন্য যে আদেশ-নিষেধ এসেছিল তা তাওরাতে 10 Commandments নামে বর্ণিত আছে, দেখা যাক সেখানে কী বলা হয়েছে ঃ

    1. Do not worship any other gods.
    2. Do not make any idols.
    3. Do not misuse the name of God.
    4. Keep the Sabbath holy.
    5. Honor your father & mother.
    6. Do not murder.
    7. Do not commit adultery.
    8. Do not steal.
    9. Do not lie.
    10. Do not covet.

আল্লাহ যে এক তা আমরা অন্যান্য ধর্মেও দেখতে পাই

“Worship almighty Creator & join none with Him in worship”
[Adam, Abraham, Moses, Jesus & Muhammad]
(Peace be upon them)

"I am Lord, and there is none else There is no God besides me."
[The Bible, Isaiah 45:5]

"I am God, and there is none else;
I am God, and there is none like me."
[The Bible, Isaiah 46:9]

"Thou shalt have no other gods before me."
[Judaism]

“Those whose intelligence has been stolen by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own natures.”
[Bhagavad Gita 7:20]

"Ekam evadvitiyam"
"He is One only without a second."
[Chandogya Upanishad 6:2:1]

”Ekam Brahm, dvitiya naste neh na naste kinchan.”
”There is only one God, not the second;
not at all, not at all, not in the least bit.”
“Bhagwan Ek hi hai. Doosra Nahi hai.
Nahi hai, nahi hai, zara bhi nahi hai”.
[Brahma Sutra of Hinduism]

সর্বত্রই নাস্তিকতার হার দিন দিন বাড়ছে

- ২০১৩ সালের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে সারা পৃথিবীতে মুসলিমদের সংখ্যা এবং নাস্তিকদের সংখ্যা বাড়ছে। পরিসংখ্যানে আরো দেখা গেছে সকল ধর্মেই তরুণদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী নাস্তিকতা বাড়ছে।

- একটি বিখ্যাত ইউনির্ভাসিটির ২০১০ সালের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে ৭২% মুসলিম ছেলেমেয়েরা আল্লাহতে বিশ্বাস করে না এবং ১২% মুসলিম ছেলেমেয়েরা এ ব্যাপারে confused (দিশেহারা)। এজন্য কে দায়ী? এরা মুসলিম পিতামাতার সন্তান, প্রকৃত শিক্ষার অভাবে আজ এই দুরবস্থা।

- অষ্ট্রেলিয়াতে নাস্তিকদের জন্য সর্বপ্রথম উপাসনালয় তৈরী হচ্ছে। এখন প্রশ্ন তারা কার উপাসনা করবে? এই নাস্তিকরা প্রকৃতবাদী তাই এরা প্রকৃতির উপাসনা করে।

- মুসলিম-অমুসলিম সকল ধর্মেই নিজেদের সন্তানরা নাস্তিক হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে নিজ পরিবারে পিতামাতারা সন্তানদের যথেষ্ট সময় না দেয়া। যারাও বা সময় দেয়, তারা হয়তো quality time দেয় না।

'মুরতাদ'-দের উপর কিছু বিশ্লেষণ

- মুরতাদ কারা? যে মুসলিম কাজে ও বিশ্বাসে ইসলাম ত্যাগ করে। মুরতাদ তারাই যারা মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও মুসলিম সমাজের মাঝে প্রকাশ্যে আল্লাহর বিরুদ্ধে কাজ করে, ইসলামের বিরুদ্ধে কলম ধরে এবং শত্রুদের সাথে ইসলামের বিরুদ্ধে হাত মিলায়।

- আমি হয়তো সলাত আদায় করি, আমি হয়তো হাজ্জ পালন করেছি, আমার তরুণ সন্তান হয়তো অন্তত আমার সাথে জুম্মার সলাতটা নিয়মিত আদায় করে, তার অর্থ এটা নয় যে, আমার সন্তান মুরতাদ নাও হয়ে থাকতে পারে। অভিভাবক হিসেবে তার কর্মকান্ড বা online activity সম্পর্কে আমার অবগত হওয়া দরকার এবং প্রয়োজনে সঠিক পদক্ষেপ নেয়া দরকার। হতে পারে আমার সন্তান ভুল করেই এই কাজ করছে।

- ইসলাম কাউকে মুসলিম হতে বাধ্য করে না। ধর্মে জোর-জবরদস্তি নেই তার ব্যাখ্যা তো এটাই। কিন্তু মুসলিম হওয়ার অর্থই হলো আল্লাহর বিরুদ্ধে কাজ না করা।

- ইসলামী শরিয়া মতে মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদন্ড। নানা ফেরকা ও নানা মাজহাবের উলামাদের মাঝে নানা বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু ইসলামের মৌল বিষয়ের ন্যায় মুরতাদের সংজ্ঞা ও শাস্তি নিয়ে কোন মতভেদ নেই। আর এই শাস্তি কার্যকরী করার দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের বা সরকারের। ব্যক্তিগতভাবে কেউ এই শাস্তির দায়িত্ব হাতে তুলে নিতে পারবে না।

অন্যান্য ধর্মে মুরতাদ-দের শাস্তি

- ইংরেজী ভাষায় ব্লাসফেমি একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। এর আভিধানিক অর্থঃ খৃষ্টান ধর্মের উপাস্য ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অমর্যাদাকর, অবজ্ঞামূলক, আক্রমণাত্মক বা শিষ্টাচারবহির্ভূত কিছু বলা বা করা। খৃষ্টান এবং ইহুদী এ উভয় ধর্মেই এমন অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদন্ড। সে শাস্তির কথা এসেছে ওল্ড টেস্টামেন্টে। বলা হয়েছে ঃ "এবং যে ব্যক্তি প্রভুর নামের বিরুদ্ধে ব্লাসফেমি তথা অপমানকর, অমর্যাদাকর বা শিষ্ঠাচার বহির্ভূত কোন কথা বলবে বা কিছু করবে তবে তার নিশ্চিত শাস্তি হলো তাকে হত্যা করা। জমায়েতের সকলে তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করবে।" - (বুক অব লেভিটিকাস ২৪:১৬)।

- অপর দিকে হিন্দুধর্মে ব্লাসফেমি শুধু ইশ্বরের বিরুদ্ধে কিছু বলাই নয় বরং কোন ধর্মগুরু বা পুরোহিতদের বিরুদ্ধে কিছু বলাও একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। হিন্দুধর্মের আইন বিষয়ক গ্রন্থ মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে, "যদি নিজাতের কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন পুরোহিতকে অবমাননা করে বা তার সাথে খারাপ আচরণ করে তবে রাজার দায়িত্ব হবে দৈহিক শাস্তি বা প্রাণদন্ড দেয়া যাতে সে প্রকম্পিত হয়। -(মনুস্মৃতি ২৪:১৬)।

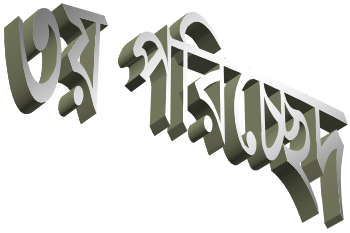
৩য় পরিচ্ছেদ

সংস্কৃতি কী?

সংস্কৃতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন

সংস্কৃতি-চিন্তার সংগতি-অসংগতি

- সংস্কৃতি মানুষকে সুন্দর করে, মানুষের অন্তর্জগতে সুষমা ও সুস্থতা এনে দেয়। অর্থাৎ সংস্কৃতিচর্চার মধ্য দিয়ে মানবিক মহিমা ও মহত্ত্বের বিকাশ ঘটে। কিন্তু এমনটা যদি ক্রমে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, সংস্কৃতিচর্চার কারণে মানুষ সুন্দর না-হয়ে আরো অসুন্দর হয়ে উঠছে, মানুষ না হয়ে অমানুষে রূপান্তরিত হচ্ছে, সংস্কৃতিচর্চার উর্বর ও অনুকূল ক্ষেত্রগুলো অবাধ কার্যকলাপের অভয়ারণ্যে পরিণত হচ্ছে, তা হলে ভয়ের কথা বটে।

- সংস্কৃতি মানে মজা করার জন্য লঘু ও চটুল বিনোদন নয়, সংস্কৃতি হলো একটি জাতির জীবনদর্শনের প্রতিবিম্ব। এইজন্যই সংস্কৃতির মধ্যে একটি জাতির বিশ্বাস ও চৈতন্যের প্রকৃত অভিজ্ঞান জেগে ওঠে। মানুষকে যেমন অন্য কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা চেনা যায় না, চিনতে হয় মুখ দেখে; ঠিক একইরকম, সংস্কৃতি হলো একটা জাতির মুখমণ্ডল। কিন্তু এই মুখমণ্ডল যদি ব্যাধির প্রকোপে কদাকার ও বীভৎস হয়ে ওঠে, সেই বিশাল দুর্ভাগ্যের কোনো সান্ত্বনা নেই। বলা আবশ্যক, আমাদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে সংস্কৃতি, তা আজ কঠিন রোগের আক্রমনে বিকৃত হয়ে গিয়েছে।

- সংস্কৃতির নামে আজ সর্বত্র শিরকের জয়জয়াকার; শিরকই আমাদের সংস্কৃতি-অঙ্গের প্রিয়তম ভূষণ! কোনটা তাওহীদ আর কোনটা তাওহীদ-বিনাশী অংশীবাদ, সেই বোধ পর্যন্ত এখন লুপ্তপ্রায়। গান-কবিতা-নাটক যাই হোক, আমরা বুঝতেই পারছি-না যে, প্রকৃতিমুগ্ধতা আর প্রকৃতিপূজা এক নয়; দেশপ্রেম আর দেশকে মাতৃদেবীরূপে বন্দনা করা এক কথা নয়;

নারীর মূল্য ও মর্যাদা আর নারীকে ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য করে তোলা এক বস্তু নয়। বরং তা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, একেবারেই হারাম।

- আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে এমনভাবে আজ সাজিয়ে নিয়েছি, যেন আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ নন, ইবলিসই আমাদের একমাত্র পথনির্দেশক পরমতম বন্ধু। বড় আফসোস, সারা দেশ জুড়ে দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়ছে ভাস্কর্য ও মূর্তি-সংস্কৃতি; অবাধে প্রসার লাভ করছে বাঙ্গালীয়ানার নামে খোল-করতাল শাঁখা-সিঁদুর মঙ্গলদীপ-রাখীবন্ধনের হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি; ক্রমশই প্রবল প্রতাপে বাঙ্গালী মুসলিম মানসকে অধিকার করে নিচ্ছে বাউল-বিশ্বাসপুষ্ট অন্ধকার দেহবাদ, ফকিরিতন্ত্র, মাজারপূজা, পীরপূজার মত গর্হিত জীবনাচার। বড়ই আফসোস, এইসব নিয়েই আমাদের সংস্কৃতি এখন ষোলকলায় বিকশিত।

- রবীন্দ্রনাথ আমাদের সংস্কৃতিনিষ্ঠায় সর্বাধিক প্রাণবন্ত উপাদান। এবং এতটাই অপরিহার্য ও প্রাণবান যে, আমাদের কোনো কোনো বেপরোয়া সংস্কৃতিজীবী সগৌরবে ঘোষণা করেন, 'ঈশ্বরকে' অস্বীকার করা সম্ভব কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে নয়।

- পাঠক আপনি/আমি যদি একজন অভিভাবক হই, তবে হয়তো আমরাও এই সকল কাজকে প্রোমোট করার কাজ করে যাচ্ছি অবচেতন মনেই।

সংস্কৃতির জয়-পরাজয়

- চৈত্রের দুপুরে বাঙ্গালী-জননীর হাতের তালপাখার মৃদুমন্দ ব্যজন যেমন সংস্কৃতি, বিসমিল্লাহ বলে খাদ্যগ্রহণ অথবা সুসংবাদ পেলে আলহামদুলিল্লাহ বলাও সংস্কৃতি।

- আসলে যে কোনো কারণেই হোক, আজ সংস্কৃতি মানে নৃত্য-সঙ্গীত-কবিতা-নাটক ইত্যাদি। আর এই সকল বস্তু ও বিষয়ের যারা সমঝদার তারাই সংস্কৃতিবান।

- অসংখ্য অভিভাবকই এখন এই অভিলাষ পোষণ করে যে, তাদের ছেলেমেয়ে সঙ্গীতশিল্পী/নৃত্যশিল্পীরূপে বিখ্যাত হয়ে উঠুক। এতে এ-ধরনের অভিভাবকেরা শুধু উল্লসিত হয় না, কন্যা কি পুত্রের সাফল্যে তারা তাদের জীবনকে ধন্য ও সার্থক জ্ঞান করে। শুধু খ্যাতি নয়, সংস্কৃতিকর্মীদের হাতে

পর্যাপ্ত অর্থাগমও সহজ হয়ে ওঠে। টাকাটা কোন পথে আসছে, কী হারাতে হচ্ছে, সেটা বড় কথা নয়; অনেক সহজে অনেক টাকা-যে হাতে আসছে, এটাই বড় কথা। সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য শেষ বিজয়টি হলো, তথাকথিত নান্দনিকতার নামে সংস্কৃতি তার ভক্ত ও পৃষ্ঠপোষকদের কাছে নিজেকে রীতিমত আরাধ্য বা উপাস্য করে তোলে। এবং এই কারণেই একজন শিল্পী তার গান কি নৃত্য কি অভিনয়কে বিনোদন মনে করে না, মনে করে সাধনা ও তপস্যা।

- সংস্কৃতি এখন আধুনিক মানুষের ধর্মে পরিণত হয়েছে। ধর্ম তার অনুসারীদের নিকট যে আনুগত্য দাবি করে, আধুনিক সংস্কৃতি এখন সেই ধরনের শর্তহীন আনুগত্য পাচ্ছে। উদাহরণত, এমন বহু দুর্ভাগা মুসলিম সন্তান এই সমাজে বিদ্যমান, যারা ইসলাম মানে না, রসূল ﷺ -এর জীবনাদর্শের প্রতি আগ্রহী নয়, কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে রবি ঠাকুরের 'ইবাদত' করে, লালনগীতির মধ্যে ইহকাল পরকালের 'মুক্তি' খুঁজে পায়; এমনকি গাজা-সেবনকেও আধ্যাত্মিক মোক্ষলাভের সহায়ক শক্তি বলে বিবেচনা করে।

- হিন্দু সংস্কৃতির বাহক ভারতের সংস্কৃতিবান গোষ্ঠীরা তাদের সংস্কৃতির পরিচায়ক কত্থক, ধ্রুপদী, ভারতনাট্যম শেখাতে প্রতিবছর সরকারের বিপুল অর্থব্যয় করে শত শত বাংলাদেশীকে ভারতে নিয়ে যায় তার কারণ কী? কারণ প্রধানত একটাই, বাংলাদেশী মুসলিমদের অন্তর থেকে তাওহিদী চেতনাকে মুছে দিয়ে ভারতপ্রেমের আলপনা এঁকে দেয়া। একেই বলা হয় brain washing। এই বিদ্যা শিখতে যদি দলে দলে বাংলাদেশী হিন্দুরা যান তাতে কোন সমস্যা নেই কিন্তু মুসলিম ছেলেমেয়েরা গেলে তা চিন্তার বিষয়।

- অথচ সরকারী খরচে নয় বরং নিজ খরচেও যদি কেউ আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যেতে চান তাহলে কী ঘটে? একজন ছাত্রকে ভারতবর্ষের অন্য যে-কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় ভর্তি ও বেতন বাবদ দশ গুণ বেশী অর্থ ব্যয় করতে হয় এবং ছাত্রভিসা পেতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। এধরনের আর্থিক ও প্রশাসনিক বাধা সৃষ্টির একটাই কারণ, অনেক হারানোর পরেও যেহেতু এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো কিছুটা তাওহিদী শিক্ষা ও মুসলিম ঐতিহ্য অবশিষ্ট আছে; অতএব সেখানে পাঠ গ্রহণের পথকে যথাসম্ভব দুর্গম করে রাখা আবশ্যক।

- জাতীয় কি বিজাতীয় সেটা বড় কথা নয়, কথা হলো, সার্বিক বিচারে কোন জিনিস ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক, নাকি উপকারী? ম্যালেরিয়া বহনকারী মশাও বাংলাদেশের একটি আবহমান কালের 'সম্পদ', কিন্তু যে কোন মূল্যে এই সম্পদকে আমরা উৎখাত করতে চাই। কারণ তা স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক। ঠিক এই রকমই, যদি কোনো সংস্কৃতি আমাদের সাহস ও আত্মবিশ্বাসকে দুর্বল করে, আমাদের দেশপ্রেম ও আদর্শবোধকে বিপন্ন কি বিপথগামী করে, আমাদের তাওহিদী বিশ্বাস ও আখিরাতের ভয়কে মুছে দিতে চায়, শিল্প কি নান্দনিকতার নামে জীবনকে দায়িত্বহীন ভোগের দাসত্ব করতে শেখায়, আমাদের কল্‌বকে (আত্মাকে) মৃতে পরিণত করে, সেই সংস্কৃতি জাতীয় হোক বিজাতীয় হোক, অবশ্যই তা ক্ষতিকারক।

সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

- রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত গানের উল্লেখ করতে পারি "ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা, তোমাতে বিশ্বময়ী বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা"। এখানে বিশ্বমা হচ্ছে কালিদেবী। কালিদেবী তার শাড়ীর আঁচল মাটিতে বিছিয়ে দিয়েছে আর আমরা তাতে মাথা ঠেকাচ্ছি। মুসলিমরা একবার গভীরভাবে চিন্তা করে দেখি, এই কাজ কি কোন ঈমানদার ব্যক্তি করতে পারে। জীবনানন্দ দাসের একটি বহুপঠিত কবিতা 'আবার আসিব ফিরে'। পুরো কবিতাটিই আমাদের ইসলামী জীবনদর্শনকে মারাত্মকভাবে বিভ্রান্ত করতে চায়। এই কবিতার দুটি পংক্তি ঃ 'আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়ি নদীটির তীরে, হয়ত-বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে'। এখানেও হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস সে মানুষ আবার পুর্ণজন্ম হয়ে এই পৃথিবীতে ফিরে আসবে শঙ্খচিল শালিকের বেশে। গানের ও কবিতার এই বিষয়গুলো ইসলামী আকিদার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। কেউ কেই এমন কথাও বলে, লালনগীতি বা রবীন্দ্রসঙ্গীত শুধু উপাদেয় সঙ্গীতমাত্র নয়, রীতিমত ইবাদত-বন্দেগীর বস্তু (নাউযুবিল্লাহ)।

- এখানে যেন আমরা কেউ ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি না করি, যে রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ দাসকে ছোট করা হয়েছে। না, মোটেও তা নয়, রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ দাস সারা পৃথিবীর নিকট সম্মানিত। তারা তাদের ধর্ম ও বিশ্বাস অনুযায়ী ফিলোসফিগুলো তাদের কবিতার মধ্যে প্রকাশ করেছেন, এতে

কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু একজন ঈমানদার ব্যক্তি হিসেবে তাদের সব ফিলোসফি গ্রহণ করা যাবে না, এদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

- তথাকথিত সংস্কৃতি আমাদেরকে এমন করুণ-ক্রীড়নকে পরিণত করেছে যে, আমরা এখন মাজারে-দরগায়-বেদীতে-মিনারে শুধু পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ নয়, পুরো ঈমানটাকেই কুণ্ঠাহীন অনুরাগে বিসর্জন দিয়ে আসছি। আমাদের অন্ত র্দেশ ও আত্মচৈতন্য এতটাই তছনছ হয়ে গেছে যে, আমরা এখন প্রায় জরথ্রুস্টবাদী অগ্নিউপাসকে পরিণত হয়েছি। অনেকের যুক্তি, 'মোমবাতি প্রজ্জলন'-এর মধ্যে শিরকের এমন কী আছে, যে-কারণে একে দোষণীয় বিবেচনা করতে হবে? কিন্তু এই প্রশ্নও-তো স্বাভাবিক যে, এর মধ্যে দেশপ্রেমেরই বা কী আছে? অগ্নিশিখার সম্মুখে শ্রদ্ধাবনত হয়ে নিরর্থক দাঁড়িয়ে থাকার নাম যদি শিরক না-হয়, তাহলে প্রাচীন পারসিকরা-যে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডকে প্রদক্ষিণ করতো, তাকেই-বা কোন যুক্তিতে অংশীবাদ বলা যায়? এবং কোনো দেবী-প্রতিমার সামনে ভক্তিভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই-বা কেন শিরক বা পৌত্তলিকতা বলে গণ্য হবে?

- এখানেও ঐ একই বিষয়, আগুনের সামনে বা মোমবাতীর সামনে অন্য ধর্মের লোকেরা দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা দেখালে বা কোন আনুষ্ঠানিকতা করলে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু ইসলাম বলে মুসলিমরা এই কাজ করতে পারে না কারণ তা তার ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক। আগুন নিয়ে একজন মুসলিম কোন আনুষ্ঠানিকতা করতে গেলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে, এখানেই ভয়। তর্কে না জড়িয়ে আমাদেরকে বিষয়টা খুব গভীরভাবে বুঝতে হবে।

বর্ষবরণ ও আত্মঘাতী সাংস্কৃতিপ্রীতি

- আনন্দ খারাপ নয়, কিন্তু শিরক ও অশ্লীলতার সঙ্গে যুক্ত হলে তা খারাপ-তো বটেই, আনন্দ তখন একেবারেই গর্হিত ও হারাম হয়ে যায়। কারো অজানা নয়, পহেলা বৈশাখে ভোর না-হতেই নারী-পুরুষের অবাধ ও উদার মেলামেশার মধ্য দিয়ে রমনায় পান্তা খাওয়ার মহোৎসব শুরু হয়ে যায়। চারুকলা চত্বরে অনেক মেয়েরা তাদের বাহু-পিঠে-গালে উল্কি এঁকে নেবার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে, নানা দিকে নানা রঙের মিছিল শুরু হয়ে যায়। আর মিছিল শুধু মিছিল নয়, ঢোল-বাদ্যসহকারে জন্তু জানোয়ারের মুখোশ পরিহিত উদ্‌ভ্রান্ত নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিয়ে সে-এক দৃশ্য।

- পহেলা বৈশাখ উদযাপন বা নববর্ষ বরণের যে ক্রিয়া ও প্রক্রিয়া, তার কোনো একটি বিষয়েও আপত্তি নেই, আপত্তি থাকার কোনো কারণও নেই। শঙ্খধ্বনি হোক, পান্তাভাতের নৈবদ্য সাজিয়ে অতিথিরূপী নারায়ণ- সেবা হোক, উল্কি অঙ্কন, চন্দন বা সিন্দুর টিপ পরিধান হোক, নৃত্য সঙ্গীত মৃদঙ্গ করতাল ঢোলবাদ্য, উলুধ্বনি মঙ্গলদীপ, রবীন্দ্রপূজা, প্রকৃতিপূজা যাই-ই হোক, কোনো কিছুতেই অনুমাত্র আপত্তি নেই। বরং আশা করবো, হিন্দু সম্প্রদায় তাদের মতো করে নির্বিঘ্নে আলপনা এঁকে ঘট-সাজিয়ে শঙ্খ বাজিয়ে পহেলা বৈশাখকে নানা আচারে উপাচারে মুখরিত করে তুলুক। এমনকি তাদের কাছে প্রকৃতিপূজা যেহেতু সিদ্ধ; তারা মনে করলে, মঙ্গলদাত্রী বৈশাখী দেবীপ্রতিমা নির্মাণ করে পূজা-অর্চনাও করতে পারে।

- কিন্তু ইসলামের আপত্তি শুধু একটি ক্ষেত্রে, এবং তা হলো এই হিন্দু উৎসবে মুসলিম নারীপুরুষের অংশগ্রহণ। কেউ যদি নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবী করে তাহলে সে এই উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারে না। কারণ এই কাজগুলো ইসলামী আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক। আকীদা হচ্ছে একজন মুসলিমের বিশ্বাসের ভিত্তি।

- হ্যাঁ, মুসলিমরা বৈশাখী মেলায় যেতে পারে এক শর্তে। ইসলামের প্রথম যুগে মক্কায় কাবা ঘরের আশে পাশে অমুসলিমদের মেলা বসত। মুহাম্মাদ ﷺ সেই মেলায় যেতেন দ্বীন ইসলাম প্রচার করার উদ্দেশ্যে। তিনি মেলায় আসা শতশত লোকদের নিকট ইসলামের বাণী পৌঁছে দিতেন এবং দাওয়াত দেয়ার এটি ছিল একটি উত্তম সময়। তাই বৈশাখী মেলা উদযাপন করার উদ্দেশ্যে নয় বৈশাখী মেলায় গিয়ে অমুসলিমদের নিকট দ্বীন ইসলামের দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে সেখানে যাওয়া যেতে পারে, সেখানে অন্যান্য দোকনীদের সাথে দাওয়াতী স্টল দেয়া যেতে পারে। অমুসলিম এবং নন-প্র্যাকটিসিং মুসলিমদের মাঝে আল-কুরআনের বাংলা অনুবাদের হাজার হাজার কপি ফ্রী গ্রিফ্ট হিসেবে বিতরণ করা যেতে পারে। ইসলাম যে শান্তির ধর্ম তার উপর কোন ভাল বইও বিতরণ করা যেতে পারে।

- ইসলাম একটি স্বতন্ত্র জীবনদর্শন, একটি সর্বতোমুখী হিদায়াত। এখানে সংস্কৃতি আছে কিন্তু সংস্কৃতিপূজার কোনো অস্তিত্ব নেই; অলঙ্ঘনীয় মানবাধিকারের কথা আছে কিন্তু মানবপূজা এখানে হারাম। এবং এখানে এমনসব আনন্দকর্ম পুরোপুরি নিষিদ্ধ, যা যৌনতা, বেহায়াপনা, শিরক ও অশ্লীলতার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে। অতএব পহেলা বৈশাখ হোক,

বর্ষবরণ, বর্ষবিদায় কি প্রকৃতিবন্দনা যা-কিছুই হোক, একজন মুসলিম সর্বদা ও সর্বতোভাবে এই শর্তের অধীন যে, তার তাওহিদী-অভিজ্ঞান যেন এতোটুকু নিষ্প্রভ না হয়, সে যেন কোনোভাবেই শিরকের ফাঁদে জড়িয়ে না পড়ে, তার কর্মকান্ডে যেন বিন্দু পরিমান শিরকের ছোয়া না লাগে।

- তথাকথিত সংস্কৃতিপ্রেমীরা বলতে পারে এবং আমরাও তর্কের খাতিরে ধরে নিতে পারি, বর্ষশুরুর প্রাক্কালে নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর মধ্যে অন্যায় কিছু নেই। কারণ, এটা-তো সবারই মনস্কামনা যে, নতুন বছর সবার জন্য কল্যাণ বয়ে আনুক, সবার জীবন শান্তি ও সুখের সৌরভে আমোদিত করে তুলুক। আসলে এখানেই প্রশ্ন এবং প্রশ্নটি জীবনদর্শনের। কোনো মুসলিম কি একথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে, নববর্ষ বা বৈশাখের আবাহনের মধ্যে কোন মঙ্গল বা কল্যাণ নিহিত আছে! অসম্ভব! সকল শক্তি, ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ; আমাদের সকল চাওয়া, সকল প্রার্থনা একমাত্র তাঁরই কাছে আমরা পেশ করি। এক্ষেত্রে কোনোরকম ব্যতিক্রম ঘটলে অর্থাৎ অন্য কোথাও অন্য কারো কাছে আমরা আমাদের কোনো আরজু যদি নিবেদন করি, সেটা সুস্পষ্ট শিরক, যে শিরকের অপরাধ আল্লাহপাক কখনোই ক্ষমা করবেন না বলে ঘোষণা করেছেন। অতএব নববর্ষ উদযাপনের বাহানায় আমাদের পক্ষে মুশরিকী চেতনা উদ্ভুত আনন্দযজ্ঞে শামিল হওয়ার কোনো উপায় নেই।

- কেবল মাত্র আল্লাহ যে সকল সময়, দিনক্ষণ, রাত ও মাসকে বরকতময় বলে জানিয়ে দিয়েছেন, আমরা মুসলিমরা কেবলমাত্র সেই সকল নির্দিষ্ট সময়ে, দিনক্ষণে ও মাসে রসূল ﷺ -এর নির্দেশিত উপায়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে বিশেষ বরকত অর্জন করতে পারি।

- নববর্ষকে যদি আমাদের জীবনে ফলবান, গ্লানিমুক্ত ও শান্তিময়রূপে দেখতে চাই, তাহলে সেই প্রার্থনা ইসলাম-সম্মতভাবে আল্লাহপাকের কাছেই পেশ করতে হবে। আসলে শয়তান বড় চতুর। আগে আসতো নানা ধরনের অংশীবাদপুষ্ট ধর্মের আলখাল্লা পরিধান করে; এখন আসে, কখনো ধর্মনিরপেক্ষতা, কখনো উদার আবহমান সংস্কৃতি ও নান্দনিকতার পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে। উদ্দেশ্য একটাই, তাওহিদী উম্মাহকে সত্যভ্রষ্ট করা, পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের সমূহ সর্বনাশ সাধনের পথ প্রশস্ত করা।

অপসংস্কৃতির কবলে বাংলাদেশ

- ইসলামকে পছন্দ করি না করি, বাংলাদেশ যে নব্বই শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত একটি তাওহিদী বাংলাদেশ, এটা বাস্তব। সংস্কৃতি যদি দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও অস্তিত্বের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়, যদি নব্বই ভাগ মানুষের বিশ্বাস ও চৈতন্যের সাথে বিরোধিতায় লিপ্ত হয়, তাহলে তার নান্দনিক গুণ ও তথাকথিত Aesthetic value যতই থাক বা যতই উচ্চরবে প্রচারিত (ঘোষিত) হোক, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সেটা অবশ্যই অপসংস্কৃতি। অপরদিকে, যে সংস্কৃতি ও সংস্কৃতিচর্চা দেশের সিংহভাগ মানুষের বিশ্বাস, ধর্মানুভূতি ও জীবনদর্শনের সাথে সাংঘর্ষিক, নিঃসন্দেহে সেটাও অপসংস্কৃতি।

- বহু পতিতা- যে বছরের পর বছর কুৎসিত জীবনযাপন করে চলেছে, তাদেরও পক্ষে যুক্তি আছে। তারা অনেকেই বিশ্বাস করে, তারা যৌনশিল্পী, তাদের দেহ আসলে মন্দির, সেখানে মানবরূপী ঈশ্বর এসে পরমহংসের মত দেহনিঃসৃত তৃপ্তিটুকু শুধু পান করে যান। যদিও অর্থের বিনিময়ে কিন্তু অর্থটা লক্ষ্য নয়; মূল লক্ষ্য ঈশ্বরের সহবাস, দেহকে নৈবেদ্য করে ঈশ্বরের হাতে তুলে দেয়া। কী অদ্ভুত সাদৃশ্য, আমাদের অনেক আধুনিক সংস্কৃতিজীবীরও ধারণা, মানুষ যে বাহবা দেয়, সেটা শুধু বাহবা নয়, সেটা ঈশ্বরের পরম আশীর্বাদ। আর এই আশীর্বাদ লাভের জন্য যদি বিবসনা হয়ে নানা রূপ দেহভঙ্গি ও যৌন উত্তেজক মদির-মুদ্রায় নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করতে হয়, সেটা পুণ্যকর্ম।

- আল কুরআন ও রসূল ﷺ -কে উপেক্ষা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে (নাউযুবিল্লাহ) যাদের কাছে এই অপসংস্কৃতি হয়ে ওঠে প্রধান, যারা মুসলিম উম্মাহর বক্ষদেশ লক্ষ্য করে ক্রমাগত শরবর্ষণে তাওহিদী আমানতকে উৎখাত করতে চায়, তাদের কাছে ভালো কিছু আশা করাই অসমীচীন। শুধু একটাই দুঃখ, বাংলাদেশের এই বর্তমান তরুণ-প্রজন্মের একটি বিরাট অংশ আজ তাদেরই কারণে অশ্লীলতা দেহবাদ ও অংশীবাদপুষ্ট অপসংস্কৃতির অব্যর্থ শিকার। এই দুরবস্থা ক্রমশই বিস্তৃত ও ঘনীভূত হচ্ছে। এখনই সতর্ক না হলে শেষ পর্যন্ত কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বলা কঠিন। অপসংস্কৃতির কবল থেকে আল্লাহ তা'আলা বাংলাদেশকে হিফাজত করুন।

সংস্কৃতি নিয়ে আরো কিছু কথা

- যারা বলেন, 'লা-ইকরাহা ফিদ্দীন' দ্বীনের ক্ষেত্রে কোন জবরদস্তি নেই, তাদের জ্ঞাতার্থে উল্লেখ করা যায়, একথা আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন ভিন্নধর্মীদের প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন না করার জন্য। একথার অর্থ আদৌ এ রকম নয় যে, ইসলামও ভালো, ইসলামের বাইরে যা আছে তাও ভালো; অতএব মিলেমিশে একটা উদার জীবনাচার ও সংস্কৃতি গড়ে নিলে আল্লাহর তরফ থেকে আপত্তি নেই (নাউযুবিল্লাহ)। দ্বিতীয়ত, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করবার পর, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল ﷺ যা অনুমোদন করেননি, সেই অননুমোদিত পন্থায় সর্বপ্রেমী বৈষ্ণব রসের উদার সংস্কৃতি রচনা সম্পূর্ণরূপে হারাম।

- শুধু ১০ই মহররম নয়, রোযা রাখলে আগে-পিছনে মিলিয়ে দুটি বা তিনটি রোযা রাখতে হবে, যাতে ইহুদিদের সাথে মিলে না যায়। সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত এবং সূর্য যখন মধ্যগগনে, এই তিন সময়ে সলাত আদায় করা যে নিষিদ্ধ, তারও একমাত্র কারণ, সলাতের ওয়াক্ত যেন কোনো অবস্থাতেই মুশরিক-সূর্যপূজকদের অনুরূপ না হয়। অথচ কী দুর্ভাগ্য, আজ আমরা আমাদের অন্তরের টানে এক অংশীবাদপুষ্ট নিবিড় সাংস্কৃতিক সখ্য ও উদার বেপরোয়া জীবনাচারের মধ্যে আত্মমুক্তির আস্বাদ গ্রহণ করছি।

- এই দীর্ঘ দেড় সহস্র বৎসরকালে মুসলিম উম্মাহ যেখানে যতবার বিপর্যস্ত হয়েছে, তার অন্যতম মুখ্য কারণ ছিল, কুরআন ও সুন্নাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ ও অসমর্থিত শিল্পচর্চার মধ্যে ডুবে যাওয়া। মোগল সাম্রাজ্যের পতন, অযোধ্যার পতন, মুর্শিদাবাদ কি হায়দরাবাদের পতন ইত্যাদি বহু বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ ছিল শাসকদের কাব্যভক্তি ও সংস্কৃতিবিলাস।

- ইবলিস কী চায়, ইবলিসের অভিপ্রায় কী? উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য একটাই, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ﷺ -এর প্রকৃষ্ট হিদায়াত থেকে মুসলিমকে উল্টোদিকে ধাবিত করা। তবে এক্ষেত্রে ইবলিসের সর্বাধিক প্রিয় ও কার্যকরী হাতিয়ার হলো গানবাজনা, নৃত্যগীত ও নাটক-নবেলের সংস্কৃতি। এই পথে ইবলিস যতটা সহজে ধ্বংস ডেকে আনতে পারে, অন্য কোনভাবে ততটা হয় না। এবং এইজন্যই পৃথিবীর অন্য সকল দেশের মত বাংলাদেশের সংস্কৃতি-জগৎও ইবলিসের একটি নির্ভরযোগ্য মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

- তথাকথিত সংস্কৃতিসেবীদের অধিকাংশই কুরআনের কথা ও রসূল ﷺ -এর জীবনাদর্শের কথাকে বড় ভয় পায়। আর এজন্যই আমাদের নান্দনিক জগতে ভালো-মন্দ অনেক কিছু আছে, শুধু আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল ﷺ নেই। শয়তান যেহেতু অন্ধকারের প্রতিভু, শয়তানের নিয়ন্ত্রণাধীন আমাদের সংস্কৃতির একটি বিরাট অংশ অন্ধকারাচ্ছন্ন। এজন্যই আমাদের সংস্কৃতিতে ন্যাড়ার ফকির লালন একজন বড়-মাপের 'আউলিয়া', পাগলা কানাই এমনকি অর্ধশিক্ষিত আরজ আলি মাতুব্বরও বিরাট কিছু।

- আসলে পুরো মুসলিম উম্মাহর মধ্যেই এমন এক ধরনের তীব্র অন্ধত্ব প্রবল হয়ে উঠেছে, যে কারণে সহজ সরল বিষয়গুলোও মুসলিম আজ অনুধাবন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। রসূল ﷺ কি জীবনে একবারও গানবাজনা চর্চার কথা বলেছেন? বলবেন কী করে? তিনি তো এসেছিলেন বাদ্যযন্ত্র উৎখাত করতে (সহীহ বুখারী)। আর ইসলাম-তো পৃথিবীতে গানবাজনা কি নাটক করার জন্য আসে-নি; এসেছে পৃথিবীকে জঞ্জালমুক্ত ও পবিত্র করবার জন্য, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য, এসেছে মানবরূপী ইবলিসদের মোকাবিলায় আল্লাহর একক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য। আর এই কাজ পদ্য বা গীতনৃত্য ছবি-আঁকা দিয়ে হয় না; এর জন্য প্রয়োজন সংগ্রাম, প্রয়োজন আল্লাহর দ্বীন-প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা বুকে নিয়ে জীবন ও সম্পদ ব্যায় করা।

- যে তেইশ বছর ধরে শত সহস্রবার জিব্রাইল (আ.) আল্লাহর নিকট থেকে ওহী নিয়ে আসলেন, তার কোনো একটি আয়াতেও কি নাচগানের কথা আছে? বরং উল্টোটাই বলা আছে। বলা হয়েছে, কাব্য-কবিতা নিয়ে মশগুল তথাকথিত সংস্কৃতিবিলাসীরা হলো ইবলিসের নিকট থেকে ইলহামপ্রাপ্ত ঘোরতর মিথ্যাবাদী এবং নানা উপত্যকায় ভ্রাম্যমাণ উদভ্রান্ত মুনাফিক; যাদেরকে শুধু পথভ্রষ্ট ব্যক্তিরাই গুরু বলে মান্য করে (সূরা শুয়ারা ঃ ২২১-২২৬)। আসলে মুসলিমের সংস্কৃতি হলো সকল অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সার্বক্ষণিক জিহাদের সংস্কৃতি, রসূল ﷺ -কে একমাত্র আদর্শ মেনে জীবন গঠন ও পরিচালনার সংস্কৃতি।

লালন ফকিরের ধর্মীয় মতবাদ

- ফকির লালন সাঁইয়ের ধর্মীয় মতবাদ হচ্ছে গুরুবাদী মানব ধর্ম। তার মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গুরুকে বিশ্বাস করা। গুরুবাক্য বলবান, আর সব বাক্য জ্ঞান। গুরুর বাক্যই শিষ্য ও ভক্তের সাধনা আরাধনা। গুরুর প্রতি নিষ্ঠাই

হচ্ছে সকল সাধনার শ্রেষ্ঠ সাধনা। এই গুরু হচ্ছেন একজন মানব গুরু। লালন অনুসারীদের অধিকাংশই মুসলিম। অল্পসংখ্যক অন্য সম্প্রদায়ের লোকও আছেন। দলমত নির্বিশেষে সকল লালন অনুসারীই মানবতাবাদী গুরুবাদ অবলম্বন করেছেন লালন অনুসারীরা বাউল সম্প্রদায়ের লোক। তারা আধ্যাত্ম সাধনায় গুরুবাদী মানব ধর্মের অনুসারী। হাওয়া বা বাতাসের সাধনা যারা করে তারা হচ্ছে বাউল। 'বাও' মানে বাতাস আর 'উল' মানে হচ্ছে সন্ধান। আউল, বাউল, দরবেশ, সাঁই এবং ফকির এই হলো সাধনা স্তরের পাঁচটি পর্যায়ের নাম। আউল হচ্ছেন সাধারণ মানুষ, বাউল হচ্ছেন দীক্ষাপ্রাপ্ত মুরীদ, দরবেশ হচ্ছেন একজন আত্মসংযমী আদর্শ মানব, আধ্যাত্মজ্ঞানে যিনি উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত তিনি হচ্ছেন সাঁই, আত্মতত্ত্বে যিনি সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছেন তিনি হচ্ছেন ফকির। ফকির লালন সাঁইয়ের ভাষায় - "এলমে লাদুন্নি হয় যার - সর্বভেদে মালুম হয় তার।"

- ফকির লালন সাঁইয়ের তরিকার নাম ওয়াহাদানিয়াত অর্থাৎ লা-শরীক আল্লাহর খাস তরিকা। এই ওয়াহাদানিয়াত তরিকায় প্রথম খিলাফত প্রাপ্ত হন উয়াইস করনী। অতএব তিনিই প্রথম ফকির। ফকিরি মতবাদের এই ধারা বা দর্শন জুনায়েদ বোগদাদী, মনসুর হাল্লাজ, সামস তাবরেজ, জালালউদ্দিন রূমীসহ মধ্যপ্রাচ্যের অনেক ফকির দরবেশ বা সূফী থেকে ক্রমান্বয়ে ভারতবর্ষে পৌঁছায়। ফকির লালন সাঁইয়ের মতাদর্শ অনুসারে সন্ত ান উৎপাদন নিষিদ্ধ। কারণ নিজ আত্মা থেকে সন্তান, ফলে সন্তান উৎপাদন বা সন্তানের জন্মদান করলে আত্মা খন্ডিত হয়। ঐ মতোবাদের অর্থ এই যে, খন্ডিত আত্মা নিয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় না। ফকির লালন সাঁই জন্মান্তরবাদী। তাই গুরুর নির্দেশে লালন ভক্ত শিষ্যরা খন্ড করে সন্তানের জন্ম দান করেন না।

- গুরুর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্যরা বিশেষ বিশেষ স্তরে পৌঁছালে তাকে খিলাফত প্রদান করা হয়। যারা খিলাফতি পান তাদের পশুপাখি হত্যা করা, ডিম, মাংস খাওয়া নিষেধ। কারণ মানুষের জন্ম হয়েছে জীব থেকে। আত্মার মুক্তির জন্য এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য কোন পশুপাখি হত্যা করা যাবে না, ভক্ষণ করাও যাবে না। এই আকীদা নিয়ে লালন ফকির যে বিষয়গুলোর উপর গান রচনা করেছেন তার মধ্যে হচ্ছে ঃ নবুয়ত তত্ত্ব, নামাজের তত্ত্ব, বিলায়েত তত্ত্ব, দন্য তত্ত্ব, চাঁদ তত্ত্ব, ত্রিপেনী তত্ত্ব, সৃষ্টি

তত্ত্ব, গুরু তত্ত্ব, মুর্শিদ তত্ত্ব, কৃষ্ণলীলা ও বিচ্ছেদ, গৌরলীলা ও গোষ্ঠ ইত্যাদি।

- উপরের এই তথ্য থেকে আমরা জানতে পারলাম যে "গুরুবাদী মানব ধর্ম" সন্ধান কুরআন-হাদীসে কোথাও নেই। আল্লাহর রসূল ﷺ -এর জীবনী বা সাহবা (রা.)-দের জীবনীতে এই ধরনের দর্শনের কোন হদিস পাওয়া যায় না। আল্লাহ আমাদের জন্য যে ইসলাম পাঠিয়েছেন তার সাথে এই দর্শনের কোন মিল নেই। যা দেখা যাচ্ছে এই দর্শনে ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রষ্টান ধর্ম, ইহুদী ধর্ম ও অন্যান্য ধর্ম থেকে কিছু কিছু নিয়ে একটা মিক্সড ফিলোসফি তৈরী করা হয়েছে! এই বিষয়ে আরো ভাল বুঝতে হলে তাকে ইসলামী আকীদার উপর ভাল জ্ঞান থাকতে হবে।

ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতিই মানবতার একমাত্র উপায়

- সাহিত্য-সংস্কৃতি একান্ত নিজের মত করে গড়ে ওঠে না, উঠতেও পারে না; এটা গড়ে ওঠে কোনো-না কোন ধর্ম বা মতবাদ বা জীবনদর্শনের আশ্রয় ও অবলম্বনে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করতে পারি, ভারতীয় সংস্কৃতির যে-রূপ, তার প্রধান ভিত্তি হলো অংশীবাদ, পৌত্তলিকতা ও প্রকৃতিপূজা, এবং তৎসঙ্গে অবতারবাদ-নির্ভর মানবপূজা। বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত-সাহিত্য গড়ে উঠেছে মার্কসীয় দর্শনপুষ্ট সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তিতে। এবং ইয়োরোপীয় কি আমেরিকান সংস্কৃতি আসলে ধনতান্ত্রিক বস্তুবাদী জীবনদর্শনেরই অভিব্যক্তি। এবং আমরা এইকথাও জানি, একদা এই বাংলাদেশে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা যে চর্যাপদ রচনা করেছিলেন, তারও মূল অবলম্বন ছিল বৌদ্ধ-ধর্মদর্শন। এবং পরবর্তী সময়ে বৈষ্ণব পদাবলী, বাউল গানের যে প্রসার ঘটে, সেসবও ছিল যথাক্রমে বৈষ্ণব ও বাউল ধর্মাশ্রিত। উল্লেখ্য যে, মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব গীতিকবিতা রাধা-কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক অনেকটা মানবিক বটে কিন্তু তার মধ্য দিয়ে মুখ্যত একটা ঐশ্বরিক আবেদন সৃষ্টির প্রেরণা ছিল। এবং একইভাবে বহু-প্রচলিত বাউলগান হলো যৌনতাশ্রয়ী দেহবাদ-নির্ভর একটা 'আধ্যাত্মিক' উপধর্ম।

- সাহিত্য ও সংস্কৃতি মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ সাধনে কতটা কী ফলপ্রসু ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে ও করে, সে বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে হলে আল কুরআন এবং রসূল ﷺ -এর জীবনাদর্শের নির্ভুল পথনির্দেশনা ছাড়া আমাদের জন্য দ্বিতীয় কোন পথ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ইন্নাদ্বীনা

ইন্দাল্লাহিল ইসলাম' তাঁর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন বা ধর্ম হলো ইসলাম (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯)। অর্থাৎ ইসলামের বাইরে অন্য যে সকল ধর্ম, তার কোনোটাই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব এই সকল প্রত্যাখ্যাত ধর্ম ও মতবাদকে আশ্রয় করে যে সাহিত্য ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, নিশ্চয়ই তারও কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। আর এই অগ্রহণযোগ্য সংস্কৃতি বা সাহিত্য যে মানবকল্যাণের প্রশ্নে আদৌ কোন ভূমিকা রাখতে সক্ষম নয়, বরং মানবতার অপকর্ম সাধনই তার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, এটা অস্বীকার করার কোন হেতু নেই, কোন যুক্তিও নেই।

- এখন প্রশ্ন হলো, ইসলাম কি তাহলে সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চাকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে? ইসলামে কাব্য কবিতার স্থান কি একেবারেই নেই? এই বিষয়ে ভুল ব্যাখ্যার অবকাশ নেই, কাব্য কবিতার স্থান ইসলামে অবশ্যই আছে তবে তা যেন কোনভানেই ইসলামী আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়।

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা ও বর্তমান পরিপেক্ষিত

- ইসলামী শিক্ষার অর্থ শুধু নিরঙ্কুশভাবে পরকালমুখী শিক্ষা নয়; ইহকাল পরকাল উভয়কে নিয়ে আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল ﷺ কর্তৃক পেশকৃত হিদায়াতকে সামনে রেখে যে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ শিক্ষা, সেটাই ইসলামী শিক্ষা। এখানে আত্মিক ও নৈতিক মানসকাঠামো সবল করে তুলবার কার্যক্রম যেমন অপরিহার্য, একই সঙ্গে ইহজাগতিক বৈষয়িক যোগ্যতালাভের বিষয়টিও সমান অপরিহার্য। এটা কোন আলেম-উলামার কথা নয়, পীর-মুর্শিদের কথা নয়; এই কথা স্বয়ং আল্লাহর কথা, আল্লাহর রসূল ﷺ -এর কথা, ইসলামের কথা।

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য পূর্ণাঙ্গ মানুষ পূর্ণাঙ্গ সমাজ

- আসলে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা যা বলে বা বলতে চায়, সেটা নতুন কিছু নয়। আল কুরআন এবং রসূল ﷺ -এর জীবনাদর্শ থেকে প্রাপ্ত যে সর্বতোমুখী হিদায়াত, পূর্ণাঙ্গ মানুষ ও পূর্ণাঙ্গ সমাজ বিনির্মাণের যে পথ ও পাথেয়, ইসলামী শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা সেই কথাই বলে। ইসলাম যেমন একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান, ইসলাম একটি নির্ভুল জীবনদর্শনও বটে। আর

এই জীবনদর্শন তাওহীদ রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জীবনদর্শনই ইসলামের প্রাণ। এ থেকে অন্যথা হলে, এই জীবনদর্শনের ব্যতিক্রম ঘটলে, ইসলাম আর ইসলাম থাকে না, মুসলিমও আর মুসলিম থাকে না। ইবলিস নানাভাবে প্রলুব্ধ ও প্ররোচিত করতেই পারে, এবং প্ররোচিত করাই তার কাজ। বিশেষ করে শিক্ষাব্যবস্থার অন্ত রে-বাইরে যে প্রশস্ত অঙ্গন, সেই অঙ্গন ইবলিসদের একটি বড় প্রিয় ও জরুরী কর্মক্ষেত্র। কারণ এখান থেকেই পর্যায়ক্রমে বেরিয়ে আসে দেশ জাতি ও সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় জনস্রোত। অতএব ইবলিস ও তার সহযোগীদের কাজই হলো এই জনস্রোতকে কলুষিত ও বিপথগামী করা, নৈতিকভাবে পঙ্গু অক্ষম অপদার্থে পরিণত করা। বলা যায়, এই কাজে তার সাফল্য আশাতীতভাবে প্রমাণিতও হয়েছে, যে কারণে দেশব্যাপী আজ এই সমূহ দুরবস্থা।

- একজন প্রকৃত মুসলিম কোনো অবস্থাতেই জীবনে শিরককে গ্রহণ করতে পারে না, সহস্র প্রলোভনেও পৌত্তলিকতাকে প্রশ্রয় দিতে পারে না, সংস্কৃতির নামে তাগুতের (আল্লাহ বিরোধী শক্তি) ইবাদতে মগ্ন হতে পারে না। তাই খাঁটি মুসলিমের পক্ষে ভাষা ও সংস্কৃতির নামে মঙ্গলপ্রদীপ জ্বেলে আরতি করা, নিষিদ্ধ-পুরুষের হাতে সিঁদুর-পরিধান, নগ্ন-পৃষ্ঠদেশে উল্কি অঙ্কন, ভাইফোঁটা ইত্যাদিকে মেনে নেয়া সম্ভব নয় এবং এসব কাজকে ঈমান আকিদার সাথে সাংঘর্ষিক ভাবাই ঈমানের পরিচয়।

ভাষা নিয়ে ভাবনা

- বার বার ব্যবহৃত হওয়ার কারণে অসংখ্য শব্দ ও শব্দবন্ধ এখন অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে গেছে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে। অর্থাৎ বাংলাভাষার একটি বিরাট অংশের উপর হিন্দু মানসতার দখলিস্বত্ব পাকাপাকিভাবে কায়েম হয়ে গেছে। এবং অনেক হিন্দু যে বাংলাভাষাকে একমাত্র তাদেরই ভাষা বলে মনে করে।

- কিছু উদাহরণ পেশ করলেই আশা করি বিষয়টি পরিষ্কার হবে। 'সারদামঙ্গল' 'অন্নদামঙ্গল' 'মঙ্গলঘট' 'মঙ্গলপ্রদীপ' 'মঙ্গলাচার' 'মঙ্গলগীত' ইত্যাতি লিখতে লিখতে 'মঙ্গল' শব্দটিই এমন হয়েছে যে, 'মঙ্গলবার্তা' বা 'তোমার মঙ্গল হোক' এসবের মধ্যেও একটা হিন্দুয়ানী গন্ধ জেগে ওঠে। এভাবে 'অঞ্জলি' 'চরণ' 'প্রণাম' 'ত্রাতা' 'আরাধ্য' 'উপাসনা' 'সুপ্রভাত'

'স্বর্গাদপি' 'পিতৃদেব' 'পূজ্যপাদ' 'কীর্তন' 'লীলা' 'বিসর্জন' 'জল' 'প্রণাম' ইত্যাদি কতো যে শব্দ একান্তভাবে হিন্দুদের হয়ে গেছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

- মুসলিম চেতনা ও বিশ্বাসের সংগে সাংঘর্ষিক যে সকল শব্দ ও উপমা 'দেবভাষা' সংস্কৃত ও অন্য উৎস থেকে আহৃত, সেই ধরনের শব্দাবলীর অনুচিত ও অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার বর্জন করতে হবে। উদাহরণত, যেখানে স্বাভাবিকভাবেই 'জান্নাত' 'জাহান্নাম' ব্যবহৃত হওয়ার কথা, সেখানে 'নরক' 'স্বর্গলোক' 'অমরাবতী' ব্যবহারের যৌক্তিকতা কোথায়? 'ইন্তিকাল' এর বদলে 'পরলোকগমন' 'মরহুম'-এর স্থলে 'প্রয়াত' লেখা বা বলার মধ্যে সত্যিই কি কোনো যৌক্তিকতা আছে?

ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতা

- মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় এক বুদ্ধিজিবী বলেন, "হিজাব পরে ভণ্ডামি করলে চলবে না। অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির জন্য নিজে আগে পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক হতে হবে। মাথায় পাগড়ি পরে আমরা একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ করিনি" অর্থাৎ এই বক্তা মহোদয়ের বহুমূল্য বিবেচনায় মুসলিমত্ব পুরোপুরি পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত আদৌ অসাম্প্রদায়িক হওয়া যায় না। আসলে ধর্মনিরপেক্ষতা হলো, Green Snake in Green grass, সবুজ ঘাসে হরিৎবর্ণ বিষধর সরিসৃপ। আর এই সরীসৃপটির কাজই হলো, যে কোন উপায়ে ইসলাম ও মুসলিমকে দংশন করা। ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মিউজিকের কুপ্রভাব

- গত কয়েক বছরে Music-এর (নাচ-গানের) চর্চা অকল্পনীয় মাত্রায় বেড়ে গেছে। দেশে যেখানে শিক্ষা-গবেষণা ও সুনাগরিক তৈরিতে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি নেই, পর্যাপ্ত বিনিয়োগ নেই, সেখানে চরিত্রবিধ্বংসী নাচ-গানের পেছনে অনুদান বা বিনিয়োগ তথা আগ্রহের অন্ত নেই। যেখানে রোজই চিকিৎসার অর্থ না পেয়ে মৃত্যুর জন্য প্রহরগোনা অসহায় মানুষের করুণ মুখ পত্রিকায় ছাপা হয় সেখানে বহুজাতিক কোম্পানি ও বড় বড় ব্যবসায়িক

ইন্ডাস্ট্রিগুলো তাদের উপার্জিত অর্থের অনেকটাই ঢালে নৃত্য ও সঙ্গীতের পেছনে! এখনো যেদেশে বিরাটসংখ্যক মানুষের বাস দারিদ্র্যসীমার নিচে, আজো যারা পেটের আগুন নেভাতে গিয়ে নিজের ঈমান পর্যন্ত বিকিয়ে দিতে বাধ্য হয়, সেদেশেরই একশ্রেণীর নাগরিক নির্দ্বিধায় পঞ্চাশ হাজার টাকায় কেনে এক সন্ধ্যার কনসার্টের টিকেট! যেখানে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক নয়, সেখানে আবার অনেক কিন্ডারগার্টেনে নিষ্পাপ শিশুদের নৃত্য ও সঙ্গীত শেখা বাধ্যতামূলক! আমরা যে আজ নাচ-গানে কতটা মেতেছি তা প্রমাণে বোধ হয় আর কিছু বলার দরকার নেই। তারপরও খানেকটা ইঙ্গিত দেয়া যাক।

- আসলে বাঙের ছাতার মতো যত্রতত্র গজিয়ে ওঠা টিভি চ্যানেলগুলোই নিজেদের জনপ্রিয়তা বাড়াতে নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে নেমেছে মুসলিম সমাজকে গানে মাতাল বানাতে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে নীতি ও আদর্শ বিবর্জিত ব্যবসায়ী কোম্পানিগুলো। 'ক্লোজ আপ নাম্বার ওয়ান', 'গাও বাংলাদেশ গাও', 'ক্ষুদে গানরাজ', 'নির্মাণশিল্পীদের গান', গার্মেন্ট শ্রমিকদের গান', 'বাংলাদেশ আইডল', 'শাহরুখ খান লাইভ ইন কনসার্ট', 'ডেসটিনি ট্রাইনেশন বিগ শো' ইত্যাদি সব শিরোনামের আড়ালেই রয়েছে এ দুই শ্রেণীর বস্তুগত উদ্দেশ্য।

- মিডিয়ার অকল্পনীয় উন্নতির সুবাদে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীই মাতাল আজ এসব আয়োজনকে ঘিরে। দুঃখজনক সত্য হলো এসবে শুধু তরুণ প্রজন্মই মেতে নেই, মেতে আছেন একশ্রেণীর অপরিণামদর্শী অভিভাবক মহলও। নাচ-গান শেখানোর পেছনে নিজেদের কষ্টার্জিত অর্থ যদি তারা না ঢালেন, তবে তো নৃত্য-সঙ্গীতের স্কুলগুলো এত রমরমা ব্যবসা করতে পারে না। ইদানীং বিশ্বে অনেক কিছু নিয়েই জরিপ চালানো হয়। নাচ-গানে বিনিয়োগ-আত্মনিয়োগ নিয়ে যদি কোনো জরিপ পরিচালিত হয় তবে বাংলাদেশের মতো একটি গরিব দেশের নাম যে ওই তালিকার অন্যতম শীর্ষস্থানে থাকবে তাতে সন্দেহের কিছু নেই।

- এতসব আয়োজন ও আয়োজকদের বদান্যতায় এ জাতি এতটাই মেতেছে, দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জর এ জাতি এতটা মাতাল হয়েছে যে ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষ কোনো শ্রেণীর মানুষই গানের জোয়ারে গা না ভাসিয়ে বসে থাকছে না। আর সে জোয়ারেই ভেসে যাচ্ছে তরুণ প্রজন্মের নীতি-আদর্শ ও কাম্য সচ্চরিত্র। যে ইভটিজিং ও যৌন অপরাধের ব্যাপক

বৃদ্ধিতে এ দেশের চিরসবুজ শান্তির নিবাসগুলোতে জ্বলছে অশান্তির আগুন, তার অনেকখানি দায় এসব নাচ-গানকেন্দ্রিক আয়োজনের। অবৈধ ভালোবাসা আর জীবন ভোগের আহ্বানে সদা সরব এসব গান কাউকে স্বস্তি দিচ্ছে না। বরং তরুণ প্রজন্মের হৃদয়ে পাপের আগুনে ঘি ঢেলে দিচ্ছে।

- এমন কোনো স্থান নেই যেখানে গেলে গানের আযাব থেকে সম্পূর্ণ পরিত্রাণ মেলে। ঘরে বলেন বা বাইরে, পথে বলেন কিংবা যানবাহনে সর্বত্র ওই কানে অগ্নিবর্ষণকারী গানের আওয়াজ। বাসায় ঘুমিয়ে, পড়াশোনা করে এমনকি পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতে গিয়েও নিস্তার নেই এই গানের অশ্রাব্য আওয়াজ থেকে। ঘর থেকে বের হলেন তো সেরেছে! কোথায় যাবেন? দোকানে? সেখানেও কিন্তু গানের উপকরণের অভাব নেই। হেঁটে পথ পাড়ি দেবেন? সেখানেও দেখবেন মোবাইলে সজোরে গান শুনতে শুনতে কেউ না কেউ পথ চলছে। আর বাস বা যানবাহনের কথা তো বলাই বাহুল্য। বড় পরিতাপের বিষয় হলো একমাত্র নিরাপদ স্থান আল্লাহর ঘর মসজিদেও এই অভিশপ্ত গানের আওয়াজ ইদানীং কানে আসছে। অসচেতন কিছু মুসল্লী তাদের মোবাইলের রিংটোন হিসেবে গান ব্যবহার করায় এমনটি হচ্ছে। একজন মুসল্লী কিভাবে নিজের নিত্যসঙ্গী এই মোবাইল ফোনের রিংটোন হিসাবে গান পছন্দ করেন, তা কিছুতেই বোধগম্য নয়! তাহলে পাঠক একবার ভেবে দেখি, আমরা মুসলিমরা কোন পর্যায়ে চলে গিয়েছি যে, হারাম গানবাজনাকে সাথে নিয়েই মসজিদে প্রবেশ করি সলাত আদায়ের জন্য। এই সলাত হতে কিভাবে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশা করি?

- কেবল সংবাদ শোনা কিংবা নিছক ক্রিকেট খেলা দেখার অজুহাতে যারা টিভি দেখেন, তারাও আজ বিপদে আছেন। সংবাদের ফাঁকে বিজ্ঞাপনগুলোতে নাচ-গানের এমন দৃষ্টিকটু অনুপ্রবেশ থাকে যা তাদের মতো 'স্বল্পপুঁজির' ঈমানদারদেরও টিভির সামনে বসতে দ্বিধান্বিত করে।

- আসলে নাচ-গানের ক্ষতিকারক দিক এত বেশি যে তা নাজায়েয হওয়ার জন্য আলাদা কোনো প্রমাণের দরকার পড়ে না। তদুপরি মহান আল্লাহ ও রসূলুল্লাহ ﷺ -এর বহু ভাষ্য থেকে তা হারাম হওয়া প্রমাণিত। যেমন : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

- *'আর মানুষের মধ্য থেকে কেউ কেউ না জেনে আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বাজে কথা খরিদ করে, আর তারা ঐগুলোকে হাসি-ঠাট্টা হিসেবে গ্রহণ করে; তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব।' (সূরা লুকমান ঃ ৬-৭)*

- গান-গায়িকা এবং এর ব্যবসা ও চর্চাকে হারাম আখ্যায়িত করে রসূল ﷺ বলেন,

- *'তোমরা গায়িকা (দাসী) কেনাবেচা করো না এবং তাদেরকে গান শিক্ষা দিও না। আর এসবের ব্যবসায় কোনো কল্যাণও নেই। জেনে রেখ, এ থেকে প্রাপ্ত মূল্য হারাম।'* (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

- অন্যত্র রসূল ﷺ বলেন,

- *'আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে। আর তাদের মাথার ওপর বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকা নারীদের গান বাজতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দেবেন। এবং তাদের মধ্যে অনেককে শূকর ও বাঁদর বানিয়ে দেবেন।'* (ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)

- রসূল ﷺ আরও বলেন, *'আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোক সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশম, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল সাব্যস্ত করবে।'* (সহীহ বুখারী)

- আরেক জায়গায় তিনি বলেন, *'আল্লাহ তা'আলা আমাকে মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন এবং বাদ্যযন্ত্র, ক্রুশ ও জাহেলি প্রথা অবলুপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন।' (মুসনাদ আহমদ, বায়হাকী)*

- আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'পানি যেমন (ভূমিতে) তৃণলতা উৎপন্ন করে তেমনি গান মানুষের অন্তরে নিফাক সৃষ্টি করে।' (বায়হাকী)

- অথচ সবাই জানেন বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে মাদক ও পাপাসক্তির ক্রমবিস্তার প্রায় অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। হাজার প্রচারণা ও সচেতনতা বৃদ্ধির বিজ্ঞাপনেও নেশার ছোবল থেকে এদের রক্ষা করা যাচ্ছে না। এদের হাতেই রোজ খুন-ধর্ষণসহ ইত্যাকার নানা অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে। এসব নাচ-গানে ডুবে তারা মানবজীবনের মূল লক্ষ্য হারিয়ে হতাশার রোগে

আক্রান্ত হচ্ছে। আর তাই দেখা যায় তথাকথিত উন্নত দেশগুলোতেই আত্মহত্যার হার সবচেয়ে বেশি।

- আসলে পরকালের ভাবনাই মানুষের কুপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের ভেতরে সুপ্রবৃত্তি ও সদগুণাবলী জাগিয়ে তোলে। আর নাচ-গানের মূল সাফল্যই এখানে যে তা আখিরাত ভাবনাকে একেবারে ভুলিয়ে দেয়। মানুষের সুকুমার বৃত্তির ওপর পর্দা ফেলে ক্ষণিকের বস্তুতে মজে রাখে।

- সাহাবী ও তাবেয়ীদের ভাষ্য অনুযায়ী গান ও বাদ্যযন্ত্র বহু গুনাহের সমষ্টি। যেমন : ১) নিফাক বা মুনাফিকির উৎস ২) ব্যভিচারে উৎসাহদানকারী ৩) মস্তিষ্কের ওপর আবরণ ৪) কুরআনের প্রতি অনীহা সৃষ্টিকারী ৫) আখিরাতের চিন্তা নির্মূলকারী ৬) গুনাহের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিকারী।

- আজ বড্ড প্রয়োজন তাই এ নাচ-গানের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করা। মসজিদ, মাহফিলে, আলোচনার টেবিলে এবং সব ধরনের মিডিয়াতে এ ব্যাপারে সর্বশ্রেণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এ জাতির অস্তিত্ব, সমৃদ্ধি ও মঙ্গলের স্বার্থেই তা জরুরী। হ্যাঁ, নাচ-গান তথা অসুস্থ বিনোদনের প্রতি মানুষকে নিরুৎসাহিত করার পাশাপাশি সুস্থ বিনোদনের দিকেও পথনির্দেশ করতে হবে। বিনোদন মাধ্যমের উন্নতির যুগে মানুষের জন্য কুরআন-হাদীসের আলোচনা, হামদ-নাত, ইসলামী সঙ্গীতও সহজলভ্য করতে হবে। এ জন্য দরকার এসব কাজে পৃষ্ঠপোষকতা করা। এসবের সঙ্গে জড়িতদের বুদ্ধি-পরামর্শ ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করা। কারণ, মানুষকে উত্তম বিকল্প না দেয়া পর্যন্ত মানুষ কোনোদিন মন্দ থেকে বিরত থাকবে না।

- আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে গান-বাদ্যের ফিতনা থেকে দূরে থাকার এবং এসব বন্ধে কাজ করার তাওফীক দিন।

পহেলা বৈশাখ ও নিউইয়ার উদযাপন করার বিধান

নববর্ষ উদযাপন করা জায়িয কিনা

বাংলা নববর্ষ 'পহেলা বৈশাখ', ইংরেজি নববর্ষ 'থার্টিফাস্ট নাইট' কিংবা হিজরি নববর্ষ পালন করা ইসলাম সম্মত নয়। ইব্ন কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "কোন মুসলিমের সুযোগ নেই কাফিরদের সামঞ্জস্য গ্রহণ করা, না তাদের ধর্মীয়

উৎসবে, না মৌসুমি উৎসবে, না তাদের কোন ইবাদতে। কারণ আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতকে সর্বশেষ নাবী দ্বারা সম্মানিত করেছেন, যাকে পরিপূর্ণ ও সর্বব্যাপী দ্বীন দেয়া হয়েছে। যদি মূসা ইব্ন ইমরান জীবিত থাকতেন, যার উপর তাওরাত নাযিল হয়েছে; কিংবা ঈসা ইব্ন মারইয়াম জীবিত থাকতেন, যার উপর ইঞ্জিল নাযিল হয়েছে; তারাও ইসলামের অনুসারী হত। তারাসহ সকল নাবী থাকলেও কারো পক্ষে পরিপূর্ণ ও সম্মানিত শরীয়তের বাইরে যাওয়ার সুযোগ থাকত না। অতএব মহান নাবীর আদর্শ ত্যাগ করে আমাদের পক্ষে কীভাবে সম্ভব এমন জাতির অনুসরণ করা, যারা নিজেরা পথভ্রষ্ট, মানুষকে পথভ্রষ্টকারী ও সঠিক দ্বীন থেকে বিচ্যুত। তারা বিকৃতি, পরিবর্তন ও অপব্যাখ্যা করে আসমানী ওহির কোন বৈশিষ্ট্য তাদের দ্বীনে অবশিষ্ট রাখেনি। দ্বিতীয়ত তাদের ধর্ম রহিত, রহিত ধর্মের অনুসরণ করা হারাম, তার উপর যত আমল করা হোক আল্লাহ গ্রহণ করবেন না। তাদের ধর্ম ও মানব রচিত ধর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহ যাকে চান সঠিক পথের সন্ধান দান করেন"।

নববর্ষ উদযাপন করে আমরা অন্যধর্মের অনুসরণ করতে পারি না। এসব তাদের বানানো উৎসব ও কুসংস্কার।

আমরা বিভিন্ন উপলক্ষে যেসব অনুষ্ঠান পালন করি তার অধিকাংশ ইহুদি, খৃস্টান ও মুশরিকদের তৈরি। সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে আমরা আকীকা ত্যাগ করে খাতনার সময় ঘটা করে অনুষ্ঠান করি। খাতনা করা সুন্নত, এতে কোন অনুষ্ঠান নেই, অথচ আমরা অনুষ্ঠান করি, এদিকে আকীকা দেয়া নাবী ﷺ -এর নির্দেশ, অথচ আমরা অনেকেই তা ত্যাগ করেছি এবং অপরদিকে অনেকেই অতিরিক্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করি। আমরা কি এতটাই নির্বোধ বনে গেলাম! আমরা প্রতিদিন কমপক্ষে সতেরো বার সূরা ফাতিহা পাঠ করে সিরাতে মুস্তাকিমের প্রার্থনা করি, বাস্তবে আমরা যা ত্যাগ করছি, অর্থাৎ নাবী ﷺ -এর পথ ও সুন্নত। কমপক্ষে সতেরো বার অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের রাস্তা থেকে পানাহ চাই, অথচ বাস্তবে আমরা তাদের অনুসরণ করছি!

মুসলিমের একমাত্র উৎসব ঃ ঈদ

আমাদের মুসলিমদেরকে ইসলামে স্বীকৃত উৎসব ঈদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। আমাদের উৎসব ঈদ শুধু একটি উৎসবই নয়, বরং একটি ইবাদতও, যার দ্বারা আমরা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করি। এ ঈদের সংখ্যা তিনটি, চতুর্থ কোন ঈদ নেই। জুমা, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আদহা। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নাবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি:

“নিশ্চয় জুমার দিন ঈদের দিন, অতএব তোমাদের ঈদের দিনকে তোমরা সিয়ামের দিন বানিয়ো না, তবে তার পূর্বে কিংবা পরে যদি সিয়াম রাখ, তাহলে পার” । (সহীহ মুসলিম)

আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

“নাবী ﷺ মদিনায় আগমন করলেন, তখন তাদের দু’টি দিন ছিল, যেখানে তারা খেলা-ধুলা করত । তিনি বললেন : এ দু’টি দিন কী? তারা বলল: আমরা এতে জাহিলি যুগে খেলা-ধুলা করতাম । রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: নিশ্চয় আল্লাহ তা’আলা তার পরিবর্তে তার চেয়ে উত্তম দু’টি দিন দিয়েছেন: ঈদুল আদহা ও ঈদুল ফিতর” ।

ইব্ন তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন : এ হাদীস প্রমাণ করে যে কাফিরদের উৎসব পালন করা হারাম । কারণ নাবী ﷺ আনসারদের জাহিলি দুই ঈদের উপর বহাল রাখেননি । রীতি মোতাবেক তাতে খেলা-ধুলার অনুমতি দেননি । তিনি বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে পরিবর্তন করে দিয়েছেন । এর দাবি পূর্বের আমল ত্যাগ করা । কারণ বদল করার পর উভয় বস্তুকে জমা করা যায় না । বদল শব্দের অর্থ একটি ত্যাগ করে অপরটি গ্রহণ করা । অতএব কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় ইহুদি, খৃস্টান ও মুশরিকদের উৎসব পালন করা, যেমন নববর্ষ ও অন্যান্য উৎসবসমূহ ।

শুভ নববর্ষ বলা

আমরা চিন্তা করেছি কিংবা ভেবে দেখেছি যে, নববর্ষের শুরুতে যখন বলি, যাকেই বলি: “শুভ নববর্ষ”, কিংবা “হ্যাপি নিউ ইয়ার”? কার অনুসরণ করছি, কাকে বলছি ও কী বলছি? নিশ্চয় আমরা চিন্তা করিনি, চিন্তা করলে কখনো আমাদের বিবেক সায় দিত না কুফরী কথার পক্ষে, কিংবা তাদের শুভেচ্ছা জানানোর প্রতি, যারা ঈসা আলাইহিস সালামকে বলেছে স্বয়ং আল্লাহ, কখনো বলেছে আল্লাহর পুত্র, কখনো বলেছে তিনজনের তৃতীয় সত্বা ।

যারা আল্লাহর সাথে শরীক করেছে ও তাঁর অসন্তোষের পাত্রে পরিণত হয়েছে, তাদের জন্য আল্লাহ জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন, আমরা কিভাবে তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাই, কিভাবে তাদের অনুসরণ করি এবং বলি নববর্ষের শুভেচ্ছা! ইব্ নুল কায়্যিম জাওযি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “তাদেরকে তাদের কুফরী উৎসব উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানানো সবার জন্যে হারাম, যেমন বলা: “তোমার উৎসব সফল হোক”, “শুভ বড় দিন” অথবা এ জাতীয় অন্যান্য শব্দ, যা বর্তমান আমরা

শুনতে পাই। এভাবে শুভেচ্ছা জানানোর ফলে যদিও সে কাফির হয় না, কিন্তু তার এ কর্ম হারাম তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ প্রকারান্তরে এভাবে সে ক্রুশকে সিজদার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছে! এ জাতীয় শুভেচ্ছা মদ্যপ, হত্যাকারী ও ব্যভিচারীকে শুভেচ্ছার জানানোর চেয়ে মারাত্মক। অথচ যে কবীরা গুনাহের জন্য শুভেচ্ছা জানাল, সে নিজেকে আল্লাহর শাস্তি ও অসন্তোষের জন্য প্রস্তুত করল"।

নববর্ষ ও আমাদের সতর্কতা

আমরা বছরের অন্যান্য দিনের ন্যায় নববর্ষের দিনকে গণ্য করব। এতে কোন ধরণের অনুষ্ঠান করব না ও তাতে অংশ নেব না। আমাদের সন্তানদের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখব, যেন তারা বিজাতীয় উৎসবে অংশগ্রহণ না করে।

সন্তান কিংবা পরিবারের কোন সদস্যের আবদার রক্ষার্থে আল্লাহর নির্দেশ উপেক্ষা করে তাদের উৎসব উদযাপন করা যাবে না। ইমাম যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "যদি কেউ বলে: আমরা এগুলো ছোট বাচ্চা ও নারীদের জন্য করি, তাকে বলা হবে: সবচেয়ে হতভাগা সে ব্যক্তি যে আল্লাহর অসন্তোষের বস্তু দ্বারা পরিবার ও সন্তানকে সন্তুষ্ট করে।

ভুল ধারণার অপনোদন

আমরা বলে থাকি পহেলা বৈশাখ পালন হচ্ছে বাঙালী কালচারাল অনুষ্ঠান, এর সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই, আমরা বাঙালী জাতি হিসেবেই পহেলা বৈশাখ পালন করে থাকি, এতে অসুবিধাটা কোথায়? অবশ্যই ধর্মের জায়গায় ধর্ম, আর জাতির জায়গায় জাতি।

সর্বপ্রথম দেখতে হবে আমার পরিচয় কী? আমার পরিচয় হচ্ছে আমি মুসলিম। জাতিগতভাবে একজন মুসলিম হতে পারে বাঙালী, ইংরেজ, চাইনিজ অথবা আফ্রিকান। এই সকল জাতি তার জাতিগত কালচারাল অনুষ্ঠান পালন করতে পারবে কিন্তু অবশ্যই একজন মুসলিম হিসেবে যেন তা ইসলামী আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। কারণ আকীদা হচ্ছে ঈমানের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। তাই আমি যেই জাতির মুসলিম-ই হই না কেন একজন ঈমানদার মুসলিম হিসেবে আগে আমাকে ইসলামী আকীদাগত বিষয়গুলো সম্পর্কে খুব ভাল করে পড়াশোনা করে জেনে নিতে হবে যে আমি কী করতে পারবো আর কী করতে পাবো না। কোন ভাবেই যেন হালালের সাথে হারামের সংমিশ্রণ হয়ে না যায়।

চাইনিজদের সবচেয়ে বড় উৎসব হচ্ছে 'চাইনিজ নিউ ইয়ার'। এই সময় তাদের সাতদিন সরকারী ছুটি থাকে এবং এই সাতদিন ধরে চলে তাদের নানা রকম কালচারাল অনুষ্ঠান, বিগত পূর্বপুরুষদের পূজা করা এই অনুষ্ঠানের একটি অংশ। চাইনিজদের মধ্যেও অনেক মুসলিম রয়েছে। তারা কি তাদের জাতির ঐ সাতদিন ব্যাপি 'চাইনিজ নিউ ইয়ার' উৎসব পালন করে? অবশ্যই মুসলিম চাইনিজরা তা পালন করে না। কারণ ঐ সাতদিন ব্যাপী যে কালচারাল অনুষ্ঠান হয় তা ইসলামী আকীদা অর্থাৎ ঈমানের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক।

পৃথিবীতে দু'প্রকার দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) রয়েছে:

(ক) মানব রচিত দ্বীন যেমন হিন্দু, বৌদ্ধ ও অগ্নিপূজক ইত্যাদি।

(খ) আল্লাহর দেয়া (আসমানী বা ওহী নির্ভর) দ্বীন যেমন ইহুদিধর্ম, খৃস্টান ধর্ম ও ইসলাম।

মানব জাতির হিদায়াত ও কল্যাণের জন্য আল্লাহ তা'আলা সকল নাবী ও রসূলকে এ দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন। ইহুদি-খৃস্টানদের দ্বীন আজ পরিবর্তিত, রহিত ও মানব রচিত দ্বীনের ন্যায় প্রত্যাখ্যাত। আল্লাহর নিকট তার কোন মূল্য নেই। আল্লাহ আমাদেরকে সর্বোত্তম দ্বীন, সর্বোত্তম কুরআন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী ও রসূল দান করেছেন।

আসুন আমরা কুরআন ও হাদীসের আলোকে পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করি এবং কাফির মুশরিকদের সঙ্গ ত্যাগ করি, তাদের কৃষ্টি-কালচার পরিহার করি। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণকারী ও একনিষ্ঠভাবে শুধু তাঁরই ইবাদতকারী হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

মূর্তি, ভাস্কর্য ও ইসলাম

আভিধানিক অর্থে ভাস্কর্য ঃ

ভাস্কর্য বা স্কালপচার (Sculpture)ঃ যে আকৃতি বা ছবি পাথর বা অন্যকিছুতে খোদাই করে তৈরি করা হয় তা-ই ভাস্কর্য। 'ভাস্কর্য বিদ্যা'-এর অর্থ, The art of carving বা খোদাই বিদ্যা। যিনি এ বিদ্যা অর্জন করেছেন অর্থাৎ যিনি খোদাই করে আকৃতি বা ছবি নির্মাণ করেন, তাকে বলা হয় ভাস্কর (Sculptor)। অক্সফোর্ড অভিধানে ভাস্কর (Sculptor) সম্পর্কে বলা হচ্ছে–

One who carves images or figures. অর্থাৎ যে ছবি অথবা আকৃতি খোদাই করে তৈরি করে।

পক্ষান্তরে মূর্তি অর্থ ছায়া অথবা এমন আকৃতি বা শরীর যার ছায়া আছে। ভাস্কর্য ও মূর্তির আভিধানিক অর্থে স্পষ্ট পার্থক্য দেখা গেল। এককথায় যে সকল আকৃতি খোদাই করে তৈরি করা হয় তা ভাস্কর্য– রৌদ্র বা আলোর বিপরীতে যার ছায়া পড়ে না। আর যে সকল আকৃতি এমনভাবে নির্মাণ করা হয়, রৌদ্রে বা আলোর বিপরীতে যার ছায়া প্রকাশ পায়, তা হল মূর্তি। বিভিন্ন অভিধানে এভাবেই বলা হয়েছে।

কেউ কেউ মনে করেন যে সকল আকৃতি পূজা অর্চনার উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয় সেগুলোকে মূর্তি বলে। আর যা পূজার জন্য নয়, তার নাম ভাস্কর্য। এটা ঠিক নয়, পূজার জন্য হলেও মূর্তি, পূজার জন্য না হলেও মূর্তি।

কাজেই বিভিন্ন উন্মুক্ত স্থানে যে সকল মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে তাকে ভাস্কর্য বলে চালিয়ে দেয়া একটি মূর্খতা। উদ্দেশ্য হল, ভাস্কর্য শিল্পের নামে ইসলামী সংস্কৃতির বিরোধিতা করা এবং অন্ধকার যুগের পৌত্তলিক সংস্কৃতি-কে বাঙালীর সংস্কৃতি বলে প্রতিষ্ঠিত করা।

ভাস্কর্য সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কী?

কোন প্রাণীর ছবি, ভাস্কর্য, মূর্তি একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত তৈরি করা, প্রদর্শন করা বা স্থাপন করা যাবে না। ছবি, ভাস্কর্য, মূর্তি ইত্যাদিকে ইসলাম দু'ভাগে ভাগ করে। ১) প্রাণীর ছবি। ২) প্রাণহীন বস্তুর ছবি।

রসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীসে এসেছে– আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রসূল' ﷺ একদিন সফর থেকে ফিরে আসলেন। আমি একটি পর্দা টানিয়েছিলাম। যাতে প্রাণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবি ছিল। রসূল ﷺ যখন এটা দেখলেন, ক্রোধে তার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন, হে আয়িশা, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি তার হবে, যে আল্লাহর সৃষ্টির সাদৃশ্য নির্মাণ করে।' অতঃপর আমি সেটাকে টুকরো করে একটি বা দুটি বালিশ বানালাম। (সহীহ মুসলিম)

আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ আমাকে নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন যে, 'কোনো প্রতিকৃতি রাখবে না, সবগুলো ভেঙে দেবে।

আর কোনো উঁচু কবর রাখবে না, সবগুলো সমতল করে দেবে।' (সহীহ মুসলিম, আবু-দাউদ, আন-নাসাঈ)

আবু তালহা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ঘরে কুকুর ও প্রতিকৃতি আছে সেখানে ফিরিশতা প্রবেশ করে না।' (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

প্রাণী ব্যতীত যে কোনো বস্তুই হোক তার ছবি, ভাস্কর্য, মূর্তি ইত্যাদি অঙ্কন, নির্মাণ, স্থাপন ও প্রদর্শন করা যাবে। কারণ, হাদীসে যে সকল নিষেধাজ্ঞার কথা এসেছে তার সবই ছিল প্রাণীর ছবি বিষয়ে। কেউ যদি কোনো ফুল, ফল, গাছ, নদী, পাহাড়, চন্দ্র, সূর্য, ঝর্ণা, জাহাজ, বিমান, গাড়ি, যুদ্ধাস্ত্র, ব্যবহারিক আসবাব-পত্র, কলম, বই ইত্যাদির ভাস্কর্য তৈরি করে সেটা ইসলামে অনুমোদিত।

যতগুলো পৌত্তলিকতা-বিরোধী ধর্ম আছে তার মধ্যে ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে' বেশি সোচ্চার। পৌত্তলিকতা বা শিরক হলো মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি মারাত্মক অবিচার। এটা ক্ষমার অযোগ্য অন্যায়। এটা হলো আল্লাহর প্রভুত্বকে অস্বীকার করে তাঁর প্রাপ্য উপাসনা অন্যকে নিবেদন করা। অবশ্য যারা ভোগবাদী দর্শনে বিশ্বাসী, সৃষ্টিকর্তা ও পরকাল যাদের কাছে গুরুত্বহীন, তাদের কাছে পৌত্তলিকতা আর একত্ববাদ কোনো বিষয় নয়।

ছবি, প্রতিকৃতি, ভাস্কর্য আর মূর্তিকে ইসলাম পৌত্তলিকতার প্রধান উপকরণ বলে মনে করে। শুধু মনে করা নয়, তার ইতিহাস, অভিজ্ঞতা স্পষ্ট। শুধু ইসলাম ধর্ম যে পৌত্তলিকতাকে ঘৃণার চোখে দেখে তা নয় বরং আরো দুটি একেশ্বরবাদী ধর্মের অনুসারী ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কাছেও তা ঘৃণিত।

অতীতে পৌত্তলিকতার সূচনা হয়েছিল ছবি বা প্রতিকৃতির মাধ্যমে। ছবি ও ভাস্কর্যের পথ ধরেই যুগে যুগে পৌত্তলিকতার আগমন ঘটেছে। আর এ পৌত্তলিকতার অন্ধকার থেকে তাওহীদের আলোতে নিয়ে আসার জন্যই আল্লাহ যুগে যুগে নাবী ও রসূলদের পাঠিয়েছেন। আজীবন তাঁরা এ পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম করেছেন। অনেকে জীবন দিয়েছেন। অনেকে দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। এ জন্যই ইসলাম ও অন্যান্য একেশ্বরবাদী ধর্ম মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে সোচ্চার। মূর্তিপূজা ও পৌত্তলিক সংস্কৃতির বিরোধিতা করা তাদের ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সকল প্রশ্নের একমাত্র উত্তর আমি মুসলিম

একজন মুসলিম, সে যতো বড় বাঙ্গালীই হোক, তাঁর কাছে কোনটা অধিক গৌরবের, কাহ্নপা জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস কি শ্রীচৈতন্য বা ন্যাড়ার ফকির সাঁইবাবাদের উত্তরাধিকার, নাকি মহানাবী ﷺ এবং তাঁর অনুপম-চরিত্র সাহাবী (রা.)-দের উত্তরাধিকার? একজন মুসলিম সন্তানের অন্তর সত্যসত্যই কোন আনন্দে হিল্লোলিত হয়ে ওঠে, কবিগান-ঘেঁটুগান শারদীয় দুর্গোৎসব, রথযাত্রা, রাখীবন্ধন, ভাইফোঁটা ইত্যাদি নিয়ে, নাকি উমার (রা.), খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.), সালাহদীন আইয়ূবী, মুহম্মদ বিন কাসিম, মাহমুদ গজনাবী, বখতিয়ার খিলজী প্রমুখ বীর সিপাহসালার, যাঁরা ইসলামকে অপ্রতিহত বেগে ছড়িয়ে দিয়েছেন দিকে দিকে। এই শেষোক্ত গৌরবোজ্জ্বল উত্তরাধিকারকে যদি কেউ ভুলে থাকতে চায়, থাকতে পারেন; কেউ যদি অস্বীকার করতে চায়, তাও পারেন; কিন্তু সেটা যেহেতু ইসলামী চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক, এই বিস্মৃতি ও অস্বীকৃতিকে ঘোরতর আত্মঘাতী বলা হবে।

আল কুরআনে আল্লাহ সমস্ত সমস্যার সমাধান দিয়েছেন, তিনি বলেন ঃ এটাই আমার সহজ পথ সুতরাং এ পথ ধরেই চল। অন্য পথে যাবে না। তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। (সূরা আন'আম ৬ ঃ ১৫৩)

নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেরা নিজেদেরকে পরিবর্তন করে। (সূরা রা'দ ১৩ ঃ ১১)

মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য এই যে, যখন তাদেরকে ফায়সালার জন্যে আল্লাহ ও রসূলের (বিধানের) প্রতি ডাকা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। আর এরূপ লোকেরাই প্রকৃত সফলকাম। (সূরা নূর ২৪ ঃ ৫১)

আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে সম্পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহকে সম্যকভাবে সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্যে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম (মনোনীত করলাম)। (সূরা মায়িদা ৫ ঃ ৩)

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারের লোকদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও যার ইন্ধন (জ্বালানী) হবে মানুষ ও পাথর। (সূরা আত তাহরীম ঃ ৬)

সন্তানদেরকে এবং নিজ পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য পিতামাতাদের যে গাইডলাইন প্রয়োজন তা আমাদের প্রকাশিত "ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ" সংগ্রহ করে অনুসরণ করতে পারি।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

মুসলিম মেয়েদের সংক্ষিপ্ত পোশাক (ড্রেস) যখন বিপদের কারণ

মানুষ যেসব বৈশিষ্ট্যের কারণে অন্যসব প্রাণী থেকে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে তার অন্যতম হলো পোশাক। মানুষের মতো অন্য প্রাণীরাও খায়, ঘুমায় এবং জৈবিক চাহিদা মেটায়। প্রাণীরা মানুষের মতো আপন লজ্জাস্থান ঢাকে না ঠিক। তবে আল্লাহ তা'আলা জন্মগতভাবেই তাদের লজ্জাস্থান স্থাপন করেছেন কিছুটা আড়ালে। প্রাণীদের মধ্যেও আছে লজ্জার ভূষণ। মানুষ তাহলে আব্রু ঢাকায় পশুর চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে কীভাবে? হ্যা, মানুষও লজ্জা নিবারণ করে ঠিকই কিন্তু তা পরিশীলিত পোশাক ও আকর্ষণীয় বেশ-ভূষার মাধ্যমে। যে কেউ চাইলেই দেখতে পারে পশুর লজ্জাস্থান। পক্ষান্তরে মানুষের লজ্জাস্থান এতোটা সুরক্ষিত ও আচ্ছাদিত যে তার সম্মতি ছাড়া অন্যের দৃষ্টি সেখানে পৌঁছতে অক্ষম।

মানুষের এই বৈশিষ্ট্যের কথা একেবারে ভুলে গেছে অমুসলিম দুনিয়া। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, অমুসলিমদের পর এবার মুসলিম মেয়েরা যেন এ বৈশিষ্ট্য জলাঞ্জলী দিতে বসেছে! মুসলিম রমণীদের পোশাকেও নেই মার্জিত রুচি বা ভদ্রতার লেশ। স্যাটেলাইট প্রযুক্তির যুগে তরুণীদের সংক্ষিপ্ত পোশাকের কথা বলে শেষ করা যাবে না, তাদের লজ্জা নিবারণের প্রচেষ্টা দেখে লজ্জায় মাথা ঘুরে যায়। ইদানীং মেয়েদের পোশাক দেখলে মনে হয় এটা শরীর ঢাকার চেষ্টা নয় বরং শরীর খুলে রাখার প্রতিযোগীতা।

মেয়েদের ড্রেসের প্রায় প্রতিটি অংশই কাপড় বাঁচানোর অশোভন প্রয়াসের নীরব সাক্ষী। জামার কলার ছোট হতে শুরু করেছে।

পুরুষরাও আজ পোশাক আগ্রাসনের শিকার। অশ্লীলতা আর রুচির বিকারে জর্জরিত। ইদানীং ছেলেরাও ঝুঁকেছে টাইট পোশাকের দিকে। মেয়েরা যদি হয় স্বল্প বসনা, ছেলেরা তবে হতে চলেছে টাইট ফ্যাশনপ্রিয়।

ছেলেদের প্যান্টগুলো এত টাইট যে সেটা পরে ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী বসে টয়লেট ব্যবহার করা যায় না। নামাযে ঠিকমতো রুকু সিজদাও করা অসম্ভব হয়ে যায়। বেল্ট মোড়ানো হলেও রুকু অবস্থায় মেরুদণ্ডের কিছু অংশও তাতে বেরিয়ে পড়ে। আর তাদের টি-শার্টগুলো যেন হয়ে উঠেছে চারুকলার শিক্ষানবিশদের প্রদর্শনীর গ্যালারি, প্রাণীর ছবি ছাড়া টি-শার্টই খুঁজে পাওয়া যাবে না। আরো একটু বেশী সাহসী ছেলেরা নগ্ন ছবিওয়ালা টি-শার্টও পরিধান করে থাকে। মেয়েরা চুল ছোট করে রাখছে আর ছেলেরা মেয়েদের মতো চুল বড় করছে সেইসাথে কানে, নাকে দুল পড়ছে।

আমরা সবাই জানি, বর্তমানে বাংলাদেশে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় Eveteasing (ইভটিজিং)। পত্রিকার পাতা খুললেই প্রতিদিন চোখে পড়ে দেশের নানা প্রান্তের ইভটিজিংয়ের খণ্ডচিত্র। ২০১৩ সালে ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করায় নাটোরে প্রাণ হারাতে হলো জাতিগড়ার কারিগর খ্যাত একজন প্রতিবাদী শিক্ষককে। ঘটনার পর দিনই ফরিদপুরে এ কাজে বাধা দিতে গিয়ে বখাটের হাতে প্রাণ হারালেন এক মা। তার পরদিন নওগাঁয় তিনজনকে আহত করা হলো একই কারণে। নড়েচড়ে উঠলো সারা দেশ। শুরু হলো ইভটিজিং বিরোধী নানা কর্মতৎপরতা। কোথাও দেখা যাচ্ছে সচেতন জনতা এগিয়ে আসছেন বখাটেদের দমনে, কোথাও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, কোথাও খোদ মেয়েরা। টাঙ্গাইলের একটি চমকপ্রদ খবরও চোখে পড়ল। সচিত্র এই প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, বখাটেদের শায়েস্তা করতে মেয়েরা কারাতে (karate) শিখছেন। সরকারিভাবেও বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেয়া হলো। হাইকোর্ট থেকেও ইভটিজিং প্রতিরোধে নীতিমালা প্রণয়নে সরকারকে নির্দেশ দেয়া হলো। এতসব উদ্যোগ-আয়োজনকে ব্যর্থ করে রোজই বেড়ে চলেছে ইভটিজিং ভাইরাসের প্রকোপ।

সমস্যার গোড়া কোথায় তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা যাক। গাছের গোড়া কেটে দিয়ে মিনারেল ওয়াটার কিংবা এরচেয়ে বিশুদ্ধতর পানিও যদি তার মাথায় ঢালা হয়, তাতে কাজের কাজ কিছুই হবে না। গাছটির মৃত্যু অবধারিত।

নানা মুনী নানা মত দিয়ে আসলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না, উত্তরোত্তর ইভটিজিং সমস্যা বেড়েই চলেছে। জানি না কাকতালীয় কি-না, যেদিন বোরকা পরাকে কেন্দ্র করে কাউকে ধর্মীয় পোশাক পরতে বাধ্য করা যাবে না মর্মে হাইকোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত রায় দিলো। তারপর থেকে সহসাই যেন ইভটিজিংয়ের ঘটনা উদ্বেগজনকহারে বেড়ে চললো। ইভটিজিং শব্দটি ঝড় তুললো প্রতিটি চায়ের টেবিলে। মিডিয়ার সিংহভাগ স্থান দখল করে নিতে লাগলো এই অশুভ শব্দটি।

সত্যি কথা হলো ইভটিজিংয়ের অনেক ঘটনার পেছনেই এই অশ্লীল পোশাকের প্রভাব রয়েছে। ইভটিজিং বন্ধ করতে কোন উদ্যোগেই কাজ হবেনা, পোশাকে শালীনতা আর রুচিতে মার্জিত বোধের বিকাশই পারে ইভটিজিং প্রতিরোধে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে।

নারীর স্বাধীনতা নাকী অসম্মান!

- নারীর স্বাধীনতা বলতে কী বুঝায়? আমরা দেখছি দেশের সর্বত্রই নারী স্বাধীনতার নামে কিছু কাজকর্ম হচ্ছে। যেমন ঃ
  - রাস্তা-ঘাটে যতো পোষ্টার বিজ্ঞাপন হিসেবে টানানো হয় সেখানে পুরুষদের তুলনায় নারীদের বেশী অশ্লিল ছবি দেখা যায়!
  - পত্র-পত্রিকায় নারী-পুরুষের যতো ছবি ছাপা হয় তার মধ্যে নারীদেরকেই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অশালিন সংক্ষিপ্ত পোশাকে দেখা যায়!
  - নাটক-সিনেমায় যা প্রচার হয় তার মধ্যে পুরুষদের তুলনায় নারীদের বেশী অশ্লিল ও অনৈতিক ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যায়
  - ঘরের বাইরে, শপিং মলে, পার্কে, কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় মেয়েরা বেশী সর্ট ড্রেস পরে থাকে!
  - কোন নতুন মডেলের গাড়ি বা মোটর সাইকেলের বিজ্ঞাপনে দেখা যায় গাড়ির পাশে একটি বা দুটি মেয়ে সংক্ষিপ্ত অশালিন পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে! এমন কি ঢাকার গাড়ি বিক্রির মেলাতেও এখন পাশ্চাত্যের মতো করে তরুণীদেরকে সংক্ষিপ্ত পোশাকে বা অশালীনভাবে শাড়ি পড়িয়ে বসিয়ে রাখা হয়।

- সাবান একটি প্রয়োজনীয় পণ্য যা নরনারী সকলেরই প্রয়োজন, কিন্তু টিভি বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে মডেল হিসেবে একটি স্বল্পবসনা নারী গোসল করছে! অভিভাবক হিসেবে আমরা কি কখনও একটু চিন্তা করে দেখেছি যে, আমরা মুসলিমরা কতটা মূল্যবোধহীন হয়ে গেছি যে, পরিবারের সকলে মিলে টিভেতে একজন নারীকে গোসল করতে দেখি! যে পরিবারে একসাথে এমন দৃশ্য দেখা হয়, সেই পরিবারের মুসলিম সন্তানরা বড় হয়ে কেমন হবে বলে আশা করি?

- ব্লেড, রেজার বা সেভিং ক্রিমের বিজ্ঞাপনে পুরুষের সাথে নারীকেও দেখানো হচ্ছে অশালীনভাবে!

- কন্ডমের বিজ্ঞাপনে নারীকে না দেখালেই কি নয়? এমন কি স্বামী স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ অবস্থাও দেখানো হচ্ছে।

- বাজারে সাধারণত যে সকল ড্রেস পাওয়া যায় তাতে ছেলেদেরগুলো থাকে ঢিলেঢালা, কিন্তু মেয়েদের ড্রেস থাকে এমন ডিজাইনের যাতে করে তার শরীরের গঠন প্রণালী ফুটে উঠে।

- কোন প্রধান অতিথিকে সম্মর্ধনা দিতে ফুল হাতে দুই লাইনে দাড় করানো হচ্ছে নারীদেরকে!

- শিল্পমেলা বা বাণিজ্য মেলার স্টলগুলোতে সেলস গার্ল হিসেবে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে নারীদেরকে কিন্তু অশালীন পোশাকে বা উগ্র সাজে।

আমরা যদি উপরের এই বাস্তব চিত্রগুলোর দিকে তাকাই এবং গভীরভাবে চিন্তা করি তাহলে কি বলবো যে এগুলো নারী স্বাধীনতা? নাকী স্বাধীনতা ও অধিকারের নামে নারীদেরকে অসম্মান করা। নারীরা তাদের শরীরের সবচেয়ে গোপন অংশও পাবলিকের সামনে উন্মুক্ত করে ফেলছে। এটা অনেকটা জেনে বুঝে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারার মতো। নিজের মূল্যবান সম্পদ শরীর অন্যকে প্রদর্শন করার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। তাই নারীর সম্মান নারী নিজেকেই সচেতন হয়ে রক্ষা করতে হবে।

একজন নারীবাদী মহিলা মন্তব্য করেছেন যে - "নারীদের জন্য সংক্ষিপ্ত ড্রেস তো পুরুষরাই তৈরী করে, এতে নারীদের দোষ কোথায়?" প্রশ্ন হলো বিষও তো পুরুষরা তৈরী করে সেজন্য আমি জেনেশুনে তো আর বিষ পান করতে পারি না বা বিষ পান করে তো আর পুরুষদের দোষ দিতে পারি না।

- ২০১৩ সালে চীন সরকার নারীদেরকে অসম্মানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এবং নিরাপত্তা দেয়ার জন্য সরকারীভাবে আইন করেছে এখন থেকে মেয়েরা আর সর্ট স্কার্ট পরতে পারবে না।

- আমরা পত্রিকায় দেখেছি যে ক্যানাডার একজন উর্ধতন পুলিশ অফিসার তার অভিজ্ঞতা থেকে মন্তব্য করেছিলেন যে, মেয়েদের রাস্তা-ঘাটে Sexual Assault হওয়ার জন্য দায়ী তাদের সর্ট এবং আপত্তিকর ড্রেস।

বোনেরা আসুন কয়েকটা কথা ভেবে দেখি। যেহেতু সর্বত্র নারী স্বাধীনতার কথা বলা হচ্ছে, একজন স্বাধীন নারী হিসেবে যদি আমি যা ইচ্ছে তাই (সংক্ষিপ্ত ড্রেস) পরতে পারি তাহলে তো একজন নারী হিসেবে আমার এই স্বাধীনতাও আছে যে ঃ

- আমি আমার শরীর অন্যকে প্রদর্শন করবো না, ঢেকে রাখবো।
- আমি অন্যের হাতের পুতুল হবো না।
- অনৈতিক পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি আমাকে যেভাবে সাজাতে চাইবে আমি সেভাবে সাজবো না।
- কেউ পণ্য হিসেবে আমাকে ব্যবহার করতে চাইলেও অমি সেভাবে ব্যবহৃত হবো না।

নারী স্বাধীনতার ইতিবৃত্ত

- ব্যবিলনীয় সভ্যতা যে কয়েকটি কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হলো, নারী-পুরুষের অবৈধ যৌন-উদ্দামতার অবাধ ও যথেচ্ছ প্রসার। বিশেষ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না, ইউরোপ, আমেরিকা এবং বাংলাদেশ আজ ব্যবিলনের মতোই জাতিতে পরিণত হয়েছে। এটা শুধু নিন্দার কথা নয়, ভয় ও দুঃখের কথা।

- আশঙ্কা হয়, আসমান থেকে অবতীর্ণ বা জমীন থেকে উত্থিত কোনো গযবের আবশ্যকতা নেই, শুধু অবাধ যৌনাচার ও নারী-স্বাধীনতার নামে নারীকে পথে বসানোর এই পাপেই আমরা হয়তো অনতিবিলম্বে মুখ থুবড়ে পড়বো। কারণ ব্যভিচারের চেয়ে কুৎসিত ও কদর্য কোনো পাপ নেই; আর নারী-স্বাধীনতার কুহকে নারীকে পণ্য করে বেচা-কেনা করার চেয়ে জঘন্য কোনো ব্যবসাও নেই। অতএব এমন অকথ্য পাপ নিয়ে যারা নির্ভয়ে খেলা

করে, এমন অকথ্য পাপ যাদের জীবনদর্শন, তাদের উপর আল্লাহর লানত যে শীঘ্রই অবতরণ করবে, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

নারীর অধিকার সম্বর্কে ভুল ধারণা দূর হওয়া প্রয়োজন

বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে নারী আন্দোলন চলছে। কিন্তু নারীদের আসল পরিচয় ও সঠিক মর্যাদা সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা কী বলেছেন তা নারীরা ভালভাবে জানেন না। আলাহ শেষ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর মাধ্যমে নারীদের যে মর্যাদা প্রদান করেছেন তা না জানার কারণে নতুন করে অধিকার আদায়ের আন্দোলন করতে হচ্ছে। নারীদের নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে জানতে হলে কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।

পাঠক, আপনি/আমি যদি একজন অভিভাবক হই, আমরা কি ইসলামে নারীর অধিকার সম্পর্কে অবগত? আমরা যদি অবগত না হই, তাহলে আমাদের সন্তান কিভাবে জানবে? আমাদের অজ্ঞতার অন্যতম একটা কারণ ইসলাম হতে আমরা দূরে সরে যাচ্ছি।

ইসলাম নারীদের জন্য যেসব বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে, তা তাদের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়ার জন্য করেনি, বরং তারা যাতে কোন প্রকার অন্যায় ও অশ্লীল কাজে জড়িয়ে না পড়ে, নিরাপত্তাহীনতায় না ভুগে, সেজন্যই তাদের উপর এ সব বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে যা মেনে চললে তাদের জন্য অফুরন্ত পুরষ্কারের প্রতিশ্রুতি আল্লাহ দিয়েছেন। আর এটিই হল নারীদের জন্য সত্যিকার সম্মান ও মর্যাদা।

উসামা ইবনে যায়েদ (রাদিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুলাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমার পর পুরুষদের জন্য নারীদের ফিতনার চেয়ে মারাত্মক ও ক্ষতিকর আর কোন ফিতনা (অরাজকতা) আমি রেখে যাইনি। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

আলাহর বিধান হলো যতক্ষণ না মানুষ নিজের মধ্যে পরিবর্তনের সূচনা করবে এবং পরিবর্তনকে কাজে পরিণত করার চেষ্টা চালাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে কোন পরিবর্তন আসবে না।

"আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।" (সূরা রাদ ১৩ ঃ ১১)

আল্লাহ তা'আলা নারীদের জন্য যেসব বিধি-বিধান দিয়েছেন, তা সবই নারীদের নিরাপত্তা ও তাদের মান সম্মানের হিফাযত করার জন্যই দিয়েছেন। ইসলামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে নারীদের প্রকৃত কল্যাণ। একমাত্র ইসলামই নিশ্চিত করছে নারীদের নিরাপত্তা এবং গ্যারান্টি দিয়েছে তাদের মান মর্যাদা রক্ষার।

পাঠক, আপনি/আমি যদি ইসলামে নারী অধিকার নিয়ে না জেনে থাকি, তাহলে এ বিষয়ে জানার চেষ্টা করি। নিজে জানি ও পরিবারকে জানাই।

ইসলামে নারীর অধিকার

ইসলাম নারী-পুরুষের সমতায় বিশ্বাস করে। এখানে সমতা মানে অভিন্নতা নয়। ইসলামে নর-নারীর ভূমিকা সম্পূরক, বৈপরীত্যের নয়; সম্পর্ক অংশীদারীত্বের, বিরোধিতার নয়, যা শ্রেষ্ঠত্বের সংগ্রামে লিপ্ত করে। ইসলামই সর্বপ্রথম নারীদেরকে নিম্নের ছয়টি বিষয়ে অধিকার নিশ্চিত করেছে।

ক) আত্মিক অধিকার
খ) অর্থনৈতিক অধিকার
গ) সামাজিক অধিকার
ঘ) শিক্ষার অধিকার
ঙ) আইনগত অধিকার
চ) রাজনৈতিক অধিকার

বাংগালি নারীরা অযথাই ভয় পান

বাংলাদেশের মুসলিম নারীরা অযথাই ভয়ে অস্থির যে বাংলাদেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে নারীদের অবস্থা শেষ! তাদেরকে ঘরে বন্দি করে ফেলা হবে! তাদের সকল স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হবে! দেশ ১৪শত বছর পিছিয়ে যাবে! দেশ আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগে ফিরে যাবে! নারী শিক্ষা বন্ধ করে দিবে! হুজুররা নারীদেরকে রাস্তা-ঘাটে যেখানেই পাবে সেখানেই আপত্তি জানাবে ইত্যাদি ইত্যাদি আজগুবি সব চিন্তাভাবনা। এদের প্রতি প্রশ্ন ১৪শত বছর আগে নারীর যে ভয়াবহ দূরঅবস্থা ছিল কে তা পরিবর্তন করে নারীকে সকল অধিকার ফিরিয়ে দিল? কে নারী সুমহান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলো? এটা কি আমেরিকা, ইউরোপ বা অন্য কোন উন্নত পশ্চিমা সভ্যতা নাকি ইসলাম?

ইসলামের দৃষ্টিতে হিজাব বাজায় রেখে নারীরা সকল বৈধ কাজকর্মই করতে পারবেন। ইসলামী পূর্ণজাগরণের অন্যতম প্রতীক হলো হিজাব। এটা সলাত বা হজ্জের মতো একটা প্রকাশ্য ইবাদত। মুসলিমপ্রধান দেশগুলোতে সব ধরণের কাজ (যেমন চিকিৎসক, প্রকৌশলী, পাইলট, পুলিশ) হিজাব পরিহিত মহিলারা সাফল্যের সাথে করছেন। আরব আমিরাতের অর্থমন্ত্রী শেখ লুবনা এর ভালো উদাহরণ, তিনি গত চার বছর ধরে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে সফল অর্থমন্ত্রী।

নারীর হিজাব সম্পর্কে একটু জানা যাক

হিজাব বা পর্দার উদ্দেশ্য হলো নারীকে পুরুষের অনাকাংখিত দৃষ্টি থেকে নিরাপদ রাখা। এ কারণেই কুরআনে যুবতীদের চেয়ে বৃদ্ধাদের পর্দার গুরুত্ব কম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ বৃদ্ধাদের প্রতি কারো আকর্ষণ থাকে না বরং তাদের প্রতি মা, দাদী ও নানীদের মতো শ্রদ্ধাবোধ এমনিতেই এসে যায়।

নারীদের চেহারা, সৌন্দর্য্য ও ভাবভঙ্গির মতো তাদের কণ্ঠস্বরও পুরুষদেরকে আকর্ষণ করতে পারে। তাই কোনো পরপুরুষের সাথে কথা বলতে বাধ্য হলে নারীদেরকে অনাকর্ষণীয় স্বরে কথা বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেন কণ্ঠস্বর শুনে কোনো পুরুষ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হতে না পারে।

"যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করে থাক তা হলে কোমল আওয়াজে কথা বলো না, যাতে রোগগ্রস্ত অন্তরের মানুষ লোভে পড়ে যায়; বরং সোজাসুজি ও স্পষ্টভাবে কথা বল।" (সূরা আহযাব ঃ ৩২)

বোনেরা ভাববেন না আল্লাহ শুধু মেয়েদের পর্দার কথা বলেছেন। বরং কুরআনে মেয়েদের আগে পুরুষদের পর্দা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (দেখুন সূরা নূর আয়াত ৩০-৩১) এর কারণ হলো, কোনো নারীকে দেখে যেমন কোনো পুরুষ আকৃষ্ট হয়ে কুচিন্তা করতে পারে তেমনি কোনো নারীও কোনো পুরুষকে দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কুচিন্তা করতে পারে।

একজন পুরুষের জন্য কোনো পরনারীকে আগ্রহ ভরে দেখা যেমন পাপ তেমনি একজন নারীর জন্য আগ্রহ ভরে পরপুরুষকে দেখাও পাপ। তাই পর্দার মধ্যে থেকেও পরপুরুষকে আগ্রহ নিয়ে দেখলে পর্দাহীনতার গুনাহ হয়ে যাবে। একজন মহিলার জন্য একজন পরপুরুষের সামনে বেপর্দা হওয়া যেমন পাপ, নিকটাত্মীয় গায়ের মুহরিমের সামনেও বেপর্দা হওয়া তেমনি পাপ।

যেমন আজকাল আমাদের দেশে দেবর, ভাশুর, ভগ্নিপতি, খালাতো, চাচাতো, মামাতো ও ফুফাতো ভাইদের সামনে মেয়েরা বেপর্দা হওয়াকে পাপ মনে করে না। প্রকৃতপক্ষে, তারা প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদের সাথে আরও বেশি পর্দা করা উচিত। কারণ এ ধরনের নিকটাত্মীয় গায়ের মুহরিমদের দ্বারা আরও বেশি বিপর্যয়ের আশঙ্কা রয়েছে।

আমাদের সমাজে কতিপয় পর্দানশীন পরিবারেও পর্দার মূল লক্ষ্য অনুধাবন করতে না পেরে পর্দার কার্যক্রমে উল্টাপাল্টা করে ফেলেন। অনেক পরিবারের মহিলারা নিজেরা বোরকা পরে পর্দা করে বের হন অথচ তাদের যুবতী মেয়েরা তাদেরই সাথে আকর্ষণীয় পোশাকে বেপর্দা হয়ে বের হয়। অনেকের ভুল ধারণা এমন যে, বয়স হলেই শুধু পর্দা করতে হয়। যেমন ঃ পুরুষদের মধ্যে ভুল ধারণা আছে যে বয়স হলে, চাকুরি থেকে অবসর নেবার পর দাড়ি রাখতে হয়, যুবক বয়সে দাড়ি রাখার প্রয়োজন নেই। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।

সৌন্দর্য প্রদর্শন ও পর্দাহীনতার ক্ষতি

সৌন্দর্য প্রদর্শন ও পর্দাহীনতা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নাফরমানি ও আল্লাহর রসূল ﷺ -এর অবাধ্যতা। এই অবাধ্যতা নিজেদেরই ক্ষতি।

"আমার সব উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে যারা অস্বীকার করে তারা ছাড়া। সাহাবী (রা.) এ কথা শুনে বলল, হে আল্লাহর রসূল! যারা অস্বীকার করে তারা কারা? রসূল ﷺ বললেন, যে আমার অনুকরণ করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল, আর যে আমার নাফরমানি করল, সে অস্বীকার করল"। [সহীহ বুখারী]

আল্লাহ বলেন ঃ *নিশ্চয় যারা এটা পছন্দ করে যে, মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। (সূরা নূর ঃ ১৯)*

ইবলিস শয়তান বনী আদমের চির শত্রু। পৃথিবীর শুরু থেকেই শয়তান মানুষকে বিপদে ফেলে আসছে। হাদীসে রয়েছে ঃ

১. রসূল ﷺ বলেছেন, আমি আমার পর পুরুষদের জন্য নারীদের ফিতনার চেয়ে বড় ক্ষতিকর কোন ফিতনা রেখে যাইনি। [সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

২. রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা দুনিয়াকে ভয় কর এবং নারীকে ভয় কর, কারণ বনী ইসরাইলের প্রথম ফিতনা ছিল নারীর ফিতনা"। [সহীহ মুসলিম]

৩. রসূল ﷺ উম্মতকে কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করতে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। (সহীহ বুখারী) বিশেষ করে নারীর ক্ষেত্রে তিনি উম্মতে মুসলিমাহকে অধিক সতর্ক করেছেন। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয়, বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম নারী ও পুরুষ রসূল ﷺ -এর আদেশের বিরোধিতা করছেন। রসূল ﷺ উম্মতকে যে ভবিষ্যৎ বাণী করে গেছেন, তার প্রতিফলনই আমরা আজ লক্ষ্য করছি।

আল্লাহ বলেন ঃ *আর যে রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য হিদায়াত প্রকাশ পাওয়ার পর এবং মু'মিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে ফেরাব যেদিকে সে ফিরে এবং তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে। আর আবাস হিসেবে তা খুবই মন্দ। (সূরা নিসা ঃ ১১৫)*

হিদায়াতের পথ স্পষ্ট হওয়ার পরও যদি কেউ গোমরাহির পথ অবলম্বন করে, এবং মু'মিনদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন কঠিন আযাব রেখেছেন, তাদের কঠিন শাস্তি দেবেন। আর আখিরাতের শাস্তি কত কঠিন হবে তা বর্ণনা দিয়ে বোঝানো যাবে না।

রূপ-সৌন্দর্য নারীর মহামূল্যবান সম্পদ

আমাদের কাছে যখন কোন দামী সম্পদ, স্বর্ণালংকার ইত্যাদি থাকে তা আমরা লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রাখি, লকারে রাখি বা ব্যাংকে রাখি যাতে কেউ চুরি-ডাকাতি করে নিয়ে যেতে না পারে। এই সম্পদ দেখে কারো লোভও হতে পারে, হিংসাও জাগতে পারে। ঠিক তেমনি নারীর মহামূল্যবান রূপ-সৌন্দর্য আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন তাকে আমানত স্বরূপ। এই রূপ আল্লাহ তা'আলা চাইলে যেকোন সময় আবার ফেরতও নিয়ে নিতে পারেন। তাই মহান আল্লাহর দেয়া এই রূপ-সম্পদ নারীর উচিত পরপুরুষ থেকে লুকিয়ে রাখা, ঢেকে রাখা, আড়াল করে রাখা, আর এতেই রয়েছে তার প্রকৃত কল্যাণ। এতে সে দুই দিক দিয়ে লাভবান হচ্ছে – এক, আল্লাহর হুকুম পালন করছে আর অন্যদিকে তার মহামূল্যবান সম্পদ পরপুরুষের কু-দৃষ্টি হতে রক্ষা পাচ্ছে। আসলে নারীর রূপ-

সৌন্দর্য্য শুধু তার স্বামীর জন্য। এই রূপ অন্য কাউকে প্রদর্শন করলে অকল্যাণ ছাড়া জীবনে আর কোন কিছুই আসে না।

পুরুষদের পর্দা

আজকালকার ছেলেরা শুধুমাত্র মেয়েদেরকে দেখাবার জন্য শরীর বানায়। জীমে যায়। সিক্স প্যাক বানাবার জন্য প্রচুর সাধনা করে। আরো একটু বড় বাইসেপের জন্য প্রতিদিন জীমে যায় এবং ঘন্টার পর ঘন্টা পরিশ্রম করে। পোশাকের দিক থেকেও পুরুষরা অনেক অশালীন হচ্ছে। যাদের শরীর আছে, তারা শরীর দেখাবার জন্য পাতলা পোশাক পড়ছে, সিক্স প্যাক যাদের আছে, তারা তাদের অর্ধ নগ্ন ছবি দিয়ে অনলাইনে ছবি পোষ্ট করছে। ফ্যাশন ম্যাগাজিনের কাভারে জায়গা পাবার জন্য অনেক চেষ্টা করছে। এই মুসলিম ছেলেরা জীমে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় কাটায় কিন্তু মসজিদে যায় না। লাইব্রেরিতে যায় না। মেধাহীন একটা মুসলিম জাতি গড়ে উঠছে।

বাড়ীর ভেতরে পর্দার নিয়ম

বাড়ীর ভেতরে মহিলাদের কর্মব্যস্ত থাকাকালে সব সময় সতর ঢেকে রাখা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই বাড়ীর ভিতরে পুরুষদের অবাধ যাতায়াত থাকা উচিত নয়। সেখানে মেয়েরা যাতে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে এর পূর্ণ সুযোগ থাকতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর ছোট্ট সংসারে পর্দার সমস্যা নেই। কিন্তু একান্নবর্তী বা যৌথ পরিবারে এটা একটি বড় সমস্যা। নিকটাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও যেসব পুরুষের সাথে দেখা দেয়া শরীয়তে নিষেধ তাদের অন্দর মহলে যেতে দেয়া মোটেই উচিত নয়। শুধুমাত্র নিচের ১২জন অন্দর মহলে যেতে পারবে ঃ

১) স্বামী ২) বাবা ৩) স্বামীর বাবা ৪) নিজের ছেলে ৫) স্বামীর ছেলে ৬) ভাই ৭) ভাইয়ের ছেলে ৮) বোনের ছেলে ৯) নিজের মেলামেশার মেয়েরা ১০) নিজের খরিদকৃত গোলাম (এযুগে প্রযোজ্য নয়) ১১) অতি বৃদ্ধ এবং ১২) এমন শিশুরা যারা মেয়েদের গোপন বিষয় সম্পর্কে এখনো অজ্ঞ। (সূরা নূর ঃ ৩০-৩১)

মেয়েদের এটুকু সচেতন থাকা দরকার যে তাদের শরীরের কোন অংশ খোলা থাকা অবস্থায় এবং ভালভাবে না ঢেকে স্বামী ছাড়া আর কারো সামনে যাওয়া শালীনতার বিরোধী। যেমন ঃ দেবর এবং ভাসুরের সামনে, দুলাভাইয়ের সামনে,

নিজ কাজিনদের সামনে, গৃহ শিক্ষকের সামনে, ড্রাইভার-দারোয়ান-চাকরের সামনে, মাছ-তরকারীওয়ালাদের সামনে।

কর্মক্ষেত্রে পর্দার সুবিধা

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষের দায়িত্ব হলো সংসারের সকল খরচ বহন করা। অর্থাৎ পরিবারের ভরণপোষণের সমস্ত দায়দায়িত্ব স্বামীর (সহীহ বুখারী)। স্ত্রী চাকুরী করতে বাধ্য না বা স্ত্রীকে আয়-রোজগার করার জন্য স্বামী বলতেও পারবেন না। হ্যাঁ, যদি স্ত্রী চাকুরী করার কারণে সংসারে অতিরিক্ত কিছু আসে তাহলে তা আলহামদুলিল্লাহ, তবে স্ত্রী অবশ্যই ১০০% পর্দার মধ্যে থেকে আয়-রোজগার করবেন। তবে অতিরিক্ত আয় করতে গিয়ে যদি স্ত্রীকে সামান্যতম বেপর্দা হতে হয় বা ঠিক মতো পর্দা করা সম্ভব না হয় তাহলে তার দায়-দায়িত্ব নিজের আমলনামা ছাড়াও স্বামীর আমলনামায় এসে পড়বে। অর্থাৎ এই কবীরা গুনাহর জন্য এবং ফরয হুকুম অমান্য করার জন্য আল্লাহর কাছে দু'জনকেই কঠিন জবাবদিহি করতে হবে।

তাই কর্মজীবী মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে পুরুষ কলিগ, কো-ওয়ার্কার, বস, কোম্পানির মালিক এবং অন্যান্য পুরুষদের সামনে অবশ্যই পর্দা করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে লাঞ্চের সময় দেখা যায় সবাই মিলে একসাথে আড্ডা দেয়া বা সময় কাটানো হয় কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সীমালংঘন করা যাবে না। পুরুষ-মহিলার অবাধ মেলামেশা (ফ্রী-মিক্সিং) করা যাবে না, এদের মাঝে সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। যদি চাকুরী করার স্বার্থে কর্মক্ষেত্রে পর্দা করা সম্ভব না হয় তাহলে আখিরাতের ময়দানে কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। কারণ পাঁচ ওয়াক্ত সলাত যেমন ফরয তেমনি পর্দা করাও ফরয। মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে যার যার হিসাব তাকেই দিতে হবে।

বাংলাদেশের গার্মেটস শিল্পের ৮০%ই নারী শ্রমিক। আলহামদুলিল্লাহ! এই সম্মানিত বোনদের পরিশ্রমেই বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার একটি বিশাল অংশ রিজার্ভ ফান্ডে এসে থাকে। এদের কারণে আজ উন্নত বিশ্বে বাংলাদেশের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। তবে অতি দুঃখের বিষয় যে এই শ্রমিকদের ঘামের টাকায় মালিকরা মুনাফা অর্জন করেন কিন্তু তাদেরকে খুবই কম মুজরী দিয়ে থাকেন, তাদের নিরাপত্তা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেন না বললেই চলে। কোন দুর্ঘটনা ঘটলে শত শত শ্রমিক মারা যান। তাদের দায় দায়িত্ব মালিকরা নেন না। সরকারও উপযুক্ত ক্ষতিপুরণ দেন না।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে এই বোনেরা পাবেন তাদের শ্রমের সঠিক মর্যাদা, ইনশাআল্লাহ। তাদের নিরাপত্তা, শ্রম অধিকার, নির্যাতনবিরোধী আইন হলে তাদের সকল বিষয়ে সমঅধিকার নিশ্চিত হবে। এরপর ধর্মীয় অধিকার (রিলিজিয়াস রাইটস) নিশ্চিত করতে হবে যেমন মহিলা সেকশন ও পুরুষ সেকশন আলাদা হবে। হয়তো কোন ফ্যাক্টরীর বেশীরভাগ অংশই হবে মহিলা সেকশন। আলাদা মহিলা সেকশন হলে বোনদের নিজেদের মধ্যে পর্দা করতে হবে না। এতে অমুসলিম মহিলারাও সম্মানের সাথে শান্তিতে থাকবেন, পুরুষ সহকর্মীরা তাদের উত্যক্ত করার সুযোগও পাবে না, কাজের ফাঁকে ফাঁকে পরপুরুষরা তাদের সাথে আজেবাজে গল্প করার সুযোগও পাবে না। মুসলিমরা ওয়াক্তমত নামায পড়তে পারবেন। রমাদান মাসে সময় নিয়ে ইফতার করতে পারবেন। এতে কর্মক্ষেত্রে শান্তি বিরাজ করবে এবং রহমতের ফিরিশতারা তাদেরকে পাহারা দিবেন। আশা করা যায় তারা আখিরাত এবং এই দুনিয়া দুই দিকেই সাফল্য অর্জন করবেন।

মহিলাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ

মহিলাদের জান্নাতে যাওয়া খুবই সহজ তা রসূল ﷺ মহিলাদের গ্যারান্টি দিয়েছেন। জান্নাতে যাওয়ার জন্য মহিলাদের শুধু চারটি কাজ করতে হবে। (আবু দাউদ)

১) পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করতে হবে।
২) রমাদান মাসে রোযা রাখতে হবে।
৩) স্বামীর আনুগত্য করতে হবে।
৪) পর্দা করে চলতে হবে।

ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমাদের সবচেয়ে বড় ভুল ধারণা এই যে, তারা ভাবে ইসলামে জান্নাত শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য, নারীদের জন্য নয়। এ ভুল ধারণা সূরা নিসার ১২৪ নম্বর আয়াত এর দ্বারা দূর করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন, *"পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেউ সৎকাজ করলে ও মু'মিন হলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সামান্যতম অবিচারও তাদের প্রতি করা হবে না।"*

একই রূপ বর্ণনায় সূরা আন নাহলে ৯৭ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, *"মু'মিন হয়ে পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে যে সৎকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করবো এবং তাদিগকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরষ্কার দান করবো।"*

শেষ পরিচ্ছেদ

কুসংস্কার

দ্বীনের সঠিক জ্ঞানের অভাব

- দুঃখের বিষয়, আমরা বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ এটাই জানিনা যে দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে আমরা জানি না। পাক-ভারত-বাংলাদেশের অনেক মানুষই দ্বীন ইসলামের সওয়াবের কাজ মনে করে অনেক সময় খুব বেশী বেশী শিরক ও বিদ'আতি কাজ নিয়মিত করে যাচ্ছি। আমরা কুরআন থেকে নিজেদেরকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখে নিজেদের মনগড়া ইসলাম পালন করে যাচ্ছি। আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই পাওয়া যাবে যিনি জীবনে একবার সম্পূর্ণ কুরআনটা অর্থ বুঝে ব্যাখ্যাসহ পড়েছে, সহীহ হাদীসগ্রন্থগুলো পড়েছে। আল্লাহ বলেছেন, কুরআন মানুষের জন্যে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান (complete code of conduct for life) অর্থাৎ আমাদের জীবন পরিচালনার গাইডলাইন।

- আফসোস, সারা জীবন শুধু কুরআন তিলাওয়াতই করে গেলাম কিন্তু কিছুই বুঝলাম না! আর যদি কুরআন নাই বুঝি তাহলে আল্লাহর দেয়া জীবন পরিচালনা করব কিভাবে?

- আমাদের সকলের মধ্যে একটা ভুল ধারণা সবসময় কাজ করে যে, যারা কুরআন-হাদীস নিয়ে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছেন শুধু তারাই ইসলাম চর্চা করবেন এবং এই বিষয়টা শুধু তাদের জন্যই। আমরা যদি উন্নত বিশ্বের দিকে তাকাই তাহলে দেখা যায় যে, হাজার হাজার ইসলামিক স্কলার ইউরোপ, আমেরিকা, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকায় দ্বীন ইসলামের কাজ

করে যাচ্ছেন যাদের মাদ্রাসার কোন ড্রিগ্রি নাই অথচ তারা একেক জন বিভিন্ন বিষয়ের উপর ডক্টরেট। এদের আহ্বানে হাজার হাজার নন-মুসলিম ইসলাম গ্রহণ করছেন।

- রসূল ﷺ বলেছেন ঃ দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেকটি মুসলিম নরনারীর জন্য ফরয (ইবনে মাজাহ ও বাইহাকী)। ঈমানের অন্যতম দাবী হলো দ্বীনের জ্ঞানার্জন করা। আমার যদি নূন্যতম জ্ঞানই না থাকে তাহলে কিভাবে নিজ পরিবারকে দ্বীনের আলোকে গাইড করবো? কিভাবে সন্ত ানদের অন্তরকে সামান্য হলেও দ্বীনের আলোয় আলোকিত করবো? যুগ পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমার ভাসাভাসা আর আবোলতাবোল দ্বীনি জ্ঞান দিয়ে উঠতি বয়সের সন্তানদের আর বুঝ দেয়া যাবে না। তারা এখন লজিক চায়, তারা দ্বীনের ইনটেলেকচুয়াল ব্যাখ্যা চায়। আমরা নিজেরাই যদি আমাদের দ্বীন সম্পর্কে যথেষ্ট না জানি, আমাদের সন্তানদের কিভাবে আমরা দ্বীনের জ্ঞান দেবো?

ভুল ইসলাম চর্চার প্রভাব

- ইবলিস শয়তানের পলিসি হচ্ছে মুসলিমদেরকে কুরআনের সঠিক শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা, কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা বুঝতে না দেয়া। কারণ আমি যদি কুরআন বুঝে সেই অনুযায়ী আমার জীবন পরিচালনা করতে থাকি তাহলে সেখানেই ইবলিস শয়তানের ব্যর্থতা।

- তাই শয়তান সুকৌশলে মানুষকে বোকা বানানোর জন্য বেছে নিয়েছে কুরআনকেই কিন্তু ভিন্ন উপায়ে। যেমন ঃ খুব সহজে কিভাবে কিছু দু'আ-দুরূদ পড়ে জান্নাত লাভ করা যাবে, কোন্ দু'আ কত হাজার বার পড়লে কী হবে, কোন্ আয়াত জাফরান দিয়ে লিখে পেটে বেঁধে রাখলে বাচ্চা হবে, কোন্ দু'আ পড়ে চাল পড়া দিয়ে চোর ধরা যাবে, কোন্ আয়াত লিখে বালিশের নিচে রেখে ঘুমালে প্রেমিকাকে পাওয়া যাবে, কোন্ দুরূদ কাগজে লিখে পানিতে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খেলে রোগ মুক্তি হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ধরনের আমলের কোন সহীহ দলিল কুরআন বা সহীহ হাদীসে নেই। বাজারে এই ধরনের অনেক বই-ই পাওয়া যায়, যেমন ঃ মক্বছুদুল মোমিনীন, বেহেশতের পথ, নেয়ামুল কুরআন, আমলে নাজাত, আমালে কুরআন, সোলেমানী খাবনামা, নূরানী মজমুয়ায়ে পাঞ্জেগানা অজিফা, ফাজায়েলে আমল, বেহেশতী জেওর ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই এই ধরনের ভিত্তিহীন বই-

পত্র, অজিফা এবং মানুষের বানানো দুরূদ হতে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

- ইবলিস শয়তান আমাদের সহজে অনেক সওয়াব অর্জন করা যায় এমন আমলের লোভ দেখায়, জান্নাতে যাওয়ার শর্টকাট রাস্তা দেখায়। সে বলে এই দু'আ ৪০ বার পড়লে ৮০ বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, ঐ দুরূদ এতোবার পড়লে ১ লক্ষ ফিরিশতা কিয়ামত পর্যন্ত দু'আ করতে থাকে। এ কথা শুনে আমরা বলি 'সুবহানাল্লাহ', এর ফযিলত এতো!

- এসব সহজে অর্জিত ফযিলতের মিথ্যা আশ্বাসের কারণে গুনাহের প্রতি মানুষের ভয় কমে যাচ্ছে, ফলে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে। তখন মানুষ মনে করে ২-৫ টা গুনাহ করলে কী আর ক্ষতি হবে? অমুক দু'আ পড়লে তো ৮০ বছরের গুনাহ মাফ হয়েই যাবে। এভাবে শয়তান অসচেতন লোকদেরকে তথাকথিত সহজ আমলের মাধ্যমে অর্জিত অফুরন্ত সওয়াবের লোভ দেখিয়ে ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

- মনে রাখতে হবে, আমি আমার জীবনে ইবাদত মনে করে যা কিছু করবো তা কুরআন অথবা সহীহ হাদীসে অবশ্যই থাকতে হবে। কেউ যদি আমাকে কোন স্পেশাল দু'আ-দুরূদ বা কোন মহাপূণ্যের আমলও শিখিয়ে দেয় তাহলে অবশ্যই তার authentic দলিল চাইতে হবে অথবা আমি নিজে কুরআন ও সহীহ হাদীস ঘেঁটে তা অবশ্যই যাচাই করে নেবো। বাজারে দু'আ-দুরূদ এর যেসব বইপত্র পাওয়া যায় তার মধ্যে বেশীর ভাগই সহি (authentic) নয় অর্থাৎ কুরআন-হাদীস দ্বারা সমর্থিত নয়।

ভুলে ভরা তথাকথিত ইসলামী সাহিত্যের প্রভাব

- ভুল শিক্ষা, বানোয়াট গল্প কাহিনী মানুষকে সহজেই পথভ্রষ্ট করে। ইসলামের উপর বাজারে অনেক বই-ই পাওয়া যায় যাতে মানুষের মধ্যে আবেগ (জজ্‌বা) সৃষ্টির জন্য এমন সব কথা তুলে ধরা হয়েছে যা সত্য নয়, যা কুরআন-হাদীসের আলোকে গ্রহণযোগ্য নয়।

- কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে কোন ইসলাম নেই। কারামত ও সাজানো মজাদার গল্প-কাহিনী মানুষকে বিমোহিত করে ঠিকই কিন্তু তাতে অনেক সময় সমূহ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেহেতু ইসলাম-বিরোধী শক্তি মুসলিমগণকে কুরআন ও হাদীস দিয়েই ঘায়েল করার জন্য কুরআনের ভুল

ব্যাখ্যা ও অসংখ্য মিথ্যা হাদীস ও গল্প বেশী ফায়েদার লালসা দেখিয়ে মুসলিম সমাজে ঢুকিয়ে দিয়েছে সেহেতু আমাদের প্রত্যেকের আরো বেশী সচেতন হওয়া উচিৎ। বিশেষ করে আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.), মঈনুদ্দিন চিশতী (রহ.), ইমাম গাজ্জালী (রহ.), রূমী (রহ.), বায়েজীদ বোস্তামী (রহ.), শাহজালাল (রহ.), শাহপরাণ (রহ.) প্রমুখ ব্যক্তিদের নামে বাজারে নানা রকম কারামত সম্বলিত গল্পের বই পাওয়া যায় যা সত্য নয় এবং তাঁদের সঠিক জীবনীর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। আর এই ধরনের বানানো গল্প কিচ্ছা-কাহিনী বিশ্বাস করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। ['কারামত' কথাটা ফার্সি যার অর্থ অলৌকিকতা, অসাধারণ শক্তি।]

- আমাদের ঘরে এই ধরনের বইপত্রই কি পড়া হয়? যদি হয়ে থাকে, এগুলি দ্রুত বাতিল করি। আমরা যারাও বা ইসলামের পথে আসতে চাই, তারা এগুলি পড়ার মাধ্যমে প্রকৃত ইসলাম হতে দূরে সরে যাচ্ছি।

- বাংলাদেশে ইসলামকে সহজ ভাষায় উপস্থাপন না করে এটাকে ভিনদেশী কায়দায় বিকশিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। মাওলানারা তাদের বয়ানে ঘনঘন উচ্চারণ করেন আরবি-ফার্সি ও উর্দু শব্দ, ভাষা ও কবিতা যা আমাদের সাধারণ লোকেরা বুঝেন না, এসব বলে তারা পান্ডিত্য জাহির করেন, শ্রোতারা চমৎকৃত হয়। যেহেতু কুরআনের ভাষা আরবী ও এদেশের মানুষের ভাষা বাংলা, তাই আরবী ও বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় ইসলাম প্রচার বাংলাদেশে গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। এর একমাত্র ব্যতিক্রম হতে পারে ইংরেজী যা আজকাল অনেক শিশুর মাতৃভাষায় পরিণত হয়েছে।

আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট সাহায্য চাওয়া

- একটা কথা সব সময় স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে মহান আল্লাহ ছাড়া কারো কিছু করার বা দেয়ার ক্ষমতা নেই, তার জীবনকালে তিনি যতো বড় ওলি বা বুজুর্গই হোক না কেন। আমার ভাগ্যের পরিবর্তন, যেমন ঃ ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী, প্রোমোশন, সন্তান-সন্ততি, বাড়ি-গাড়ি, রোগ-মুক্তি, আয়-উন্নতি, ব্যাংক ব্যাল্যান্স, ফসলের উন্নতি, পরীক্ষায় ভাল রিজাল্টস, স্বামী-স্ত্রীর মিল, বিদেশ গমন ইত্যাদি কোন পীর-মুর্শিদ বা কোন মাজার দিতে পারবে না। আর আমি যদি গায়রুল্লাহর (আল্লাহ বাদে অন্যকেউ) কাছে কোন কিছু পাওয়ার আশায় কোথাও যাই তাহলে সেটা হবে সরাসরি আল্লাহর সাথে শিরক।

- আমার যা কিছু চাওয়ার সরাসরি আল্লাহর কাছে চাইব এবং ইন্‌শাআল্লাহ, আমার জন্য যা সবচেয়ে উত্তম ও কল্যাণকর, সেটাই আল্লাহ আমাকে দেবেন। এখানেই খাঁটি ঈমানের পরীক্ষা।

দেয়ালে ছবি টাঙানো এবং শোকেসে মূর্তি রাখা

- আমরা অনেকে ঘরের দেয়ালে নানা রকম ছবি ফ্রেমে বাঁধাই করে ঝুলিয়ে রাখি। যেমন ঃ বিয়ের ছবি, নিজ পিতা-মাতার ছবি, পারিবারিক ছবি, রবীন্দ্র-নজরুল, নেতা-নেত্রীর ছবি, পীরের ছবি, বিভিন্ন স্টারদের ছবি বা পশু-পাখির ছবি ইত্যাদি। আবার অনেকে আর্ট-কালচারের নামে শোপীস হিসাবে ঘরে নানা রকম মূর্তিও রাখে। মনে রাখতে হবে ঘরে যে কোন ধরনের মূর্তি এবং কোন প্রাণীর ছবিই রাখা নিষেধ/হারাম। যে ঘরে ছবি এবং মূর্তি থাকে সে ঘরে রহমতের ফিরিশতা প্রবেশ করে না। আমি কি চাই না যে আমার ঘরে রহমতের ফিরিশতা প্রবেশ করুক?

- রাস্তার মোড়ে মোড়ে মূর্তি তৈরী করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে মূর্তি তৈরী করা, বিনা প্রয়োজননে ছবি তোলা বা ভিডিও করা ইত্যাদিও বড় গুনাহ।

- যে দেশে মুসলিমদের ঘরে ঘরে শিরক হচ্ছে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে শিরক হচ্ছে সেখানে অশান্তি ছাড়া আল্লাহর রহমত তো থাকার কথা না। এসবের প্রত্যক্ষ প্রভাবে সন্তানরা ইসলাম থেকে এমনিতেই দূরে সরে যাবে।

গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান

যদিও আজকাল কিছু মুসলিম পরিবার গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান ত্যাগ করছে কিন্তু তারপরেও অনেক মুসলিম পরিবার এখনো গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান পালন করে আসছে। যারা পালন করে আসছে তারা দিন দিন এই অনুষ্ঠানের বাজেট বৃদ্ধি করছে এবং অনুষ্ঠানে আরো নতুন নতুন অনৈসলামী কার্যকলাপ সংযোজন করছে। ইদানীংকালের কিছু মুসলিম পরিবারের গায়ে হলুদের চিত্র তুলে ধরছি। দেখা যাচ্ছে যে, যার গায়ে হলুদ তার ছোট ভাই-বোনেরা, কাজিনরা বাসার ছাদে গভীর রাত পর্যন্ত নাচ-গানের অনুষ্ঠান করছে বন্ধুদের নিয়ে। উচ্চ ভলিউমে গভীর রাত পর্যন্ত গান বাজে। অশালীন ভাষার গানও পরিবেশিত হয়। এমন কি ঐ পরিবারে হয়তো কেউ মদ/বিয়ার পান করে না কিন্তু বড় ভাই/বোনের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে ছোট ভাই-বোনেরা সামান্য একটু

মদ/বিয়ার পান করবে এটা একটা আবদারের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন কি, যে পরিবারের ছেলে মেয়েরা সারা বছর তাদের বয় ফ্রেন্ড গার্ল ফ্রেন্ড নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলার অনুমতি পায় না তারাও বড় ভাই/বোনের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে গোপনে বয় ফ্রেন্ড গার্ল ফ্রেন্ডকে আমন্ত্রণ জানায় এবং অনেক রাত পর্যন্ত গান নাচে ডুবে থাকে। ধনী মুসলিম পরিবারের চিত্র আরো খারাপ। তারা professional dancer ভাড়া করে এনে নাচ-গানের অনুষ্ঠান করছে। যাদের বাজেট কম তাদের ক্ষেত্রে যাদের বিয়ে তাদের ছোট ভাই বোনেরা ও তাদের বান্ধবীরা হলুদ অনুষ্ঠানের কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই প্র্যাকটিস করে হলুদের প্রোগ্রামের দিন মিউজিকের সাথে নাচার জন্য। এমনকি যদিও ঐ সকল পরিবারের অনেক মুরুব্বীই হয়তো পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায়কারী। এভাবে মুসলিম পরিবারগুলি দিন দিন ইসলাম থেকে অনেক দুরে সরে যাচ্ছে।

বিয়ের অনুষ্ঠান

এবার একটি মুসলিম পরিবারের বিয়ের অনুষ্ঠানের চিত্র তুলে ধরা যাক। কাজী সাহেব আসলেন। সকলেই খুব ভাব-গাম্ভীর্য সহকারে বিয়ে পড়ার কার্য সম্পাদন করলেন। কাজী দু'হাত তুলে দু'আ শুরু করলেন। সাথে সাথে মহিলারা মাথায় কাপড় দিলেন। নারী পুরুষ সকলেই অনেক দু'আ করলেন। তারপর খেজুর বিতরণ করা হলো সকলের মাঝে। তারপর কাজী সাহেব প্রস্থান করলেন। এরপর বাসার সকলে ঐ সময়ের জনপ্রিয় একটি হিন্দি সিনেমার গানের সাথে নাচলেন। গানটি ছিলো 'হরে রাম হরে রাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম'। পাঠক একবার চিন্তা করে দেখি পরিস্থিতি কতোটা ভয়ংকর পর্যায়ে চলে গেছে!

বিয়ে নিয়ে নানারকম কুসংস্কারে বিশ্বাস করার প্রভাব

- চৈত্র মাসে বিয়ে করা যাবে না এই মাস অশুভ। এই কুসংস্কার হিন্দুদের থেকে এসেছে।
- মহাররম মাসে বিয়ে-শাদী নিষেধ, এই মাস শোকের মাস। এই ধরনের কুসংস্কার শিয়াদের থেকে এসেছে।
- শনিবারে বিয়ে করা যাবে না, শনিবার অশুভ, এই ধরনের বিশ্বাস কুসংস্কার।

- বিয়ের দিন ধান-ঘাস দিয়ে বধুবরণ করা এবং দুধের উপর দিয়ে বরকনে হেটে যাওয়া। মনে রাখবেন এসব হিন্দুদের রীতি।
- বিয়ের কাবিনে এক লক্ষ এক টাকা ধার্য্য করা অর্থাৎ মূল অংকের সাথে এক টাকা সংযুক্ত করতেই হবে এটা মনে করা কুসংস্কার।

কুসংস্কারে বিশ্বাস করা ও শুভ-অশুভ মেনে চলা শিরক

ইসলাম থেকে দুরে সরে যাওয়ার কারণে আমাদের জীবন আজ আল্লাহ ও রসূল ﷺ -এর আদেশ-নিষেধ দিয়ে নয়, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিছু কুসংস্কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আর আমাদের সন্তানরাও জন্মের পর হতে ইসলাম হতে দূরে সরেই থাকছে।

- শনির দশা অর্থাৎ শনিবার অলক্ষুণে দিন এবং এই দিনে কোন কাজ শুরু না করা। ভর দুপুরে কাকের কা কা ডাক শুনে বিপদ সংকেত মনে করা।
- ঘর থেকে বাইরে বের হওয়ার সময় কেউ হাঁচি দিলে সাথে সাথে বের না হওয়া, একটু পরে বের হওয়া। বা ঘর থেকে বাইরে বের হওয়ার সময় পায়ের সাথে হোঁচট খেলে সাথে সাথে বের না হওয়া, একটু বসে তার পরে বের হওয়া। এছাড়া বাইরে যাওয়ার সময় ঝাঁড়ু দেখলে অশুভ মনে করা।
- Unlucky Thirteen বা Lucky Seven মনে করা শিরক। আবার কোন কাজ ঠিক মতো না হলে আজকের দিনটিই কুফা (অশুভ) এই ধরনের মনে করা। অনেকে নিজেকে নিজে গালি দেয় যেমন 'আমার ভাগ্যটাই খারাপ' বা 'আমার কপালটাই মন্দ'।
- বরকতের আশায় দোকান খোলার শুরুতে সোনা-রূপার পানি ছিটানো বা তুলসি পাতার পানি ছিটানো এবং আগরবাতি জ্বালানো। আবার ব্যবসার শুরুতে প্রথম কাষ্টমারের কাছে বিক্রি করতেই হবে এই ধরনের মনে করা।
- কেউ গাড়ি কিনলে বা গাড়ির ব্যবসা শুরু করলে ঐ গাড়িটি পীরের দরবারে নিয়ে যাওয়া অথবা কোন মাজারে নিয়ে যাওয়া।
- এক্সিডেন্ট থেকে রক্ষা পাবার আশায় গাড়ির লুকিং গ্লাসে বিভিন্ন কুরআনের আয়াত ঝুলানো, কাবা ঘরের ছবি ঝুলানো, তসবি ঝুলানো ইত্যাদি। (খ্রীষ্টানরা যেমন তসবি ও ক্রস ঝুলায়)

- পাথরে ভাগ্য পরিবর্তন হয় এই ধরনের বিশ্বাস থাকা। এবং পাথরে নানা রকম বিপদ কেটে যায়, এই ধরনের বিশ্বাস থাকা। এবং গায়ে সেসব পাথরের আংটি অথবা মাদুলি ধারণ করা।
- জ্যোতিষের কাছে ভবিষ্যত জানতে যাওয়া (মনে রাখতে হবে ভবিষ্যত জ্ঞান আছে একমাত্র আল্লাহর অন্য কারো নয়।)

তাহলে চিন্তা করে দেখি যে, আমরা মুসলিম বলে নিজেকে দাবি করি কিন্তু কুসংস্কার দিয়েও জীবনকে সাজিয়েছি। এভাবে কি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব? কুসংস্কার চর্চার মাধ্যমে কি প্রকৃত মুসলিম হওয়া সম্ভব? অতি দ্রুত এই সকল কুসংস্কার হতে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে এবং তাওবা করতে হবে। ইসলাম শুভ-অশুভ এই প্রথাগুলি বাতিল করেছে কারণ এগুলি তাওহীদ আল-আসমা-সিফাত এর ভিত ক্ষয় করে ফেলে এবং মানুষকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য শক্তিতে বিশ্বাস করতে শিখায়। কারণ এই প্রথাগুলি ঃ

১) একমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা (তাওয়াক্কুল) বাদ দিয়ে মানুষকে অন্য কোন মানুষ বা শক্তির (গায়রুল্লাহ) উপর নির্ভর করতে শেখায়।

২) ভাল-মন্দ আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করার এবং আল্লাহ প্রদত্ত নিয়তি এড়ানোর ক্ষমতা মানুষের অথবা সৃষ্ট জিনিষের (গায়রুল্লাহ) আছে একথা মনে করা এবং নিয়তি পরিবর্তন করতে এদের উপর নির্ভর করতে শেখায়।

সুতরাং তাওহীদের সকল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে শুভ-অশুভ সংকেত বিশ্বাস সুস্পষ্ট শিরকের শ্রেণীভুক্ত। সূরা হাদীদের ২২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ *"পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই উহা লিপিবদ্ধ থাকে।"*

তাবিজ-কবচের উপর নির্ভর করার প্রভাব

- রসূল ﷺ কুরআনের আয়াত নিজের শরীরে রেখেছেন বা অন্যকে রাখার অনুমতি দিয়েছেন বলে হাদীসের কোথাও কোন দলিল নেই। কুরআনীয় তাবিজ-কবচ শরীরে রাখা এবং রসূল ﷺ কর্তৃক বর্ণিত শয়তান এড়ানো এবং বান ও যাদু ভেঙ্গে ফেলার পদ্ধতি পরস্পর বিরোধী। যাদু থেকে বেঁচে থাকার জন্য সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ার অনুমতি রয়েছে।

বিদ'আত পালন করার প্রভাব

- বিদ'আত কথাটা আমরা সবাই হয়তো শুনেছি কিন্তু এর অর্থ কি আমরা জানি? যে সব ধরনের কাজ বা অনুষ্ঠান ইবাদত বা সওয়াবের কাজ বলে কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা স্বীকৃত নয়, রসূল ﷺ নিজে যা কখনো করেননি বা কাউকে কখনো করতে বলেননি, তাঁর সাহাবাদের সময়ও তা ইবাদত হিসেবে প্রচলিত ছিলোনা এমন সব কাজ বা অনুষ্ঠানাদি সওয়াবের উদ্দ্যেশে পালন করার নামই বিদ'আত।

- বিদ'আত বলতে বুঝায় দ্বীন পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন আনা। আমরা বাংলাদেশের মুসলিমরা ইসলামে যা আছে তা ঠিক মতো পালন না করে ইসলামে যা নেই তা খুব সওয়াবের কাজ মনে করে পালন করে যাচ্ছি। যেমন ঃ

- ঈদে মিলাদুন্নবী দিবস পালন করা। মিলাদের মাহফিল করা। শবে বরাতকে ভাগ্য রজনী মনে করে এ রাত্রি পালন করা। শবে মিরাজ দিবস পালন করা। ওরছ করা, ইছালে সওয়াবের মাহফিল করা। মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা। মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কুলখানি, চল্লিশা করা। মৃত ব্যক্তিকে সামনে নিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করা। মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে জিয়াফত, কুরআনখানি, ইছালে সওয়াব অনুষ্ঠান করা। মৃত ব্যক্তির উপর সূরা ইয়াসীন পাঠ করা। সলাতের শুরুতে 'নাউয়াইতুয়ান উসাল্লিয়া .....' বলে মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত করা। কাযা নামায (সলাত) আদায় করা।

বেশীরভাগ কবীরা গুনাহের সাথেই আমরা জড়িত।

- কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে সত্তরটির মতো কবীরা গুনাহ রয়েছে। যে গুনাহ আল্লাহ সহজে (খালেস তওবাহ না করলে) মাফ করবেন না। কবীরা গুনাহের এই ৭০টি লিস্ট দেখে মনে হবে যে আমরা বাংলাদেশের মুসলিমরা পাল্লা দিয়ে এইসব গুনাহ নিয়মিত করে যাচ্ছি। আর এই সকল গুনাহ করতে করতে আমাদের অন্তরে মরিচা পড়ে গেছে, অন্তর কঠিন হয়ে গিয়েছে ফলে আল্লাহর আযাবের ভয় অন্তরে আর অবশিষ্ট নেই। কোন অন্যায়-অবিচার করতে বিবেক আর বাধা দেয় না, অন্যায়কে আর অন্যায় মনে হয় না। মনে হয় কবীরা গুনাহ করতে করতে আমরা একেবারে বিবেকশুন্য হয়ে গেছি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

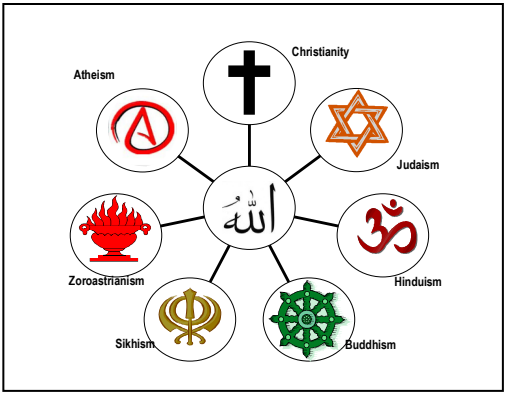

অমুসলিমদের প্রতি সম্মান

অমুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রতি ইসলামের উদারতা

একটি মুসলিম দেশে ইসলাম মুসলিমকে শুধু অমুসলিমদের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করতেই বলে না, রাষ্ট্রে তাদের সার্বিক নিরাপত্তা এবং সুখ-সমৃদ্ধিও নিশ্চিত করে। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর একাধিক স্থানে অমুসলিম সংখ্যালঘুদের অধিকার তুলে ধরা হয়েছে। অমুসলিমরা নিজ নিজ উপাসনালয়ে উপাসনা করবেন। নিজ ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মালয়কে সুরক্ষিত রাখবেন। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তাদের অধিকার সমান। তাদের প্রতি কোনো প্রকার বৈষম্য ইসলাম সহ্য করে না। যেসব অমুসলিমের সঙ্গে কোনো সংঘাত নেই, যারা শান্তি পূর্ণভাবে মুসলিমদের সঙ্গে বসবাস করেন তাদের প্রতি বৈষম্য দেখানো নয়; বরং ইনসাফ করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

আল্লাহ নিষেধ করেন না ঐ লোকদের সঙ্গে সদাচার ও ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে যারা তোমাদের সঙ্গে ধর্মকেন্দ্রিক যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের আবাসভূমি হতে তোমাদের বের করে দেয়নি। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন। (সূরা আল-মুমতাহিনা ঃ ৮)

আল্লাহ তা'আলা ঈমানের দাবিদার প্রতিটি মুসলিমকে নির্দেশ দিয়েছেন পরমতসহিষ্ণুতা ও পরধর্মের বা মতাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে। আল্লাহ ইরশাদ করেন,

তারা আল্লাহ তা'আলার বদলে যাদের ডাকে, তাদের তোমরা কখনো গালি দিয়ো না, নইলে তারাও শত্রুতার কারণে না জেনে আল্লাহ তা'আলাকেও গালি দেবে। আমি প্রত্যেক জাতির কাছেই তাদের কার্যকলাপ সুশোভনীয় করে রেখেছি, অতঃপর সবাইকে একদিন তার মালিকের কাছে ফিরে যেতে হবে, তারপর তিনি তাদের বলে দেবেন, তারা দুনিয়ার জীবনে কে কী কাজ করে এসেছে। (সূরা আল আন'আম ঃ ১০৮)

কোনো বিধর্মী উপসনালয়ে সাধারণ অবস্থা তো দূরের কথা যুদ্ধাবস্থায়ও হামলা করা যাবে না। কোনো পুরোহিত বা পাদ্রীর প্রতি অস্ত্র তাক করা যাবে না। কোনো উপসনালয় জ্বালিয়ে দেয়া যাবে না। হাবীব ইবন অলীদ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ সৈন্যদল প্রেরণকালে বলতেন,

'তোমরা আল্লাহ ও আল্লাহর নামে আল্লাহর পথে যাত্রা কর। তোমরা আল্লাহর প্রতি কুফরকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। আমি তোমাদের কয়েকটি উপদেশ দিয়ে প্রেরণ করছি : (যুদ্ধক্ষেত্রে) তোমরা বাড়াবাড়ি করবে না, ভীরুতা দেখাবে না, (শত্রুপক্ষের) কারো চেহারা বিকৃতি ঘটাবে না, কোনো শিশুকে হত্যা করবে না, কোনো গির্জা জ্বালিয়ে দেবে না এবং কোনো বৃক্ষও উৎপাটন করবে না।' [আবদুর রাযযাক, মুসান্নাফ # ৯৪৩০]

মুতার যুদ্ধে রওয়ানার প্রাক্কালে রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাহিনীকে নির্দেশ দেন :

'তোমরা কোনো নারীকে হত্যা করবে না, অসহায় কোনো শিশুকেও না; আর না অক্ষম বৃদ্ধকে। আর কোনো গাছ উপড়াবে না, কোনো খেজুর গাছ জ্বালিয়ে দেবে না। আর কোনো গৃহও ধ্বংস করবে না।' [সহীহ মুসলিম # ১৭৩১]

আরেক হাদীসে আছে, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

রসূলুল্লাহ ﷺ নিজের কোনো বাহিনী প্রেরণ করলে বলতেন, 'তোমরা গির্জার অধিবাসীদের হত্যা করবে না।' [ইবন আবী শাইবা, মুসান্নাফ # ৩৩৮০৪; কিতাবুল জিহাদ, যুদ্ধক্ষেত্রে যাদের হত্যা করা নিষেধ অধ্যায়]

আবূ বকর রাদিআল্লাহু আনহুও রসূলুল্লাহ ﷺ -কে অনুসরণ করেছেন। আপন খিলাফতকালে প্রথম যুদ্ধের বাহিনী প্রেরণ করতে গিয়ে তিনি এর সেনাপতি উসামা ইবন যায়েদ রাদিআল্লাহু আনহুর উদ্দেশে বলেন,

‘হে লোক সকল, দাঁড়াও, আমি তোমাদের দশটি বিষয়ে উপদেশ দেব। আমার পক্ষ হিসেবে কথাগুলো তোমরা মনে রাখবে। কোনো খিয়ানত করবে না, বাড়াবাড়ি করবে না, (শত্রুদের) অনুরূপ করবে না, ছোট বাচ্চাকে হত্যা করবে না, বয়োবৃদ্ধকেও না আর নারীকেও না। খেজুর গাছ কাটবে না কিংবা তা জ্বালিয়েও দেবে না। কোনো ফলবতী গাছ কাটবে না। আহারের প্রয়োজন ছাড়া কোনো ছাগল, গরু বা উট জবাই করবে না। আর তোমরা এমন কিছু লোকের সামনে দিয়ে অতিক্রম করবে যারা গির্জাগুলোয় নিজেদের ছেড়ে দিয়েছে। তোমরাও তাদেরকে তাদের এবং তারা যা ছেড়ে নিজেদের জন্য তাতে ছেড়ে দেবে। [মুখতাসারু তারীখি দিমাশক # ১/৫২; তারীখুত তাবারী]

কোনো মুসলিম যদি কোনো অমুসলিমের প্রতি অন্যায় করেন, তবে কিয়ামতের দিনে নাবী ﷺ তার বিপক্ষে লড়বেন বলে হাদীসে এসেছে। একাধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

‘সাবধান! যদি কোনো মুসলিম কোনো অমুসলিম নাগরিকের উপর নিপীড়ন চালিয়ে তার অধিকার খর্ব করে, তার ক্ষমতার বাইরে কষ্ট দেয় এবং তার কোনো বস্তু জোরপূর্বক নিয়ে যায়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার পক্ষে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ উত্থাপন করব।’ [আবূ দাউদ # ৩০৫২]

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

‘যে মুসলিম কর্তৃক নিরাপত্তা প্রাপ্ত কোনো অমুসলিমকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ তার ঘ্রাণ পাওয়া যায় চল্লিশ বছরের পথের দূরত্ব থেকে’। [সহীহ বুখারী # ৩১৬৬]

আরেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আবী বাকরা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

‘যে ব্যক্তি চুক্তিতে থাকা কোনো অমুসলিমকে অসময়ে (অন্যায়ভাবে) হত্যা করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন’। [আবূ দাউদ # ২৭৬০; নাসাঈ # ৪৭৪৭, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।]

ঐতিহাসিক বিদায় হাজ্জের দীর্ঘ ভাষণে রসূলুল্লাহ ﷺ সমাজ ও রাষ্ট্রের সব দিক ও বিভাগ সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি মাতাপিতার হক, সন্তান-সন্ততির হক, আত্মীয়-স্বজনদের হক, অনাথ ও দরিদ্রদের হক, প্রতিবেশীর হক, মুসাফিরের হক, চলার পথের সঙ্গী বা পথচারীর হক, দাস-দাসী বা চাকর-

চাকরানীর হক এমনকি ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমের হক সম্পর্কেও নির্দেশনা দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ ﷺ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সমাজে মুসলিমদের কাছে অমুসলিমদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে আমানত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মুসলিমদের তিনি অমুসলিমদের নিরাপত্তা দানের নির্দেশ দিয়েছেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনে অমুসলিমদের জান-মালের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাদের ইজ্জত-আব্রু ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তার জন্য প্রহরীর দায়িত্ব পালন করতে হবে। কারণ অমুসলিম জনগোষ্ঠীও মানুষ, তারাও আল্লাহর বান্দা। ইসলাম সম্পর্কে তারা ভুল বা বিভ্রান্তির শিকার হলে তাদের প্রতি আক্রমণ না করে তাদেরকে মূল সত্য এবং ইসলামের মহানুভবতা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

ইসলামের দৃষ্টিকোণে দুনিয়ায় মানুষের প্রাণ হরণ কিংবা জীবন নাশের চেয়ে বড় অপরাধ আর হয় না। পবিত্র কুরআনে তাই একজন মানুষের হত্যাকে পুরো মানবজাতির হত্যা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা কিংবা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া যে কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। আর যে তাকে বাঁচাল, সে যেন সব মানুষকে বাঁচাল। (সূরা আল-মায়িদা ঃ ৩২)

মানুষের প্রাণহানী ঘটানোকে যেখানে বলা হয়েছে পুরো মানব জাতিকে হত্যার সমতুল্য, সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকে গণ্য করা হয়েছে হত্যার চেয়েও জঘন্য অপরাধ হিসেবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

আর ফিতনা হত্যার চেয়েও গুরুতর। (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৯১)

আমাদের মনে রাখতে হবে, ইসলামের শান্তিপূর্ণ ও উদারনৈতিক শিক্ষার সৌজন্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও পরমতসহিষ্ণুতার জন্য বরাবর সারা বিশ্বের সুনাম কুড়িয়েছে। এ দেশের মুসলিম জনগণ সবসময় তাদের ধর্মের শিক্ষা অনুযায়ী অন্য ধর্মের লোকদের সঙ্গে শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছে। এ দেশে মসজিদ-মন্দিরে পাশাপাশি স্ব-স্ব ধর্মের ইবাদত হয়। পবিত্র রমাদান মাসে হিন্দুরা সাড়ম্বরে অষ্টমী পালন করে। খ্রিস্টানরা জাঁকজমকভাবে বড়দিন উদযাপন করেন। বৌদ্ধ ও অন্য ধর্মাবলম্বীরাও নিজ নিজ ধর্মীয় উৎসব নির্বিবাদে পালন করেন।

পক্ষান্তরে আমাদের নিকট প্রতিবেশী ভারতে ক'দিন পরপরই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু কর্তৃক মুসলিমরা আক্রান্ত হন, আরেক প্রতিবেশী মিয়ানমারে এই সেদিনও রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ইন্ধনে সাধারণ বৌদ্ধ থেকে নিয়ে শান্তিপ্রিয় হিসেবে খ্যাত ভিক্ষুরা পর্যন্ত নির্বিচার হামলা ও হত্যাযজ্ঞ চালাল মুসলিমের বিরুদ্ধে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। নারী-শিশু-বৃদ্ধকে অকাতরে হত্যা করা হয়েছে। এ দেশের কোটি মুসলিমের হৃদয় কেঁদেছে তখন, তবে কেউ এ দেশের সংখ্যালঘু হিন্দু বা বৌদ্ধদের উপর সে ক্ষোভ দেখান নি।

আমেরিকায় মহানাবী ﷺ -কে অবমাননা করে চলচ্চিত্র নির্মাণের ঘটনায় যখন সারা বিশ্ব উত্তাল, বিশ্বের দুইশ' কোটি মুসলিমের হৃদয়ে যখন জ্বলছে ক্ষোভের দাবানল, তখন একের পর এক ফ্রান্সের সাপ্তাহিকে, তারপর স্পেনের একটি ম্যাগাজিনে মহানাবীর ব্যঙ্গ কার্টুন প্রকাশের ঘটনা বিশ্ব মুসলিমকে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ করেছে। বাকস্বাধীনতার নামে অন্যের পবিত্র ধর্মানুভূতিতে আঘাত কোনো ধর্মই অনুমোদন করে না। তারপরও ঘটছে এমন ঘটনা। স্বল্প বিরতিতে ক'দিন পরপরই ঘটছে এর পুনরাবৃত্তি।

একজনের অপরাধে দশজনকে শাস্তি দেয়া অনুমোদিত নয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

হে মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে সদা দণ্ডায়মান হও। কোনো কওমের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কোনোভাবে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ইনসাফ করবে না। তোমরা ইনসাফ কর, তা তাকওয়ার নিকটতর। এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। (সূরা আল-মায়িদা ঃ ৮)

সরকারের কর্তব্য হলো ইসলাম অবমাননার সকল পথ বন্ধ করে ও অপরাধীকে তাৎক্ষণিক শাস্তির আওতায় এনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ধ্বংসের যে কোন উস্কানিকে অংকুরেই বিনষ্ট করতে হবে। ফলে এ ধরনের ঘটনা থেকে দেশি-বিদেশি যে ষড়যন্ত্রকারী মহল ফায়দা লুটতে চায়, তাদেরও গতি রোধ করা সম্ভব হবে। সর্বোপরি, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি সদাচার ও সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির বন্ধনকে অটুট রাখতে সবাইকে সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে।

আল্লাহ সকল মুসলিমকে ইসলামের উদারতা ও মহানুভতা সবার সামনে তুলে ধরার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মোঘল সম্রাট আকবরের দ্বারা ইসলামের ক্ষতিসাধন

আমরা অনেকেই মোঘল সম্রাটদের সম্পর্কে সঠিক ইতিহাস জানি না। আমাদের ধারণা মোঘল সম্রাট আকবরের ইসলামের প্রতি অনেক অবদান। এবার সম্রাট আকবরের অবদান সম্পর্কে একটু জানা যাক। সম্রাট আকবর তাঁর রাজত্বের প্রাথমিক পর্যায়ে 'আলিম-'উলামা ও আওলিয়া কিরামের সাহচর্য গ্রহণ করে একজন নিষ্ঠাবান সুন্নী মুসলিম হিসেবে জীবন যাপন করেন। পরবর্তী পর্যায়ে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে গিয়ে পৌঁছে এবং তার দ্বারা হিন্দুস্তানের মুসলিমদের যে অপূরণীয় স্বার্থহানি ঘটে এবং দ্বীন-ইসলামের ক্ষতিসাধিত হয় তার প্রতিক্রিয়া আজ অবধি বিদ্যমান।

অধ্যাদেশ বা ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে আকবর ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার একচ্ছত্র ক্ষমতা লাভ করেন। এতে তাকে আইনের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ বলে স্বীকৃতি প্রদান করা হয় এবং এ বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ আলিমগণের পরামর্শ গ্রহণ করতে মোটেই বাধ্য নন, বরং তাঁরাই তার নির্দেশ শিরোধার্য করতে বাধ্য। মোল্লা মুবারক অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কুরআন ও সুন্নাহর দলীল দ্বারা আকবারের অন্তরে তার বক্তব্য বদ্ধমূল করেন। এখান হতেই আকবরের ধর্মবিমুখতা বরং ধর্মদ্রোহিতার প্লাবণ শুরু হয়। তিনি নিত্য নূতন ফরমান জারী করে দ্বীন ইসলামের মর্মমূলে কুঠারাঘাত হানতে থাকেন এবং ১৫৯২ খৃ. নাগাদ দ্বীন-ই-ইলাহীর ভিত্তি স্থাপন করেন। উদাহরণস্বরূপ এখানে তার ধর্মবিরোধী কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হলো।

মুশরিক রমণীদের বিবাহ ঃ সম্রাট আকবর কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ লংঘন করে হিন্দু রমণীদের কেবল বিবাহ-ই করেননি, রাজকীয় অন্দরমহলে তাদের পূজা পার্বণ অনুষ্ঠানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাও করে দেন। তার এক স্ত্রী ছিল রাজা বিহারী মলের কন্যা ও রাজা ভগবান দাসের ভগ্নী। তার অপর স্ত্রী ছিল যোধপুরের রানী যোধবাই। এসব রমণী আকবরের ধর্মচ্যুতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এ সকল রমণীর প্রভাবে আকবর হিন্দু ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি মারাত্মকভাবে ঝুঁকে পড়েন এবং হিন্দু যোগীদের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করেন, এমনকি তাদের জন্য তিনি যোগীপুরা নামে একটি স্বতন্ত্র আবাসিক এলাকা নির্মাণ করেন এবং রাজকোষ হতে তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন। তিনি এমন কিছু মুদ্রাও চালু করেন যাতে হিন্দুদের দেব-দেবীর মূর্তি অঙ্কিত ছিল।

হিন্দু ধর্মের প্রতি আকবরের আকর্ষণ লক্ষ্য করে হিন্দু ব্রাহ্মণগণ তাদের সাধ্য হাসিলের পরিকল্পনা মাফিক তাদের পুরাতন পুঁথি-পুস্তক হতে আকবরকে তথাকথিত ভবিষ্যদ্বাণী পড়ে শুনায় যে, হিন্দুস্তানে একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক জন্মগ্রহণ করবেন যিনি গাভী ও ব্রাহ্মণদিগকে সম্মান করবেন। তাদের মুখে এ কথা শুনে এবং অতি পুরাতন দস্তাবেয দেখে আকবর ব্রাহ্মণদের প্রতি আরও অধিক শ্রদ্ধাবনত হন এবং গাভীর পতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করতে থাকেন। এবং হিন্দু ধমীয় বিশ্বাসমতে প্রতি বুধবার এবং দেওয়ালী অনুষ্ঠান উপলক্ষে গাভীদর্শনকে সৌভাগ্যের কারণ মনে করতেন। এভাবে হিন্দু মানসিকতায় প্রভাবিত হয়ে আকবর গরু যবেহ করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন এবং এর গোবরকে পবিত্র বস্তু ঘোষণা করেন।

কোন কোন ব্রাহ্মণ আকবরের মনে বদ্ধমূল করে দেয় যে, একবার খোদা (নাউযু বিল্লাহ) শূকরের রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। তাই শূকর দর্শন সৌভাগ্যের কারণ হয়ে থাকে। চাঁদ সূরী নামক এক জৈন ধর্মগুরুর প্রভাবে আকবর পিয়াজ-রসুন ভক্ষণ ত্যাগ করেন। হিন্দুদের প্রভাবে আকবর সূর্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। হিন্দু ব্রাহ্মণগণ তাকে এ ধারণা প্রদান করেন যে, সূর্যদেবতা রাজা-বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষক। তাই এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিৎ। সূর্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আকবরকে অগ্নিপূজার স্তরে নামিয়ে দেয়। আকবারের আমলে 'দর্শনিয়া' নামে একটি ফেরকার উদ্ভব ঘটে। তারা বাদশাহ আকবরের দর্শন লাভ না করা পর্যন্ত দাঁত মাজত না এবং আহারও গ্রহণ করত না। বাদশাহ সূর্য দেবতার এক সহস্র নাম জপ করার পর ঝরোকায় প্রবেশ করামাত্র তারা সিজদাবনত হতো।

যেহেতু হিন্দু ধর্মে সূদের ব্যবসা হারাম নয়, তাই আকবর সূদী কারবার হালাল ঘোষণা করেন। হিন্দু ধর্মমতে রক্ত সম্পর্কীয় নিকটাত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ হওয়ায় আকবর মুসলিমদের জন্যও চাচাতো, ফুফাতো, খালাতো ও মামাতো বোনকে বিবাহ না করার হুকুম জারী করেন। আকবর শাহী দরবারে এবং শাহী মহলে নামায আদায় করার উপরও বিধিনিষেধ আরোপ করেন। হিন্দুদের বরাতের দিন মুসলিমদের প্রকাশ্যে পানাহারের অনুমতি ছিল না, কিন্তু রমাদানে হিন্দু ও মুসলিমদের জন্য প্রকাশ্যে পানাহারের অনুমতি ছিল।

মোটকথা আকবর হিন্দুদিগের অসংখ্য রসম-রেওয়াজের অনুসারী হয়ে পড়েন। তার মাতা ইনতিকাল করলে তিনি হিন্দু রেওয়াজ মুতাবিক ভদরা করান।

মোঘল সম্রাট আকবর ভারত উপমহাদেশে ইসলামের যে ক্ষতি সাধন করে গেছেন তার প্রভাব আজও আমাদের মুসলিম সমাজ বয়ে যাচ্ছে।

সাম্প্রদায়িকতা শব্দের অপপ্রয়োগ বন্ধ হওয়া প্রয়োজন

পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ পালিত হয়। বাংলাদেশে ঢাকায় এবং অন্য অনেক স্থানে বাংলা নববর্ষ উৎসাহের সাথে পালিত হয়। পরের দিন একটি ইংরেজি দৈনিকে প্রথম পাতায় চার কলাম হেডিং দেয়া হয়। হেডিংটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। 'সম্প্রীতি, সাম্প্রদায়িকতা নয়' (Harmony, not Communalism)।

এ শিরোনামে বাংলাদেশের সেক্যুলার মহল এবং অতি সেক্যুলার পত্রপত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পাচ্ছে। এখানে 'সাম্প্রদায়িকতা' শব্দটি এ শিরোনামে কেন ব্যবহার করা হয়েছে ঃ বাংলাদেশে সাধারণভাবে যে অর্থে 'সাম্প্রদায়িকতা' শব্দটি ব্যবহার করা হয় তার আলোকে দেখলে এর অর্থ হচ্ছে, এ কথা বলা যে– বাংলা নববর্ষ উৎসবকে কোনোভাবেই ইসলাম প্রভাবিত করেনি। তাই এটাতে সম্প্রীতি প্রকাশ পেয়েছে, সাম্প্রদায়িকতা নয়।

চিরদিনই বাংলাদেশের সেক্যুলার পত্রপত্রিকার ইসলামবিরোধী, ধর্মবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়। কেননা এ দেশের ৮৩ ভাগ মুসলিমসহ ১০০ ভাগ জনগণ সবাই ধর্মেবিশ্বাসী ও নৈতিকতায় বিশ্বাসী; এখান থেকে বাদ যেতে পারে মাত্র কয়েক হাজার লোক।

সেক্যুলার পত্রপত্রিকা নারী সম্পর্কিত বা মানবাধিকার সংক্রান্ত ইসলামী শিক্ষাকে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়। এসব সেক্যুলার পত্রপত্রিকা বিশেষ করে নারী ও যুবকদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নিতে চায়। তারা ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশাকে উৎসাহিত করে, যার ফলে ব্যভিচার বৃদ্ধি পায়। এসব কোনো ধর্মেই গ্রহণযোগ্য নয়। তারা এমন সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে উৎসাহিত করে, যেখানে অনেক অশ্লীলতা থাকে এবং মেয়েদের শরীর প্রদর্শন একটি গুরুত্বপূর্ণ আইটেম হয়। এভাবে তারা নারীকে পণ্যে পরিণত করে।

এখন সম্প্রদায় (Community) সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। সব মানুষই কোনো না কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ। মুসলিমরাও তাই। স্বাভাবিকভাবেই সব সম্প্রদায় তাদের লক্ষ্য কার্যকর করার চেষ্টা করবে। মুসলিমরাও তাদের সম্প্রদায় বা সমাজের লক্ষ্য কার্যকর করার চেষ্টা করবে। স্বাভাবিকভাবেই

মুসলিমরা তাদের উৎসবকে তাদের ধর্মের আলোকে পালন করবে। মুসলিমদের পরিচয় ইসলাম দ্বারা; তাদের বিশ্বাস, আইন ও সংস্কৃতি দ্বারা নির্ধারিত। মুসলিমরা তাদের উৎসবে ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা, প্রকাশ্যে বয়স্ক মেয়েদের নাচ বা কোনো ধরনের শিরকের অন্তর্ভুক্তি অনুমোদন করে না। তারা মঙ্গলপ্রদীপ বা মঙ্গলশোভাযাত্রা চায় না। প্রদীপ থেকে কোনো মঙ্গল আসে না। মঙ্গল আসে কেবল স্রষ্টার কাছ থেকে। তেমনিভাবে অশালীন পোশাক ও বড় বড় পশুর মূর্তিসহ শোভাযাত্রা কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না। যদি এগুলো গ্রহণ না করা হয় তাহলে সেকিউলার পত্রপত্রিকার মতে তা হয়ে যায় সাম্প্রদায়িকতা। যদি এগুলো মেনে নেয়া হয় তা হলে তা হয় সম্প্রীতি (harmony)।

স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশে ৮৩% মুসলিম বাস করার কারণে সব উৎসবই ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত। উৎসবগুলোতে যদি নৈতিক পরিবেশ বজায় রাখা হয়, তাহলে তা অধিকতর শালীন হয় এবং কোনো ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক হয় না। কারণ অশালীন পোশাক, অবাধ মেলামেশা কোন ধর্মেরই অংশ নয়। পহেলা বৈশাখে আগের মতো নানা রকম মেলা হওয়া, খেলাধুলা হওয়া, ভালো খাবারের ব্যবস্থা করা এবং দরিদ্রদের এ আনন্দে শরীক করলে এই অনুষ্ঠানটি আবার সর্বাঙ্গসুন্দর ও সফল একটি উৎসবে পরিণত হবে।

ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism) মতবাদ সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন

ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদ ইংরেজী Secularism শব্দেরই বাংলা অনুবাদ। ইসলাম হল আল্লাহর অনুমোদিত ধর্ম। আল্লাহ যা যা বানিয়েছেন, শয়তান ঠিক তার উল্টোটা বানিয়েছে। যেমন, আল্লাহ বানিয়েছেন খিলাফত আর শয়তান বানিয়েছে মূলূকীয়া বা রাজতন্ত্র। আল্লাহ বানিয়েছেন যাকাত ব্যবস্থা আর শয়তান বানিয়েছে সুদভিত্তিক অর্থনীতি। আল্লাহ বানিয়েছেন পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ইসলাম আর শয়তান বানিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা অজ্ঞতার কারণে বলে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। আসলে বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত, ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থই হচ্ছে ধর্মহীনতা। বিশ্ববিখ্যাত সব Dictionary থেকে জানা যাক ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ কী?

Random House Dictionary of English Language-র মতে ঃ

1. Not regarded as religious form or spiritually sacred - এর অর্থ হল ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক বলে বিবেচিত নয় ।

2. Not pertaining to or connected with any religion – যা কোন ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নয় ।

3. Not belonging to any religious order - যা কোন ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্গত নয় । এটার নামই হল Secularism.

Chambers Dictionary-র মতে ঃ

The belief that the state morals s«ohould be independent of religion. অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ হচ্ছে এমন এক বিশ্বাস যার মতে রাষ্ট্র-নৈতিক শিক্ষা ইত্যাদি সবকিছু অবশ্যই ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে মুক্ত হতে হবে ।

Oxford Dictionary-র মতে ঃ

Secularism means that the doctrine should be based solely on the wellbeing of the mankind in the recent life to the exclusion of all religious considerations drawn from belief in God. - এর অর্থ হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদ হচ্ছে এমন এক মতবাদ যা আল্লাহতে বিশ্বাস বা পরকালে বিশ্বাস-নির্ভর সমস্ত বিবেচনা থেকে মুক্ত। মানবজাতির বর্তমান কল্যাণ চিন্তার উপর ভিত্তি করে এই নৈতিকতা ও মতবাদ গড়ে উঠবে ।

Encyclopedia Britannica-র মতে ঃ

1) Secular spirit or tendency especially based on social philosophy that rejects all forms of religious faith. ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদ হচ্ছে সেই ধর্মহীন রাজনৈতিক দর্শন যা সকল ধর্মবিশ্বাসকেই প্রত্যাখান করে ।

2) The view the public education and other matters of civil society should be conducted without the introduction of religious elements. এমন দৃষ্টিভঙ্গি যা সমাজের শিক্ষা ও অন্যান্য সাধারণ বিষয়গুলো কোন ধর্মীয় বিধান বা অনুশাষণ থেকে মুক্ত অবস্থায় পরিচালিত ।

ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদ সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য ঃ Dictionary-র সংজ্ঞা তো দেখলাম। এবার আল্লাহ কী বলছেন তা দেখি ঃ

"তোমরা কি কুরআনের কিছু অংশ মান আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে যারাই এরূপ আচরণ করবে তাদের এছাড়া আর কী শাস্তি হতে পারে যে তারা পার্থিব জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে? তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ অবগত আছেন।" (সূরা আল বাকারা ২ ঃ ৮৫)

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা সলাত, সিয়াম, হাজ্জ, যাকাত মানে কিন্তু কুরআনের বিচার মানে না, কুরআনের অর্থনীতি মানে না, কুরআনের পররাষ্ট্রনীতি মানে না, কুরআনের সমাজনীতি মানে না, রসূল ﷺ -এর রাজনীতি মানে না। ধর্ম আর রাজনীতিকে তারা আলাদা করে – সেজন্য আল্লাহ বলেন, তোমরা কুরআনের কিছু কথাকে করবে বিশ্বাস আর কিছু কথাকে করবে অবিশ্বাস/অস্বীকার – এ কাজটি যদি কর – দুনিয়াতে তোমাদেরকে লাঞ্ছনার জীবন দেয়া হবে – আর দেয়া হবে কিয়ামতে কঠিন শাস্তি (জাহান্নাম)। ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদ এমন এক বিষাক্ত মতবাদ যা ঐশ্বরিক নয় – যা সম্পূর্ণ মানব-রচিত – ধর্মদ্রোহী/আল্লাহদ্রোহী মতবাদ – একটি কুফরী মতবাদ। রাজনীতি এবং রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদের মূল কথা –

১) রাষ্ট্রনীতির সাথে ধর্ম সংযুক্ত থাকবে না;

২) ধর্ম থাকবে ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ;

৩) রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনায় কোনভাবেই ধর্মকে বিবেচনা করা হবে না;

৪) মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ইসলাম হতে মুক্ত শাসন। ইসলামকে ব্যক্তির জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে;

৫) ধর্মনিরপেক্ষতা মানে হচ্ছে রাষ্ট্র, রাজনীতি, অর্থনীতি তথা সমাজ ও রাষ্ট্রসম্পৃক্ত সকল কিছু থেকে ইসলামকে বর্জন করা। তাই ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদ মুসলিম বিশ্বের জন্য এক মারাত্মক অভিশাপ।

আইন করে ধর্মীয় প্রবণতাকে মানুষের ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে সমাজ জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে আল্লাহ ও রসূলের ﷺ প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার নামই ধর্মনিরপেক্ষতা। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্ত

র্জাতিক ক্ষেত্রে ধর্মকে পরিত্যাগ করাই এর লক্ষ্য। সে হিসেবে এ মতবাদকে ধর্মহীনতা বলাই সমীচীন। ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদ সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন ঃ

"তারাই সেই লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিনষ্ট/নিষ্ফল হয়, অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। তারাই সেই লোক, যারা তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয় অস্বীকার করে। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কিয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য তাদের আমলকে ওজনের কোন মানদন্ড স্থাপন করবো না। জাহান্নামই তাদের প্রতিফল; কারণ তারা কাফির হয়েছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রসূলগণকে বিদ্রূপের বিষয়রূপে গ্রহণ করেছে। (সূরা কাহাফ ঃ ১০৪-১০৬)

Secularism-এর যারা পূজারী তাদের চরিত্রে ও তাদের প্রতিটি কর্মের মধ্যে থাকে দুনিয়ার কোন স্বার্থ পূরণের ভাবনা। সে চেতনায় আখিরাতের কোন ভাবনা থাকে না। বস্তুত সেক্যুলারিজমের আভিধানিক অর্থ হলো ইহলৌকিকতা। সে ইহলৌকিক ভাবনা নিয়েই তাদের রাজনীতি এবং তা নিয়েই তাদের সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তি। প্রতিটি কর্মের মধ্যে সেক্যুলারিস্টগণ তাই নিজেদের দুনিয়াবী স্বার্থসিদ্ধি ও অর্থনৈতিক প্রাপ্তির বিষয়টি সর্বাগ্রে দেখেন। স্বার্থলাভ ও অর্থনৈতিক প্রাপ্তি ছাড়া কেউ কোন কাজ করতে পারে এটা তারা ভাবতেও পারে না।

বাস্তবতা ঃ বাংলাদেশে যারা ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে কথা বলেন তাদের মূল মাথা ব্যাথা হলো ইসলামকে নিয়ে। এরা অন্য ধর্মের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে খুবই গর্বিত বোধ করে কিন্তু কোন ইসলামী অনুষ্ঠানে যোগ দেয়াকে খুবই খারাপ দৃষ্টিতে দেখে। এদের ইচ্ছা হলো সকল ধর্ম তার জায়গা মতোই থাকবে শুধু ইসলামকে বাদ দিতে হবে।

"লাকুম দীনুকুম ওয়াল ইয়াদীন" আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা

অনেক বুদ্ধিজীবী এবং রাজনীতিবিদ সূরা কাফিরুনের (কুরআনের ১০৯ নম্বর সূরা) শেষের আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে থাকেন। তারা বলেন, আল্লাহ নিজেই তো ধর্মনিরপেক্ষ। তখন তারা সূরা কাফিরুনের শেষ আয়াত quote করে বলেন যে "লাকুম দীনুকুম ওয়াল ইয়াদীন" অর্থাৎ তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার। কিন্তু তারা এই সূরার আগের আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা পড়েন না এবং

এই সূরা নাযিলের উদ্দেশ্যই জানেন না। কখন এবং কেন আল্লাহ তাঁর নাবী ﷺ -কে এই কথা কাফিরদেরকে বলতে বলেছিলেন সে সম্পর্কে এদের কোন ধারণাই নেই। দেখা যাক পুরো সূরাতে আল্লাহ কাফিরদেরকে কী বলছেন। আল্লাহ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -কে নির্দেশ দিচ্ছেন...

(১) বল ঃ হে কাফিররা! (২) আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা কর। (৩) এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি। (৪) এবং আমি ইবাদতকারী নই তার, যার ইবাদত তোমরা করে আসছো। (৫) এবং তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি। (৬) তোমাদের জন্য তোমাদের কর্মফল (দ্বীন) এবং আমার জন্য আমার কর্মফল (দ্বীন)।

কাফিররা যখন ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করছিল না এবং এক পর্যায়ে তারা রসূল ﷺ -কে প্রস্তাব দিয়েছিল যে ঠিক আছে, আসুন আমরা একটা চুক্তি করি। আপনি কিছুদিন আমাদের মূর্তি পূজা করবেন তারপর আমরা কিছুদিন আপনার ইসলাম পালন করবো। এর উত্তরে আল্লাহ তা'আলা কঠোর হয়ে বলেছেন ঐ চুক্তির কোন প্রয়োজন নেই, বল তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমার ধর্ম আমার। অর্থাৎ বিধর্মী ও ধর্মহীনরা (যেমন আজকের বুদ্ধিজীবি শ্রেণী) তোমরা তোমাদের ধর্মবিশ্বাস বা অবিশ্বাস নিয়েই থাকো আমরা মুসলিমরা আমাদের ধর্ম নিয়েই থাকব। অতএব এই আয়াত এবং এই সূরা ধর্ম নিরপেক্ষতার সম্পূর্ণ বিপরীত।

এই আয়াতটি বুঝার জন্য আমাদেরকে সবগুলো মক্কী সূরার তাফসীর ভাল করে পড়তে হবে। শুধু মাঝখান থেকে একটি বা দুটি আয়াত নিয়ে quote করলে হবে না কারণ তাতে ভুল ব্যাখ্যার আশংকাই অধিক, যেমনটি আজকাল হচ্ছে।

দেশের উন্নতিতে ইসলাম কি প্রতিবন্ধক?

ব্লগে, টক শো'তে বা পত্র-পত্রিকার আলোচনায় অনেকে বলেন ঃ 'দেশের উন্নয়নের জন্য ধর্মের প্রয়োজন নেই। ধর্ম আরো সমস্যা তৈরী করে। তাই অনেকেই ধর্ম, বিশেষ করে ইসলামের, বিরোধিতা করে থাকে।' আসলে বিষয়টা কি তাই?

আধুনিক যুগে যে সকল দেশ উন্নত হিসেবে বিবেচিত তাদের দিকে একটু তাকিয়ে দেখি। তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মকে কিভাবে নিয়েছে। কয়েকটি দেশের

উদাহরণ দেখা যাক। তারা ধর্মের সাথে, বিশেষ করে ইসলামের সাথে কেমন আচরণ করেন।

ক্যানাডা

ক্যানাডা পৃথিবীর ৪র্থ শান্তিপ্রিয় এবং একটি অমুসলিম দেশ। আমরা জানি বাংলাদেশ একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ, আর স্বাভাবিকভাবেই সে দেশে ইসলামী নীতি পালিত হওয়ার কথা বেশী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে আমাদের দেশে আমরা মুসলিম হিসেবে যতটা না ইসলামী নিয়ম-কানুন পালন করি ক্যানাডা একটি অমুসলিম দেশ হওয়া সত্ত্বেও সেদেশের সরকার আমাদের চেয়ে অনেক বেশী ইসলামী নিয়ম-কানুন পালন করে যাচ্ছে। আমরা মুসলিম হয়ে ইসলামী নিয়ম-কানুন ত্যাগ করেছি আর অমুসলিমরা তা গ্রহণ করে উপকৃত হচ্ছে।

ধর্মীয় অধিকার (Religious rights) ঃ এদেশে প্রত্যেক ধর্মের লোকদের সমান অধিকার। কেউ কারো ধর্ম নিয়ে কটুক্তি করতে পারবে না বা হেয় করতে পারবে না। যে যার ধর্ম অন্য ধর্মের লোকের নিকট প্রচার করতে পারবে। অর্থাৎ যার যার ধর্ম ঠিক মতো পালন করতে পারবে। যেমন ঃ অফিসে সলাতের সময় হলে সলাতের জন্য সময় দিতে হবে বা রমাদানে ইফতারের জন্য সময় দিতে হবে। আবার কেউ চাইলে যে কারো বাসার দরজায় গিয়ে নক করে তার ধর্মের দাওয়াত দিতে পারে, ধর্মীয় বইপত্র দিতে পারে। অথবা কোন শপিং মলে বা ব্যস্ততম রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে যে কেউ যে কোন ধর্মগ্রন্থ বিলি ও ধর্মপ্রচার করতে পারেন।

আইন ঃ কেউ যদি কোন দাড়িওয়ালা মুসলিমকে দাড়ির কারণে রাস্তা-ঘাটে অপমান করে বা টুপি পড়ার জন্য অপমান করে বা কোন মহিলাকে বোরকা পরার জন্য বা নিকাব করার জন্য অপমান করে তাহলে তৎক্ষনাৎ তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার পদ্ধতি বাস্তবে কার্যকর রয়েছে। তাই অন্য ধর্মের লোকেরাও এই বিষয়ে খুবই সাবধাণতা অবলম্বন করে থাকে। ক্যানাডার মুসলিমরা এখানে সবচেয়ে শান্তিপ্রিয় নাগরিক হিসেবে গন্য হয়েছে।

স্কুল/কলেজ ঃ ক্যানাডাতে প্রচুর ইসলামিক স্কুল রয়েছে। হাজার হাজার ছেলেমেয়েরা সেখানে পড়াশোনা করছে, ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। মেয়ে ছাত্রীরা এবং শিক্ষিকারা হিজাব পরে নিয়মিত স্কুল করছে। ইসলামিক সাবজেক্টগুলো শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষায় অতিরিক্ত মার্ক হিসেবে যুক্ত হচ্ছে।

সংগঠন (অর্গানাইজেশন) ঃ এখানে অনেক ইসলামিক অর্গানাইজেশন রয়েছে যারা ইসলাম প্রচার এবং সামাজিক কর্ম-কান্ড করে থাকে। চাইলেই যে কেউ মিনিষ্ট্রি থেকে রেজিস্ট্রেশন করে ইসলামিক অর্গানাইজেশন চালু করতে পারে। এই সকল ইসলামিক অর্গানাইজেশনের সদস্য হয়ে হাজার হাজার নরনারী সমাজসেবামূলক কাজকর্ম করছেন। এই ধরণের কাজের জন্য ইমিগ্রেশন মিনিষ্টার সরকারীভাবে প্রতি বছর এওয়ার্ড পুরষ্কার দিয়ে থাকেন।

ইনস্টিটিউশন ঃ এখানে অনেক হালাল ফাইনানসিয়াল ইনস্টিটিউশন রয়েছে। যারা সুদমুক্ত অর্থনীতির কারবার করে থাকে। যেমন সুদবিহীন লোন দিয়ে বাড়ি কেনা, সুদমুক্ত পেনশন স্কিম, ছাত্রদের জন্য সুদমুক্ত এডুকেশন স্কিম এবং হালাল ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিস রয়েছে।

সিঙ্গাপুর

ওদেশে সরকার চালান মূলতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ চাইনিজ অরিজিনের লোকেরা। ইসলাম ধর্মের বিরোধিতা করে না তাঁরা। কিন্ত তাঁরা মুসলিমদের কী পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে তা বলে শেষ করা যাবে না। সিঙ্গাপুরে বসবাসরত যেকোন পরিবারের সাথে কথা বললেই তা জানা যায়। বিশাল বিশাল মসজিদ বানিয়ে সরকারী বেতন দিয়ে খতিব-ইমাম-মুয়াজ্জিনদের রাখা হয়েছে সলাত আদায় করানোর জন্য। প্রতিটি এলাকাতেই একটি করে মসজিদ রয়েছে এবং প্রতিটি মসজিদেই রয়েছে আফটার স্কুল মাদ্রাসা। মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বৃত্তি দেয়া হয় আরব দেশে গিয়ে কুরআন অধ্যয়নের জন্য, ইসলাম শেখার জন্যে। মুসলিমদের নানা রকম সেবা দেয়ার জন্য সিঙ্গাপুর সরকারের মন্ত্রনালয়ে 'মুইস' নামক একটি বিভাগ রয়েছে। মুসলিমদের জন্য সর্বত্রই হালাল খাবার পাওয়া যায়। এজন্য হালাল মনিটরিং অথরিটি রয়েছে যারা মুসলিমদের জন্য হালাল মাংস এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের পরীক্ষার পর সার্টিফিকেশন দিয়ে থাকে এবং প্যাকেটের গায়ে লিখা থাকে 'হালাল'।

অষ্ট্রিয়া

অস্ট্রিয়া যদিও একটা সেকিউল্যার দেশ, কিন্তু সেখানে সকল ধর্মকে আন্ত রিকভাবেই সম্মান করা হয়। যদি কোন সরকারী স্কুলের কোন ক্লাসে ৬-৭ জন মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীও থাকে, তাদের জন্যে স্কুলের পক্ষ থেকেই একজন ইসলামিক স্টাডিজের শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে তাদেরকে ইসলাম শিক্ষা দেয়া হয়।

ইংল্যান্ড

ইংল্যান্ড একটা সেকিউল্যার দেশ। তারপরও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরুন বলে থাকেন- এই ইংল্যান্ড খৃষ্টানদের। তারপরও কেউ ইসলামসহ অন্য কোন ধর্মকে প্রকাশ্যে অবমাননা করলে তার শাস্তির বিধান আছে এবং শাস্তি দেয়াও হয়। বাংলাদেশে এখনো মাত্র তিনটি সরকারী মাদ্রাসা। কিন্তু ইংল্যান্ড সরকারী মাদ্রাসার সংখ্যা অনেক।

ইংল্যান্ডের ইস্ট লন্ডন এলাকায় গেলে মনে হবে কোন মুসলিম দেশে প্রবেশ করেছি। চারিদিকে দাড়ি-টুপিওয়ালা লোক। প্রচুর মসজিদ এবং ইসলামিক স্কুল। সেখানে মাইকে আযান দেয়া হয়। মুসলিমদের নামে পার্ক এবং রাস্তা রয়েছে। ইস্ট লন্ডনের রাস্তায় যতো হিজাব পরিহিতা মহিলা দেখা যায় তা মুসিলমদেশের রাজধানী ঢাকার রাস্তায়ও দেখা যায় না।

আমরা বিভিন্ন উন্নত দেশের সরকারগুলোর ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি মনোভাব ও কার্যক্রম সম্পর্কে জানলাম। এর বিপরীতে যদি মুসলিম প্রধান বাংলাদেশের অবস্থা চিন্তা করি? লেখক নিয়মিত ক্যানাডার টরোন্টো শহরের ব্যস্ততম রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ইসলাম প্রচার করেন, ইসলামী বইপুস্তক ও কুরআন অমুসলিমদের মাঝে বিলি করেন। অসংখ্য লোক এই জায়গায় (ইটন সেন্টার) দাঁড়িয়ে মুসলিম হয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

বাংলাদেশ উন্নত হবার জন্যে ধর্মের বা ইসলামের দরকার আছে কি-না, বা কতটুকু দরকার আছে তা নিয়ে হয়ত আলোচনা বা বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন দ্বিমত করার সুযোগ নেই যে, ধর্মের বিরোধিতা করে দেশকে কোন ক্রমেই উন্নত করা যায় না। আমাদের সম্মানিত রাজনীতিবিদ, সুশীল সমাজ, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদেরকে এই সহজ সত্যটা বুঝতে হবে। এখনো সময় আছে। তা না হলে আমাদেরকে আরো জঘন্য পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

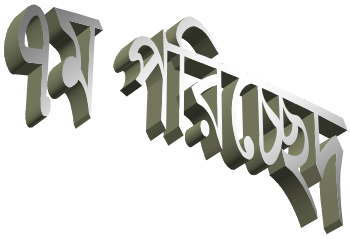
৭ম পরিচ্ছেদ

শান্তি (ইসলাম) নাকি নিজেদের মধ্যে দলাদলি

পৃথিবীতে ইসলাম বাদে অন্যান্য যে ধর্ম গুলো আছে তাদের নিজেদের ধর্মের মধ্যেও বিভিন্ন গ্রুপ আছে, বিভিন্ন মতভেদ আছে কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে কোন দলাদলি নেই যেমনটি আমাদের মুসলিমদের মধ্যে রয়েছে। পৃথিবীর ৩৩% মানুষ হচ্ছে খৃষ্টান আর ২১% হচ্ছে মুসলিম বাদ বাকি অন্যান্য ধর্ম। আমরা যদি সারা বিশ্বের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই যে দুই-একটা দেশ বাদে পৃথিবীর সকল মুসলিম দেশেই নিজেদের মধ্যে বিভেদ এবং নিজেরা ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি করে অশান্তি ভোগ করছে। আর অমুসলিম দেশগুলো নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ রক্ষা করে সুখে শান্তিতে বসবাস করছে। বাংলাদেশের কথাই যদি বলি তাহলে দেখা যায় যে ইসলামের নামে নানা দল, নানা ফিরকা। একে অপরে শুধু কাঁদা ছুড়াছুড়ি করছে। সকল ইসলামী দলগুলো একমত হয়ে এক সাথে কোন কাজ করতে পারছে না আর এতে আমাদের দেশে ইসলাম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অপর দিকে ইসলাম বিরোধী শক্তি আরো শক্তিশালী হচ্ছে।

বর্তমানে সবচেয়ে আলোচিত আমেরিকান ইয়থ ইসলামিক স্কলার নুমান আলি খান। সারা বিশ্বের তরুন সমাজের কাছে তিনি খুবই জনপ্রিয় এবং গ্রহণযোগ্য। আলহামদুলিল্লাহ, তার গাইডেন্সে হাজার হাজার তরুন সঠিক ইসলাম সম্পর্কে জানছে এবং ইসলামের পথে আসছে। তিনি তরুন সমাজের জন্য এক মাইল ফলক। উল্লেখ্য নুমান আলি খানের প্রচুর লেকচার ইউটিউবে রয়েছে। তারই একটি সত্য ঘটনা নিম্মে শিক্ষনীয় হিসেবে তুলে ধরা হলো।

“দাওয়াত না ঝগড়া”
আমেরিকা থেকে নুমান আলি খান

মূর্খের মত মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার একটা উদাহরণ হচ্ছে, যখন আমরা ইসলামের কথা বলি তখন বিভিন্ন দল নিয়ে কথা বলি। আমরা বলি এই দল বনাম সেই দল, এই শায়খ বনাম ওই শায়খ।

এটা নাবী ﷺ -এর সুন্নাহ নয়, তবে এখন মুসলিমদের সমাজে একটা প্রথা চালু হয়েছে, যখনি কেউ মানুষের উপকারের জন্যে কাজ করবে তাকে তার ভুল বের করতেই হবে। এবং গ্যারান্টির সাথে বলছি, আমি অথবা যে কেউ যখন মাইকে কথা বলেছে আপনি কোথাও না কোথাও তার ভুল খুঁজে পাবেনই। কারণ আমরা মানুষ। তাই যদি আপনি ভুল খুঁজে বের করতে চান- আমি গ্যারান্টির সাথে বলতে পারি- আপনি কোথাও না কোথাও ভুল খুঁজে পাবেনই। মানুষ মাত্রই ভুল করে আর আপনি যদি কারো ভুল খুঁজে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করে থাকেন এটা ঠিক না। মানুষ ভুল করবেই এটাই স্বাভাবিক।

অন্যের পিছনে লেগে মুসলিমরা তাদের সব শক্তি ব্যয় করে ফেলে, সব শক্তি অপচয় করে। এই মতামত বনাম সেই মতামত, অনেক হয়েছে .. যথেষ্ঠ..। এখন দ্বিতীয় বিষয়, এ ধরনের বিষয়-আমি মোটেও গম্ভীর আলোচনা বলতে চাই না এগুলো ইসলামের নামে বিষাক্ত কথাবার্তা, এগুলো হল, যখন আমরা নিজেরাই একজন আরেকজন কে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাই। এরা আল্লাহর চেয়েও বেশি বিচার করতে চায়। এরা মানুষকে মুখের কথা দিয়েই জাহান্নামের আগুনে পাঠিয়ে দিতে চায়। এটা হারাম, ওটা হারাম, ফকিহরা এ বিষয়ে কে কি বলেছে তার কোনো ধারণাই নাই। কিন্তু সে মনে করে এটা হারাম, তাই সে দুনিয়ায় তার ফতোয়া জারি করতে চায়। কি যোগ্যতা আছে তোমার ভাই? কোথা থেকে এসব পেয়েছ তুমি?

আমি একটা মজার ঘটনা বলি, আমার বন্ধু শেখ আব্দুল নাসের কেউ কেউ তাকে চিনে থাকবেন তো, সে আর আমি একটি রেষ্টুরেন্টে রাতের খাবারের জন্যে বসে ছিলাম। আমাদের পাশেই আরেক টেবিলে আরো দুইজন বসেছে। এক জনের ছোট খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি আছে, খুবই ছোট দাঁড়ি আর তার পাশের জনের লম্বা দাঁড়ি। তো লম্বা দাঁড়ি ওলা ছেলেটা, ছোট দাঁড়ি ওলা কে বলছে- দেখো ভাই, তোমার চেহারা হারাম, তোমার লম্বা দাড়ি রাখা উচিত। সে রেস্টুরেন্টে খেতে বসে, অন্য মানুষের সামনে তার বন্ধুকে অপমান করছে।

আপনারা জানেন, যখন ফিকহের কোনো বিষয় আসে, আমি মুখ বন্ধ রাখি কারণ আমি ফকিহ নই, আমি আলেমও নই। কিন্তু শায়খ আব্দুল নাসের একজন ফকিহ, আর উনি বসে বসে ওই দুইজনের কথা শুনছিলেন। আর আরেকটা কথা, ওই দুইজনের বয়সই ২০ এর কাছাকাছি। তারা কথা বলছে এটা হারাম, আর হাদীসে আছে, তোমার লম্বা দাঁড়ি রাখতেই হবে, এটা আবশ্যিক ইত্যাদি।

শায়খ আব্দুল নাসের কেবল মাত্র তার খাবাব মুখে দিতে যাবেন। উনি খাবারটা প্লেটে রাখলেন, তারপর ওই ছেলেকে বললেন, ভাই ..এই হাদীসটা কোথায় যেন আছে? আম আম .. মনে হয় বুখারীতে.... কোন অধ্যায়ে? এটার রাবী কে? এটা কে বর্ণনা করেছে? এটা কে কাকে বর্ণনা করেছে? সাহাবারা এটাকে কিভাবে মেনে চলেছেন? তাবেইনরা এই হাদীসটাকে কিভাবে বুঝেছেন? ইমাম বুখারী নিজে এটা নিয়ে কী বলেছেন? এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ফাতহুল বারীতে কী বলা আছে? মালিকি মাজহাবে এটা নিয়ে কী বলা হয়েছে? শাফেয়ী ইমামরা কী বলেছেন?

সে বলে উঠলো আপনি আমাকে অপমান করছেন, অনুগ্রহ করে অপমান করবেন না। শায়খ বলল হ্যা আমি অপমান করছি কারণ একটু আগে তুমি ওকে অপমানিত করছিলে। তোমার এই বিষয়ে কোন ধারণা নাই, তুমি অল্প বিস্তর কিছু পড়ে কোনো একটা বিষয়কে হারাম করছে আবার হালাল করছো! তোমার এই বিষয়ে রায় দেয়ার কোনো অধিকার নেই। একটা বিষয়কে হারাম বলার আগে, সেটা নিয়ে সাবধান হওয়া উচিত, আল্লাহ এটাকে হারাম করেছেন.. (এটা বলার আগে) খুবই সতর্ক থাকা উচিত। এমন বলা কোনো তুচ্ছ বাপার না। এটা আল্লাহর 'হুদুদ' অর্থাৎ আইন। তুমি সামনে যা পাও তাকেই 'হারাম' 'হারাম' বলতে পারোনা। এরকম বলার কোনো সুযোগই নেই তোমার। এবং এটা তুমি নির্ধারণ করনা কে জাহান্নামের আগুনে দগদ্ধ হবে? কে সোজা পথে চলছে, কে ভুল পথে চলছে?

কুরআনে আল্লাহ বলছে "ইন্না রব্বাকা হুয়া আলাম, বি মান দল্লা আন সাবিলিহ (৬৮ঃ৭) তোমার রব, তিনি জানেন, কে পথভ্রষ্ট"। তুমি না .. আমরা এটা নিয়ে চিন্তা করার কথা না, কিন্তু আমরা একজন আরেকজনকে খুব তাড়াতাড়ি বিচার করতে পছন্দ করি। আর এটাতে আমরা এতই পারদর্শী যে কেউ মসজিদে ঢোকার সাথে সাথে আমরা তাকে নিয়ে কথা বলতে শুরু করে দেই, তার দিকে তাকিয়েই ... আহ... ছোট দাঁড়ি ...(হুহ) ... আমরা হা করে তাকিয়ে তার প্যান্ট-এর দৈর্ঘ্য মাপি, (আহ হুহ)... এত দ্রুত ... আমরা দেখেই তাকে

জাহান্নামে পাঠিয়ে দেই। এটা একটা জঘন্য কাজ, খুবই জঘন্য জঘন্য কাজ ইসলামের মাধ্যমে আরেকজনকে বিচার করা। এসব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহই বিচারের ক্ষমতা রাখেন। এটা আমাদের কাজ না। এটা আমাদের স্থান না।

মাযহাব সংক্রান্ত জটিলতা

ইসলাম পালনে মাসালা-মাসায়েলের বিষয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় ভিন্নতা। বিশেষ করে সলাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি পালনে প্রধান চার ইমামের মাযহাবে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। এখন একজন মুসলিম হিসেবে আমি কার মাযহাব অনুসরণ করবো? এটি একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন। রসূল ﷺ নিজে কোন মাযহাবকে অনুসরণ করেছিলেন? বা চার খলিফাসহ সকল সাহাবীরাইবা কোন মাযহাবকে অনুসরণ করেছিলেন? আমরা মাযহাব অনুসরণ করলেও তার কতোটুকুইবা অনুসরণ করবো?

আমরা যারা নিজেকে হানাফী বা অন্য কোন মাযহাবের অনুসারী বলে দাবী করি তারা কি সেই মাযহাব সম্পর্কে একটু পড়াশোনা করেছি যে কেন আমি এই মাযহাব অনুসরণ করি? নাকি অন্যের দেখাদেখি অনুসরণ করে যাচ্ছি?

মাযহাব মানা কি ফরয? আমরা কি মাযহাব মানতে বাধ্য? অনেকে বলেন কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাবকে অবশ্যই মানতে হবে অর্থাৎ মাযহাব মানা ফরয। এবং চার মাযহাবের মধ্যে কোন প্রকার সংমিশ্রণ করা যাবে না! যেমন হানাফী মাযহাবের কিছু নিয়ম-কানুন এবং শাফী মাযহাবের কিছু নিয়ম-কানুন একই সাথে অনুসরণ করা যবে না! এই দির্দেশ কি নাবী মুহাম্মাদ ﷺ দিয়েছেন? আমরা মাযহাব মানতে অবশ্যই বাধ্য নই। কোন মাযহাবের ঐ বিষয়টুকু শুধু মানবো যেটুকু সহীহ হাদীসভিত্তিক। যা সহীহ হাদীসভিত্তিক নয় তা অবশ্যই মানা যাবে না। এটি রসূল ﷺ -এর আদেশ। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"আল্লাহ ও তাঁর রসূল যখন কোন কাজের নির্দেশ প্রদান করেন তখন কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর ঐ নির্দেশের ব্যতিক্রম করার কোন অধিকার থাকে না; আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা অমান্য করল, সে স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট হয়ে গেল।" (সূরা আহযাব ঃ ৩৬)

যদি বলা হয় কোন একটি মাযহাব মানা ফরয তাহলে জানতে হবে যে এই ফরয হুকুমটি কার থেকে এসেছে। কারণ ইসলামের সমস্ত ফরয হুকুম এসেছে ওহীর মাধ্যমে নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছ থেকে।

কোন আলেম বা কোন হুজুর ইসলামের কোন বিষয় ফরয বা নফল করতে পারবে না, আর কেউ যদি তা করে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে সে মহান আল্লাহ তা'আলা ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছে। (নাউযুবিল্লাহ)

আর মাযহাব মানা যদি ফরয হতো বা সুন্নাহ হতো তাহলেও তার দলিল কুরআনের কোন আয়াতে থাকতো। কুরআনে না থাকলেও সহীহ হাদীসগ্রন্থগুলোতে থাকতো। কোন সহীহ হাদীসগ্রন্থে না থাকলেও হয়তো দুর্বল হাদীসে থাকতো। কিন্তু কুরআন-হাদীস তো দূরের কথা মাযহাব ফরয হওয়ার বিষয়ে একটি জাল হাদীসও নেই। তাই "মাযহাব মানা ফরয" এই প্রচার বা নির্দেশ মুসলিম সমাজে কীভাবে এলো তা চিন্তা করার বিষয়। মাযহাব আল্লাহর রসূল ﷺ -এর মৃত্যুর চারশত বছর পরে এসেছে। এই চারশত বছর পর কে এই ফরয হুকুম নিয়ে এলো? কার কাছে ওহী এলো?

মাযহাব কী? মাযহাব অর্থ মত ও পথ। সারা পৃথিবীতে ছড়ানো সুন্নী মুসলিমদের প্রধানত চারটি মত ও পথ। সুন্নীদের ফিকহ (Fiqh or Jurisprudence) এর বিখ্যাত চার ইমামের নামানুসারে আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে বিভক্ত চারটি মত ও পথের অনুসারীগণ – যেমন ঃ হানাফী, মালিকি, শাফেঈ এবং হান্‌বালী মাযহাব। প্রচলিত চার মাযহাবের অস্তিত্ব রসূলুল্লাহ ﷺ এর যমানায় ছিল না, এগুলোর সৃষ্টি হয়েছে তাঁর মৃত্যুর চারশত বছর পর।

ব্যাপক অর্থে মাযহাব হচ্ছে আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে কতিপয় মাসয়ালা-মাসায়েলের ব্যাপারে ওলামাদের মতামত, অনুধাবন ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান। আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ এই জ্ঞান, গবেষণা এবং মতামতের অনুসরণ করা কারো উপর অপরিহার্য করেননি। কেননা মতামতের মধ্যে শুদ্ধ-অশুদ্ধ উভয় সম্ভাবনা বিদ্যমান। তবে মাযহাবসমূহের যে সব বিষয় কুরআন-সহীহ হাদীসের ওপর নির্ভরশীল শুধু সেগুলোই অনুসরণ করা ওয়াজিব। আর যেগুলো কুরআন-হাদীসের বাণী দ্বারা সমর্থিত নয়, সেগুলো মতামত ও ইজতিহাদের বিষয়; এতে শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ উভয় সম্ভাবনা রয়েছে। যে সকল মত ও পথ কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা মোটেও সমর্থিত নয়, এগুলো ইসলাম ধর্মে নূতন সৃষ্টি। মাযহাব মেনে চলা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল বা মুবাহ কোনটাই নয়। কারণ ফরয ও ওয়াজিব নির্ধারণ করতে পারেন একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রসূল ﷺ।

জেনে রাখা ভালো যে মুসলিমদের জন্যে একটি মাত্র মাযহাব আল্লাহ অনুমোদন করেছেন তাদেরকে বিভ্রান্তি থেকে বাঁচানোর জন্যে, এবং সেই মাযহাব হচ্ছে

কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত রসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাযহাব (মাযহাব মুহাম্মাদী), যা তিনি তাঁর জীবিতকালে তাঁর সাহাবীগণসহ, এবং তৎপর তাঁর চার খলিফা, তাবিঈন, তাবি-তাবিঈনগণ অনুসরণ করে গেছেন। মুসলিমদের মাঝে ভিন্ন ভিন্ন দল ও মত সৃষ্টি করা আল্লাহ নিষেধ করেছেন (সূরা আল আরাফ ৬ ঃ ১৫৯; সূরা আলে ইমরান ৩ ঃ ১০৩)

যখন একজন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তিনি কোন মাযহাব অনুসরণ করবেন?

আমরা যারা আমেরিকা, ক্যানাডা, ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়াতে থাকি তারা বিষয়টি অনুধাবন করে থাকি। এখানে নিয়মিত অমুসলিমরা ইসলাম গ্রহণ করছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যখন একজন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তিনি কোন মাযহাব অনুসরণ করবেন? যারা হানাফী মাযহাব অনুসরণ করেন তারা হয়তো বলবেন সে হানাফী মাযহাব অনুসারে ইসলামের নিয়ম-কানুন মেনে চলবে। একইভাবে যারা মালিকী মাযহাব অনুসরণ করেন তারা হয়তো বলবেন সে মালিকী মাযহাব অনুসারে ইসলামের নিয়ম-কানুন মেনে চলবে। এখন ঐ নওমুসলিম বেচারা কোন দিকে যাবেন? একে তো সে নতুন মুসলিম এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলামকে জানার জন্য পড়াশোনা শুরু করবেন তখন আবার দেখবেন ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে সলাত আদায়ের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মাযহাবে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম, আবার আল্লাহর রসূল ﷺ -এর সহীহ হাদীসে রয়েছে ভিন্ন নিয়ম! একেতো নিজের ধর্ম ত্যাগ করার কারণে পরিবার এবং পরিবেশ থেকে পাচ্ছেন নানা রকম অবহেলা, তার উপর ভিন্ন ভিন্ন মাযহাবের নিয়ম-কানুন নিয়ে ইসলামে টিকে থাকাটাই হবে তার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

আমার সন্তান কোন্ মাযহাব অনুসরণ করবে?

এই সমস্যাটি বাংলাদেশে নেই বললেই চলে। কারণ বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিম হানাফী মাযহাবের অনুসারী। আমরাও যেমন ছোটবেলা থেকে একটি মাযহাবই দেখে এসেছি তাই আমাদের মাঝেও এই প্রশ্নের উদয় হয় নাই। আমরা ইসলাম মানেই জেনেছি হানাফী মাযহাব। কিন্তু আমরা যারা প্রবাসে বসবাস করি আমাদের সন্তানেরা বড় হচ্ছে মাল্টিন্যাশনাল পরিবেশে। এই দেশে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলিমরা বসবাস করে। আমাদের সন্তানরা স্কুল, কলেজ, মসজিদ বা প্রতিবেশী মুসলিমদের সম্মুখে বিভিন্ন মাযহাবের সম্মুখীন

হয়। এই কচি বয়সে সে নিজের কাছে মাযহাব নিয়ে কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়! কোনটি সঠিক? বা কোনটি পালন করবো? শিক্ষক বলছেন একটা, আবার বাবামা বলছেন অরেকটা। বিরাট সমস্যা বটে!

বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। এই সমস্যায় আমরা ভুগছি গত পাঁচ বছর যাবত। আমাদের মেয়ের বয়স ১০ বছর। সে গত পাঁচ বছর যাবত বাংলাদেশী মাদ্রাসা শিক্ষিত একজন শিক্ষিকার নিকট আরবী পড়ে। পড়া শেষে প্রতিদিন শিক্ষিকা ছাত্রীদেরকে কিছু কিছু করে মাসলা-মাসায়েল শিক্ষা দিয়ে থাকেন। মাসলা-মাসায়েল যেহেতু মাযহাবের বিষয়, সেটা আসবেই। শিক্ষিকা ছাত্রীদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে, ইসলামে মাযহাব হচ্ছে চারটি। আমরা হচ্ছি হানাফী মাযহাবের অনুসারী, আর একটি মাযহাব মানা প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরয। এখন আমাদের মেয়ে বাসায় এসে আমাদেরকে প্রশ্ন করছেন যে, "তোমরা কোন মাযহাবের"? এখন আমার এই কচি সন্তানকে কী উত্তর দেবো? আমরা যদি বলি আমরা শাফী মাযহাবের, তাহলে তার সাথে সংঘাত হবে! আবার যদি বলি আমরা কোন নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণ করিনা আমরা সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করি, তাহলে তার শিক্ষিকার সাথে সংঘাত হবে। আর শিক্ষিকা যদি এই খবর জানতে পারেন তাহলে হয়তো আমাদের সন্তানের সাথে ভাল আচরণ করবেন না! তাই আমাদের সন্তানদের জন্য বিষয়টি খুবই জটিল, আমাদের জন্যও জটিল!

মাযহাব নিয়ে মুসলিমদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ নষ্ট করা ঠিক না

মাযহাবের অনেক বিষয়ই সুন্নাহ। এই কাজগুলো আল্লাহর রসূল ﷺ করেছেন। আমরা যদি এগুলো করি তাহলে রসূল ﷺ -কে অনুসরণ করা হবে এবং ইবাদতের কোয়ালিটি (গ্রহণযোগ্যতা) বাড়বে। আর না করলে ইবাদত কোয়ালিটি সম্পন্ন হবে না এবং রসূল ﷺ -কেও অনুসরণ করা হবে না। তবে সহীহ সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও কোন সুন্নাহকে অবজ্ঞা করা কিংবা ঘৃনা করা অবশ্যই গুনাহের কাজ।

তাই এই বিষয়গুলো নিয়ে দুই পক্ষেরই বাড়াবাড়ি করা মোটেও ঠিক নয়। তবে আমরা এতো কষ্ট করে ইবাদাত-বন্দেগী করছি তা সঠিকটা যাচাই-বাছাই করে নেয়া উচিত। আমরা বাজারে যখন কোন একটি জিনিস কিনতে যাই তখন কিন্তু ১০ দোকান ঘুরে যাচাই-বাছাই করে ভাল জিনিসটাই কিনি। তাই ইবাদাতের ক্ষেত্রে কেন যাচাই-বাছাই করে নেবো না? কেন অন্ধভাবে ওমুক হুজুর করে বলে আমিও করবো? আজকাল টেকনোলজির যুগ, যাচাই-বাছাই

করা খুব কঠিন কাজ নয়। তবে অন্ধভাবে ইসলাম মনে করে কোন কাজ (ইবাদত) করার ভয়াবহ পরিনাম হচ্ছে 'বিদ'আত'। যা আল্লাহর রসূল ﷺ করেন নাই তা ইবাদাতের অংশ মনে করে করলেই সেটা হবে সুস্পষ্ট বিদ'আত।

মাযহাব নিয়ে দুই দলে ঝগড়া মোটেও ঠিক নয়

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে হানাফী মাযহাবের ভাইয়েরা অন্যদেরকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখেন। 'লা-মাযহাব' তাদের কাছে ভদ্র ভাষায় একটা গালি। কোথাও কোথাও তা শত্রুতায়ও পরিণত হয়েছে। রসূল ﷺ -এর সহীহ নিয়মে সলাতের কথা উঠলে কেউ কেউ ক্ষেপে উঠেন, উচ্চস্বরে কথা কাটাকাটি করেন, এমনকি ঝগড়াও বাঁধিয়ে দেন। আমরা যখন দেশে বেড়াতে গিয়েছিলাম তখন আমাদের এক আত্মীয় আমাদেরকে রফউল ইয়াদাইন করতে দেখে এবং জোরে আমীন বলতে শুনে বললেন, 'এই ধরণের কাজ তাদের গ্রামে জোলারা করে'। জোলা হচ্ছে নীচু শ্রেণীর লোক। অথচ নিয়মটি রসূল ﷺ -এর। রসূল ﷺ -এর সলাতের সঠিক নিয়মগুলো আমাদের দেশে না জানার কারণে এবং প্রচলিত না থাকার কারণে তা হয়েছে আজ ঘৃণার কাজ। রসূল ﷺ -এর নিয়মে সলাত আদায় করলে অনেকে হেয় দৃষ্টিতে দেখেন!

মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাইঃ মহান আল্লাহ আল কুরআনে বলেনঃ

"মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা ভাইদের মাঝে শান্তি স্থাপন কর, আর আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা রহমত লাভ করতে পার।" (সুরা হুজুরাতঃ১০)

"হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেন না, যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন মহিলা অপর কোন মহিলাকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেক না; ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা তাওবা করেনা তারাই যালিম।" (সূরা হুজুরাত ঃ ১১)

"তোমরা নিজেদের মাঝে বিবাদ করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে [মনের দৃঢ়তা হারাবে]। তোমরা ধৈয্যধারণ করবে, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সংগে রয়েছেন।" (সূরা আনফালঃ ৪৬)

আমাদের দেশে বেনামাযীর সংখ্যা অধিক হওয়ার কারণ কী?

বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তানের অধিকাংশই হানাফী মাযহাবের অনুসারী
হানাফী মাযহাবের ফিক্‌হ অনুসারে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের রাকআত সংখ্যা ৪৬

ওয়াক্ত	সুন্নাত রাক'আত	ফরয রাক'আত	সুন্নাত রাক'আত	নফল রাক'আত	বিতর রাক'আত	মোট রাক'আত
ফযর	২	২	--	--	--	৪
যোহর	৪	৪	২	২	--	১২
'আসর	৪	৪	--	--	--	৮
মাগরিব	--	৩	২	২	--	৭
ঈশা	৪	৪	২	২	৩	১৫
মোট	**১৪**	**১৭**	**৬**	**৬**	**৩**	**৪৬**

১. হানাফী ফিক্‌হ অনুসারে বিভিন্ন ওয়াক্তে অতিরিক্ত সুন্নাত ও নফল সলাত যোগ করা হয়েছে যার ফলে সহীহ হাদীসে অনুমোদিত রাক'আতের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে এবং এতে মুসল্লিদের উপর অতিরিক্ত বোঝা সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই এত বেশী সলাতে আগ্রহী হয় না।

২. হানাফী ফিক্‌হ অনুসারে সলাতের আগে অযু করার সময় এবং প্রতিটি অংগপ্রত্যংগ ধোয়ার সময় আরবী ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন নিয়ত ও দু'আ পড়তে হয় যা সহীহ হাদীসে নেই, এগুলোই মুসল্লিদের নিকট বোঝা মনে হয়।

৩. হানাফী ফিক্‌হ অনুসারে প্রতি ওয়াক্তে প্রতিটি ধরণের সলাত (সুন্নাত, ফরয ইত্যাদি) শুরু করার আগে মুখে উচ্চারণ করে আরবী ভাষায় ভিন্নভিন্ন নিয়ত করতে হয়, যা হাদীসে নেই। এই নিয়ম অনেকের কাছেই কঠিন ও জটিল মনে হয়।

৪. অথচ আরবী ভাষায় এতসব কঠিন কঠিন নিয়ত ও দু'আ মুখে উচ্চারণ করতে হবে এমন কোন নির্দেশ রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সহীহ হাদীসের কোথায়ও নেই। এগুলো নূতন সংযোজন এবং বিদ'আত।

৫. অযু এবং বিভিন্ন ধরণের সলাতের জন্যে (সহীহ হাদীস বহির্ভূত) কঠিন কঠিন আরবী নিয়ত ও দু'আ অত্যাবশ্যক করায় মানুষের মনে সলাতের

প্রতি ভীতি সৃষ্টি হয়েছে। ফলে সলাত পড়তে অনেকেই উৎসাহ বা আগ্রহ বোধ করেন না।

৬. সহীহ হাদীসের মর্মানুসারে যারা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সলাত সময়মত আদায় করেনা তারা সবাই বেনামাযী, এমনকি যারা চার ওয়াক্ত সলাত আদায় করে তারাও বেনামাযী কারণ আল্লাহর হুকুম মত তারা পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করে না। আল্লাহর হুকুম অমান্য করার অপরাধে তারা অপরাধী। নামাযী ও বেনামাযীর সংজ্ঞা লোকজনদের বুঝিয়ে না বলার কারণে তারা অজ্ঞ থেকে যায়।

৭. কুরআনের সূরা রূম এর ৩১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ জানিয়েছেন যে আকিমুস সলাতা ওয়ালা তাকুনু মিনাল মুশরিকীন, (সলাত কায়েম কর, মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হয়োনা)। আল্লাহর নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সলাত (১৭ রাক'আত ফরয সলাত) যথাসময়ে ও যথারীতি আদায় না করলে মুসলিম থাকা যায় না [উক্ত কুরআনের আয়াত ও রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সহীহ হাদীস] একথা গুরুত্বসহকারে মুসলিমদের বুঝিয়ে না বলার কারণে তারা সলাতকে অবহেলা করে।

৮. ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী বেনামাযীর জানাযা পড়া নিষেধ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি জীবনে ঠিক মতো সলাত আদায় করেনি এবং এই অবস্থায় মারা গেছেন সমাজের লোকেরা তার জানাযার সলাত (নামায) পড়বে না, তাকে জানাযা ছাড়াই দাফন করতে হবে। এই সত্যটি আমাদের সমাজে মাওলানারা প্রচার করেন না এবং ইসলামের এই নিয়মটি পালনও করেন না। তাই সমাজে বেনামাযীর সংখ্যাও অধিক। যদি বেনামাযীর জানাযা পড়া না হতো তাহলে মান-সম্মানের ভয়ে হলেও মানুষ পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করতো। আমাদের অবস্থা এমন হয়েছে যে, মৃত্যুর পর জান্নাতে গেলাম কি জাহান্নামে গেলাম সেটা গুরুত্বপূর্ণ না, কিন্তু মৃত্যুর পর সমাজে মানুষের সামনে জানাযা ছাড়া দাফন করা হবে এটা মেনে নেয়া অপমানজনক।

৯. লোকজনকে বুঝিয়ে বলা হয়না যে ফরয, সুন্নত, ওয়াজিব এবং নফল সলাতের গুরুত্ব এক নয়, দৈনিক ১৭ রাক'আত ফরয সলাত সময়মত আদায় করতে পারলেই মুসলিম থাকা যাবে, তাতেই আল্লাহর হক আদায় হয়ে যাবে, শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। সুন্নাত আদায় করলে অধিক সওয়াব পাওয়া যাবে। আর নফল তো হলো অতিরিক্ত, পড়লে সওয়াব আছে, না পড়লে গুনাহ নেই।

১০. বহু রাক'আতবিশিষ্ট ওয়াক্তিয়া সলাতের ভয়ে লোকেরা সলাতের দু'আ, দুরূদও শিখতে উৎসাহী হয়না, এবং যেহেতু তারা দু'আ-দুরূদ জানে না, সেহেতু তারা সলাতই পড়তে চায় না।

১১. অন্যদিকে কাযা সলাত বলে কোন ওয়াক্তিয়া সলাত অন্য সময়ে আদায় করার কোন দলীল রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সহীহ হাদীসে নেই অথচ কাযা সলাত পড়া হানাফী ফিক্হ অনুসারে জাইয। এমনকি "উমরী কাযা" প্রথা অনুমোদন থাকায় সলাত আরো অধিক গুরুত্বহীন এবং অবহেলার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। ফলে সময়মত সলাত আদায় করার প্রতি মুসলিম নরনারী তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। "আচ্ছা এক সময় পড়ে নিলেই হবে" এমন একটা মনোভাব গড়ে উঠেছে মানুষের মনে।

১২. সলাত না পড়ার ক্ষতিপূরণ হিসেবে না-পড়া সলাতের জন্যে কাফ্ফারা (অর্থাৎ নির্দিষ্ট হারে অর্থদন্ড) দেয়ার প্রথা চালু করেছে হানাফী মাযহাবের ইমামগণ যা সম্পূর্ণরূপে রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাহ বহির্ভূত প্রথা। ফলে সলাত আদায় না করে কাফ্ফারা দিয়ে আল্লাহর হুকুমকে পাশ কাটাতে চেষ্টা করে লোকেরা।

১৩. লোকজনকে তওবা করার জন্য উৎসাহিত করা হয় না। সলাত না পড়ে গুনাহগার হলে আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত হয়ে খাঁটি দিলে তওবা করলে এবং অতঃপর নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করতে থাকলে আল্লাহ সেই বান্দাকে মাফ করে দিতে পারেন, একথা মানুষজনকে হুজুররা কখনো বুঝিয়ে বলেন না। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তওবার দরজা খোলা থাকে কারণ আল্লাহ তাঁর গুনাহগার বান্দাকে অনুতপ্ত হলে, ক্ষমা চাইলে, ক্ষমা করতে চান। তিনি তাঁর কুরআনে আশ্বাস দিয়েছেন।

১৪. হানাফী মাযহাবে অনেক জাল এবং দুর্বল হাদীস নিয়ে সলাতের নিয়ম-কানুন প্রচলিত আছে। যার কারণে রসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রকৃত সলাতের রূপ আমাদের এই উপমহাদেশে এতোটা পরিবর্তন হয়ে গেছে।

সুন্নাতি পোশাকের নামে মুসলিমদের মাঝে বিভ্রান্তি

সুন্নাতি পোশাক বলতে ইসলামে কিছু আছে কিনা তা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। কারণ এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের বাংলাদেশে মুসলিম সমাজে বেশ জটিলতা ও বিভ্রান্তি বর্তমান। কোন সহীহ হাদীসে এই সুন্নাতি পোশাক নিয়ে কোন আলোচনা বা নির্দেশ নেই। কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী ইসলামে পোশাকের বিষয়ে বলা হয়েছে যে পোশাকটি ঢিলেঢালা হতে হবে এবং যেন শরীরের গঠন অন্যের নিকট আকর্ষণীয় হয়ে ফুটে না উঠে। কিন্তু কুরআন অথবা হাদীসে কোথাও পোশাকের ডিজাইন বা দৈর্ঘ-প্রস্ত নিয়ে কোন কথা বলা হয়নি। এবার আরো বিস্তারিত জানা যাক।

টুপি ঃ সলাত আদায় করার সময় টুপি, পাগড়ি, পায়জামা, পাঞ্জাবী, লুঙ্গি ইত্যাদি কি অত্যাবশ্যক? আমরা অনেকে মনে করে থাকি যে টুপি সলাতের অংশ এবং টুপি ছাড়া সলাত আদায় হবে না। আবার দেখা যায় যে কারো মাথায় টুপি না থাকলে তারা ফরয মনে করে পকেটের রুমাল বের করে মাথায় পেঁচিয়ে নেন। এ সবই আসলে ভ্রান্ত ধারণা। আমরা যদি হাদীসে রসূল ﷺ - এর সলাতের পোশাক অধ্যায় দেখি তাহলে দেখবো যে, সেখানে পুরুষদের জন্য সলাতে পোশাক কতটুকু হতে হবে বা মহিলাদের জন্য কী হবে তার উল্লেখ আছে কিন্তু সেখানে কোথাও পুরুষদের টুপি অথবা পাগড়ির কথা নেই। তাই সলাত আদায়ে মাথায় টুপি ফরয নয়, সলাত আদায় টুপি ছাড়াও হবে। এবং একই নীতি পাগড়ি, পাঞ্জাবী, পায়জামা বা লুঙ্গির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য- এগুলোর উল্লেখ সহীহ হাদীসে পোশাক অধ্যায়ে বর্ণিত হয়নি। এসবই আঞ্চলিক পোশাক, এখানে সুন্নতি কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

আরেকটি বিষয়। আমরা বাংলাদেশীরা যে ধরণের টুপি পরি আল্লাহর রসূল ﷺ কি এই ধরণের টুপি পরতেন? বা আমরা যে ধরণের পাগড়ি পরি আল্লাহর রসূল ﷺ কি এই ধরণের পাগড়ি পরতেন? আল্লাহর রসূল একজন এরাবিয়ান ছিলেন, তাই তিনি জন্মের পর থেকেই এরাবিয়ান কালচার অনুসরণ করেই বড় হয়েছিলেন। আরবের ইতিহাস পড়লে দেখা যায় যে তৎকালীন সময়ে এরাবিয়ানরা ছিল বেদুঈন, তাদের সাধারণ পেশা ছিল পশু চারণ, পাহাড়ে-জংগলে শিকার করা, কৃষি কাজ করা এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মরুভূমি পাড়ি দিয়ে বাণিজ্য করা ইত্যাদি। এই ধরণের কাজ করতে গিয়ে তাদের মূলত ঘরের বাইরেই থাকতে হতো। মরু-ঝড় থেকে আত্মরক্ষার জন্য এবং প্রচন্ড রোদের তাপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা এক ধরণের headscarf

(মাথার আবরণী) ব্যবহার করতো এবং তা দিয়ে তারা মাথা ও মুখ ঢেকে রোদে চলা ফেরা করতো ।

আরেকটি মজার বিষয় হচ্ছে যে, এরাবিয়ানরা মাথায় স্কার্ফের উপর যে কালো বিড়া বাঁধে (বর্তমানে তাদের সরকারী অফিশিয়াল ড্রেস) তার ইতিহাস হচ্ছে ঃ এক সময় বেদুঈন আরবরা যখন মাঠে উট চড়াতো তখন ঐ উটের দড়ি লম্বা করে দিয়ে তার এক মাথায় ঐ বিড়া লাগিয়ে তা নিজ হাঁটুর মধ্যে ঢুকিয়ে বসে কোথাও বিশ্রাম নিতো বা ঘুমাতো এবং উট নিজে নিজে চড়ে ঘাস খেতো । ঐ একই কাজের উদ্দেশ্যে আমাদের দেশের রাখালরা গরুর খুঁটা ব্যবহার করে থাকে যেন গরু হারিয়ে না যায় ।

আমাদের বাংলাদেশীদের ধারণা যে আমরা যে ধরণের টুপি পরি হয়তো এটাই ইসলামী পোশাক । কিন্তু এই টুপি একেক দেশে একেক ধরণের, যেমন, ইসরাঈলে ইহুদীরা এক রকমের টুপি পরে, আফগানিস্তানের লোকেরা আরেক রকমের পরে, তুরস্কের লোকেরা আরেক রকমের পরে, আফ্রিকানরা আরেক রকমের পরে, ইন্দোনেশিয়ার লোকেরা আরেক রকমের পরে ।

পাগড়ি ঃ একই প্রশ্ন ঃ সলাত আদায়ে ইমাম সাহেবের জন্য কি পাগড়ি জরুরী? আমরা অনেকে মনে করে থাকি যে ইমাম সাহেব পাগড়ি পরবেন আর মুসল্লিরা টুপি পরবেন । আমাদের উপমহাদেশে এই পাগড়ি একটা শ্রেণীর নির্দিষ্ট পোশাকে পরিণত হয়েছে । যেমন পাগড়ি সাধারণত ইমাম সাহেব, পীর সাহেব, মাওলানা সাহেব বা মোয়াজ্জিন সাহেব পরে থাকেন । আমাদের বিশ্বাসের মধ্যেও এই বিষয়টি এমনভাবে ঢুকে গেছে যে আমরা ধরেই নিয়েছি যে এটি তাদের পোশাক, কিছুটা সেনা বাহিনীর র‍্যাংকের মতো । যা হোক এখানে কাউকে হেয় বা ছোট করা হচ্ছে না, শুধু বিষয়টা পরিষ্কার করার চেষ্টা করা হচ্ছে মাত্র ।

টুপির মতো পাগড়িও সলাতের জন্য জরুরী নয় এবং এই পাগড়ি যে কেউ চাইলেই পরতে পারে, এর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই । আমরা আরবের ইতিহাস থেকে জেনেছি যে এরাবিয়ানদের কালচারাল পোশাক কী ছিল । আমাদের ভারত উপমহাদেশে শিখরা পাগড়ি পরে । আর বিয়েতে তো দেখা যায় সব ধর্মের বর-ই পাগড়ি পরে, বরের পুরুষ আত্মীয়রাও বিয়ের দিন পাগড়ি মাথায় দেয় । এটা ধর্মীয় পোশাক নয়, স্থানীয় সামাজিক, কালচারাল বিষয় ।

পায়জামা-পাঞ্জাবী বা জুব্বা ঃ একই প্রশ্ন ঃ সলাত আদায়ের জন্য পায়জামা-পাঞ্জাবী বা জুব্বা কি জরুরী (অত্যাবশ্যক)? মরু-ঝড় থেকে আত্মরক্ষা করার

জন্য এবং প্রচন্ড রোদের তাপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য এরাবিয়ানরা যে হেডস্কার্ফ ব্যবহার করতো তা দিয়ে তারা মাথা ও মুখ ঢেকে রোদে চলা ফেরা করতো। ঐ একই কারণে তারা এক ধরণের জুব্বা (লম্বা ঢিলা পোশাক) ব্যবহার করতো, যা তাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রেহাই পেতে সাহায্য করতো, রোদের তীব্র তাপ থেকে রক্ষা করতো, শীত থেকে রক্ষা করতো। তাই তারা জুব্বা পরতো। আমরা জানি যে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে অনেক দেশেই মুসলিমদের পাশাপাশি প্রচুর খৃষ্টান-ইহুদী নাগরিক রয়েছে, তারা অমুসলিম, তাদের ভাষাও আরবী, তারাও ঐ এরাবিয়ান কালচারের পোশাক জুব্বা পরে থাকে, অর্থাৎ আরবে মুসলিম-অমুসলিম সকলেই একই পোশাক পরে। তাই একথা বলা যাবে না যে ঐ জুব্বা শুধু মুসলিমদের পোশাক বা ইসলামী পোশাক। সাহাবীরা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে অমুসলিম অবস্থায় যে পোশাক পরতেন মুসলিম হওয়ার পরও ঠিক ঐ একই পোশাক পরতেন। ইসলামের জন্য তাদের পোশাকের কোন পরিবর্তন হয়নি। ঐ সময় আবু লাহাব, আবু জাহিলও একই পোশাক পরতো। একই দৃশ্য আমাদের ভারত উপমহাদেশে। এই অঞ্চলে হিন্দুরাও পায়জামা-পাঞ্জাবী পরে, কিন্তু তাই বলে মুসলিমরা দাবী করে বলতে পারবো না যে ওরা ইসলামী পোশাক পরে। এখনো সারা পৃথিবীতে খৃষ্টান পাদ্রিরা সাদা রঙের জুব্বা পড়েন।

সুট-টাই ঃ বর্তমানে বাংলাদেশে এই সুট-টাই নিয়ে চলছে এক মহাবিতর্ক। প্রশ্ন করা হচ্ছে ঃ Peace TV-র ডা. জাকির নায়েক ইসলামের কথা বলেন অথচ তিনি সুট-টাই পরেন কেন? আমাদের অজ্ঞতার কারণে আমরা বিষয়টি সম্পর্কে সঠিকভাবে জানি না বা বিষয়টি নিয়ে কুরআন ও হাদীসের আলোকে কখনো গভীরভাবে চিন্তা করিনি বলেই এই প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের মধ্যে একটি বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছে যে ইসলামী পোশাক মানেই পায়জামা, পাঞ্জাবী ও জুব্বা, আর সুট-টাই মানেই হচ্ছে ইংরেজ খৃষ্টানদের ড্রেস। আমাদের অনুসন্ধান করে জানতে হবে যে এই পায়জামা, পাঞ্জাবী ও জুব্বা এবং সুট-টাই-এর ইতিহাস কী? কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে কী নির্দেশ আছে? ইসলামী পোশাকের বিষয়ে কুরআনের সূরা আহযাব ও সূরা নূরে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া আছে যে মুসলিম নারী ও পুরুষদের পোশাক হতে হবে ঢিলাঢালা, যেন শরীরের অংগ-প্রত্যঙ্গের গঠন অপরের চোখে ফুটে না উঠে। সেই হিসেবে পায়জামা, পাঞ্জাবী, জুব্বা, সুট-টাই সকল মুসলিমের জন্য উত্তম পোশাক।

ইসলামের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে, সুট-টাই মুসলিমদের আবিস্কার, এক সময় শীত নিবারণের জন্য তারা সুট-টাই ব্যবহার করতো। আমরা যারা সুট-

টাইকে অমুসলিমদের পোশাক বলে মনে করি তাদের ধারণাটা ঠিক না। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, টাই খৃষ্টানদের ধর্মীয় প্রতীক। এই কথাটা মোটেও ঠিক না। যেকোন কথা বললে তার দলিল থাকতে হবে, সেই কথার ভিত্তি থাকতে হবে। টাই এবং খৃষ্টানদের ক্রুশের মধ্যে ধর্মীয় সম্পর্ক রয়েছে এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা। টাই খৃষ্টানদের ধর্মীয় প্রতীক নয় এবং এ বিষয়ে খৃষ্টান আলেমরা কিছুই জানেন না, যেহেতু এর সাথে তাদের ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। আবার কেউ কেউ বলেন টাই দেখতে খৃষ্টানদের ক্রুশের মতো লাগে। এই ধরনের ধারণাও বোকামী, কারণ ক্রুশের মতো দেখতো তো অনেক কিছুই লাগে যা আমরা মুসলিমরা ব্যবহার করে থাকি, যেমন আমাদের হাফ-শার্ট, ফুল-শার্ট, টি-শার্ট, পাঞ্জাবী, জুব্বা, শেরোয়ানী, কোট, কামিজ, ব্লাউজ ইত্যাদি; এ সবই মেলে ধরলে দেখতে ক্রুশের মতো লাগবে, তাই বলে কি এগুলো খৃষ্টানদের ধর্মীয় পোশাক? মোটেও না। এমনকি একজন মানুষও দুই হাত মেলে দাঁড়ালে তাকেও ক্রুশের মতো লাগবে।

এই বিষয়গুলো নিয়ে যেন আমরা নিজেদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি না করি এবং বিষয়গুলো নিয়ে যেন বিতর্ক সৃষ্টি না করি। কেউ যেন মনে না করি যে এখানে টুপি, পায়জামা, পাঞ্জাবী, জুব্বা, পাগড়ি ইত্যাদিকে ছোট করা হচ্ছে। মোটেও তা নয়। কেউ যদি এগুলো পরতে চান, পরতে পারেন, কিন্তু এগুলো নিয়ে ধর্মীয় বাড়াবাড়ি করা মোটেও ঠিক নয়, এটাই এখানে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সুন্নাতি পোশাক বা ইসলামী পোশাক বলতে কুরআন বা হাদীসে কোন dress code অথবা বিধিবদ্ধ কোন নির্দেশ নেই। যা আছে তা আছে সূরা নূর (২৪) এবং সূরা আহযাবে (৩৩)। পোশাক হতে হবে শালীন, সুন্দর, উলংগতা বর্জিত, তা হতে হবে যৌন-উত্তেজনা সৃষ্টি থেকে মুক্ত, অনায়াসে পরিধানযোগ্য, এবং পোশাক যেন পরিধানকারীর মনে গর্বের সৃষ্টি না করে। পোশাকটা হতে হবে সুন্দর, কুৎসিৎ নয়, কারণ আল্লাহ কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন যে সলাতে তোমরা তোমাদের সুন্দর পোশাকটি পরে দাঁড়াবে। [সূরা আ'রাফ ৭ ঃ ৩১]

৫ বছরে মুসলিমদের ইসলাম ধর্ম ত্যাগের দৃশ্য

আমাদের নিজেদের বিবিধ অবহেলার কারণে, নিজেদের মধ্যে নানা বিষয়ে দ্বন্দ্ব এবং কোন্দলের কারণে, রাজনৈতিক রোশানলে পরে, অর্থনৈতিক অভাবে পরে ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার দৃশ্য শুধু বাংলাদেশে নয় আজ সারাবিশ্বেই দেখা যাচ্ছে। ইন্টারনেটে সার্চ দিলে বিভিন্ন রিসার্চ অর্গানাইজেশনের ভিন্ন ভিন্ন বছরের ডাটা পাওয়া যাবে। নিম্নে আমাদের মুসলিমদের ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার গত পাঁচ বছরের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো।

- শুধু আফ্রিকাতে প্রতিদিন ১৬,০০০ মুসলিম ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে এবং বছরে ৬ মিলিওন মুসলিম খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে।
- ইংল্যান্ডে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেছে ২০০,০০০।
- গত দুই বছরে ৫০,০০০ ইরানীয়ান মুসলিম ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে।
- মালয়শিয়াতে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেছে ২৫০,০০০।
- ফ্রান্সে প্রতি বছর ১৫,০০০ মুসলিম ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে।
- তার্কীতে প্রতি বছর ৩৫,০০০ মুসলিম ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে।
- কাজাকিস্তানে গত দুই বছরে ১০০,০০০ মুসলিম ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে।
- ইন্দোনেশিয়াতে প্রতি বছর ১০,০০০ মুসলিম ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে।
- রাশিয়াতে এ পর্যন্ত ২ মিলিয়ন মুসলিম ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে।
- এছাড়া প্রতি বছর ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশে হাজার হাজার মুসলিম ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে থাকে।

Appendix

অনেক কষ্টে পাওয়া ইসলাম

ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের অজানা কাহিনী

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

আজ এক শ্রেণী মুসলিম ঘরে জন্ম নিয়েও ইসলাম থেকে দিন দিন দূরে সরে যাচ্ছে! বর্তমানে আরেক শ্রেণী অমুসিলম ঘরে জন্ম গ্রহণ করেও বহু কষ্টে বহু ত্যাগ শিকার করে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত ইসলামের ছায়া তলে দলে দলে আসছেন এবং ইসলামের পতাকে সুউচ্চে তুলে ধরার কাজ করে যাচ্ছেন। মনে হচ্ছে মুসলিম দেশগুলো থেকে ইসলামের আলো আস্তে আস্তে নিভে যাচ্ছে আর পশ্চিমা দেশগুলো থেকে নতুন করে ইসলামের সূর্য উদয় হচ্ছে।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ
হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহর দ্বীন থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে এই কাজের সুযোগ করে দেবেন। তাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালবাসবে। তারা মু'মিনদের প্রতি হবে দয়ালু এবং কাফিরদের প্রতি হবে কঠোর। তারা সংগ্রাম করে যাবে আল্লাহর পথে। কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না- এটাতো হবে আল্লাহর অনুগ্রহ-তিনি যাকে চান এভাবে অনুগ্রহ প্রদর্শন করে থাকেন। তিনি তো সীমাহীন জ্ঞানের অধিকারী।" (সূরা মায়িদা ঃ ৫৪)

ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য দেখে ইউরোপিয়ান এক টুরিষ্ট-এর ইসলাম গ্রহণের বিরল ঘটনা

একজন ইউরোপিয়ান টুরিষ্ট টার্কিতে গিয়েছিলেন বেড়াতে। তিনি বিভিন্ন জায়গা ঘুরেফিরে দেখছেন। একদিনের ঘটনা। তিনি ঘুরতে ঘুরতে শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে চলে গেছেন। ঐ এলাকা ঘুরেফিরে দেখতে দেখতে দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তিনি এবার তার হোটেলে ফিরবেন কিন্তু শহরে যাওয়ার জন্য কোন ট্রান্সপোর্ট পাচ্ছিলেন না। পথে এক ব্যক্তির সাথে দেখা, তাকে জিজ্ঞেস করলেন কিভাবে শহরে যাবেন? উত্তরে জানতে পারলেন যে এ এলাকা থেকে শহরে যাওয়ার জন্য কোন গাড়ি সন্ধ্যার পর আর চলে না, এছাড়া এখান থেকে শহরে যাওয়ার জন্য অন্য কোন ব্যবস্থাও নেই। একমাত্র উপায় পরের দিন সকাল। যাহোক তিনি ঐ পথচারীকে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে রাত্রি যাপন করার জন্য হোটেল বা মোটেল কোথায়? কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় হলো যে ঐ এলাকায় কোন হোটেল বা মোটেলও নেই, যেটা আছে তাও অনেক দূরে যেখানে গাড়ি ছাড়া যাওয়াও সম্ভব নয়।

এবার তিনি মহাবিপদে পড়ে গেলেন। অপরিচিত জায়গা, কি করবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না। এদিকে রাতও ঘনিয়ে আসছিল। ঐ পথচারী ব্যক্তি তার অবস্থা বুঝতে পেরে টুরিষ্টকে বললেন 'আপনি চিন্তা করবেননা। আপনি আজ রাতটা আমার বাড়িতে থেকে যান, কাল সকালে গাড়ি চালু হলে আপনি আপনার হোটেলে ফিরে যাবেন, ইনশাআল্লাহ'। টুরিষ্ট এতে রাজি হয়ে ঐ পথচারীর বাড়িতেই গেলেন। সেই ব্যক্তি তাকে রাতের আপ্যায়ন করে তাকে ঘরে ঘুমানোর ব্যবস্থা করে দিল।

পরের দিন সকালের ঘটনা। টুরিষ্ট যখন বিদায় নিচ্ছেন তখন ঐ পথচারীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পরিবারের আর লোকজন কোথায়? কাউকে দেখছিনা যে? তখন তিনি আশ্চর্য হয়ে আবিস্কার করলেন যে, লোকটির স্ত্রী, দুই সন্তান এবং বৃদ্ধা মা, তারা সকলেই বাড়ির পেছনে একটি গাছের তলায় অবস্থান করছে এবং সারা রাত তারা সকলেই ঐ গাছের তলায় রাত্রি যাপন করেছে কারণ তাদের থাকার ঘর ঐ একটিই যা তারা ঐ টুরিষ্টকে ছেড়ে দিয়েছিল। এই দৃশ্য দেখে এবং ঘটনাটা শুনে টুরিষ্ট তাদের দিকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন এবং আবেগে তার চোখ দিয়ে পানি এসে গেল।

এবার টুরিষ্ট জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তোমাদের থাকার একমাত্র ঘর ছেড়ে দিয়ে তোমার স্ত্রী, কন্যা, পুত্র এবং বৃদ্ধা মাকে নিয়ে সারা রাত শীতের মধ্যে গাছের নিচে কাটিয়েছো, তুমি কেন এই কাজ করলে? তখন ঐ ব্যক্তিটি উত্তরে বললোঃ এই শিক্ষা আমাদের ইসলামের শিক্ষা। আমাদের প্রফেট মুহাম্মাদ ﷺ আমাদেরকে শিখিয়েছেন অতিথির সাথে কেমন আচরণ করতে হয়, তাদেরকে কেমন সম্মান করতে হয়।

এই ঘটনা দেখে ঐ অমুসলিম ইউরোপিয়ান টুরিষ্ট ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যান। অতঃপর সে নিজ দেশে ফিরে গিয়ে ইসলামকে জানার চেষ্টা করেন, আল কুরআন অধ্যয়ন শুরু করেন এবং তার পাশাপাশি ইসলামের উপর লিখিত অন্যান্য বই থেকে ইসলামকে জানতে থাকেন। অতঃপর একসময় তৈরী হয়ে যান ইসলাম গ্রহণ করার জন্য এবং আলহামদুলিল্লাহ অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ঐ টুরিষ্ট মুসলিম হওয়ার পর আজ তিনি সারা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে ইসলামের দাওয়াতী কাজ করে বেড়াচ্ছেন।

আরেকটি শিক্ষণীয় ঘটনা

একই রকম ঘটনা ঘটেছে আমাদের জীবনেও যা আমরা আমাদের বাংলাদেশী মুসলিম পরিবারদের জন্য শিক্ষণীয় হিসেবে তুলে ধরতে চাই যে ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য এখনও বিদ্যমান।

আমি আমির জামান ২০১৩ সালে সিংগাপুরে যাই দ্বীনের দাওয়াতী কাজের উদ্দেশ্যে। আমার এক দ্বীনি ভাই সপরিবারে দীর্ঘ দিন ধরে সিংগাপুরে সিটিজেন হয়ে স্থায়ীভাবে সেখানে বসবাস করছেন। তিনি রাত তিনটায় এয়ারপোর্টে গিয়ে আমাকে পিকআপ করেছেন এবং আবার ফিরার দিন এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি আমাকে হোটেলে উঠতে দেননি এবং আলহামদুলিল্লাহ, আরাম-আয়েশে তার বাসায় ছিলাম এবং তিনি আমাকে আথিতেয়তার কোথাও কোন কমতি করেননি যে কদিন সিংগাপুরে ছিলাম।

পরের বছরের ঘটনা। ২০১৪ সালে আবার দ্বীনের দাওয়াতী কাজে আমি আমির জামান অষ্ট্রেলিয়া যাই। এবার সাথে ছিল আমেরিকা থেকে আগত আমার বোনের ছেলে মোরশেদ। আমাদের অষ্ট্রেলিয়া যাওয়া এবং আসার পথে ট্রানজিট ছিল সিংগাপুর। পথে আমরা সিংগাপুরে কয়েকদিন ছিলাম। এবারও একই ঘটনা। আমাদেরকে হোটেলে থাকতে দেয়া হয়নি। আমরা ঐ ভাইয়ের বাসাতেই থাকি এবং খাওয়া দাওয়া করি।

তার পরের বছরের ঘটনা অর্থাৎ তৃতীয় বছর ২০১৫ সালে আমরা সপরিবারে (আমার স্ত্রী এবং কন্যাসহ) সিংগাপুর এবং মালয়েশিয়া যাই বেড়াতে। সেই সাথে আমাদের দাওয়াতী কাজের মিশন। এবারও একই ঘটনা। এবারও সেই ভাই আমাদেরকে রাত তিনটায় এয়ারপোর্টে গিয়ে তার বাসায় নিয়ে যান এবং তার বাসায় খুবই আরাম-আয়েশে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। আসার সাথে সাথেই আমাদের ডলার ভাঙ্গানোর আগ পর্যন্ত যেন চলাফেরার কোন অসুবিধা না হয় সেজন্য দু'শ সিংগাপুর ডলার হাতে তুলে দেন। এখানেই শেষ নয়। আমরা যেন কোথাও হারিয়ে না যাই সে জন্য একটি একটিভ সেলফোন দিয়েছেন এবং নিজেরা যখন একাকী ঘোরাঘুরি করবো তার জন্য তিনজনকে তিনটি প্রিপেইড এম.আর.টি কার্ড (বাস এবং ট্রেনের পাস) দিয়ে রেখেছেন।

মূল শিক্ষণীয় ঘটনা এখন বলছি। সিংগাপুর থেকে ফিরে আসার দিন ঐ ভাই আমাদেরকে এয়ারপোর্টে পৌছে দিবেন তার ঠিক আগ মুহূর্তে বাসা থেকে বের হওয়ার কিছুক্ষণ আগে আমরা (আমি এবং আমার স্ত্রী) একটা বিষয় আবিস্কার করলাম। বিষয়টি মূলতঃ এটা আমার স্ত্রীরই আবিস্কার। আর তা হচ্ছেঃ আমরা যে রুমটাতে এই এক সপ্তাহ ছিলাম সেটা ছিল ঐ ভাই-ভাবীদের নিজস্ব বেড রুম যেখানে এটাচ বাথ, এয়ারকন্ডিশনসহ আরো অন্যান্য সুবিধা রয়েছে। ভাই এবং ভাবী তাদের নিজেদের বেডরুম অতিথিদের জন্য ছেড়ে দিয়ে নিজেরা থেকেছেন ফ্লোরিং করে অন্যরুমে, যা আমরা চিন্তাও করিনি। একই ঘটনা তারা করেছেন প্রতিবারই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তারা আমাদেরকে বিষয়টি কোনভাবে বুঝতে দেননি, এমনকি আকার-ইংগিতেও না। যেমন আমি যখন প্রথমবার এসেছিলাম তখন ছিলাম একজন সিংগেল মানুষ, আমার একটি সাধারণ রুম হলেই তো হতো। কিন্তু তারা তা করেননি, তারা শুধু একজনেরই জন্যও তাদের নিজস্ব বেডরুম ছেড়ে দিয়ে ত্যাগ স্বীকার করেছেন। বিষয়টি আমার মাথায়ই আসেনি যে এ যুগে মানুষকে মানুষ এভাবে ভালোবাসতে এবং সম্মান করতে পারে। সুবহানাল্লাহ!

এখানে টার্কিতে টুরিষ্টের ঘটনা এবং সিংগাপুরে এই ভাই-ভাবীর ঘটনা দুটোই এসেছে রসূল ﷺ -এর যুগে সাহাবীদের থেকে। সেই সময়ে সাহাবীরা একে অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতেন পাল্লা দিয়ে, তাঁরা মানুষকে ভালবাসতেন নিঃস্বার্থভাবে। আমরা যদি সকলে এই দুই পরিবারের মতো হতে পারি তাহলে প্রতিটি সমাজে বিরাজ করবে শান্তি আর শান্তি। আমরা এই দুই পরিবারের আখিরাতে মুক্তির জন্য দু'আ করি।

এন্ড্রু নামে একজন ২৫ বছর ক্যানাডিয়ান যুবকের ইসলাম গ্রহণের শিক্ষণীয় ঘটনা

ঘটনাটি ২০০৬ সালের মাঝামাঝি দিকের। আমি আমির জামান টরন্টো শহরের ডাউনটাউনে একটি নতুন চাকরিতে যোগদান করি। কিছু দিনের মধ্যে অফিসের সবার সাথে মোটামুটি পরিচিত হওয়ার পর আমার অফিসে সকল সহকর্মীকে কুরআনের ইংরেজী অনুবাদসহ অন্যান্য কিছু ইসলামী সাহিত্য উপহার দেই। মাঝে মাঝে কথা প্রসংগে তাদের ইসলাম সম্বন্ধে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করি। এদের মধ্যে একজন ক্যানাডিয়ান যুবক (Andrew Habard) বেশ উৎসাহ বোধ করে। সে আরো বই পুস্তক পড়তে আগ্রহী হয়ে উঠে। ঘটনা দেখে আমি আরো সিরিয়াস হয়ে তার উপর দাওয়াতী কাজ করতে থাকি। এক সময় আমাদের বন্ধুত্ব বাড়তে থাকে। এন্ড্রু খুবই পড়ুয়া একটি ছেলে। অবাক করা কথা হচ্ছে সে সম্পূর্ণ আল কুরআন (ইংরেজী অনুবাদ) বেশ কয়েকবার A to Z পড়ে ফেলেছে। অথচ আমরা মুসলিমরা অনেকেই হয়তো কোন দিন পুরো কুরআন জীবনে একবারও পড়ে দেখিনি।

আরো আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এন্ড্রু সম্পূর্ণ কুরআন অনেকবার পড়ার কারণে বিভিন্ন আয়াত তার মুখস্ত হয়ে গেছে। কুরআনের বিভিন্ন জায়গা থেকে সে আমাকে নানা রকম প্রশ্ন করা শুরু করল। মাঝে মাঝে আমি নিজেই অবাক হয়ে যেতাম যে এই কথাও কুরআনে আছে। মনে হয় নতুন শুনলাম। তার অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতাম আবার অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতাম না। সে কুরআনের বিভিন্ন সূরার উদ্ধৃতি অনর্গল দিতে পারতো অথচ সে একজন অমুসলিম।

আলহামদুলিল্লাহ ইসলামকে জানার জন্য তার আগ্রহ অসীম। অতঃপর সে কুরআনের ব্যাখ্যা জানতে আগ্রহী হয়ে উঠলো। আমি তাকে কুরআনের এক সেট তাফসীর কিনে দিলাম সেই সাথে সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও রিয়াদুস সালেহীন হাদীস গ্রন্থ। এছাড়া তাকে দিলাম বেশ কিছু ডিভিডি লেকচার যেমন, ড. জাকির নায়েক, ড. বিলাল ফিলিপস, শেখ আহমেদ দিদাত, ড. ইউসুফ ইস্টেস ইত্যাদি।

তার সেল ফোনে এবং ল্যাপটপে কপি করে নিয়েছে আল-কুরআনের তিলাওয়াত এবং তার ইংরেজী অনুবাদ। যখনই সময় পায় সেল ফোন থেকে অর্থসহ কুরআন তিলাওয়াত শুনে। বাসায় যখন থাকে তখন জোরে জারে কুরআন

তিলাওয়াত বাজায় যেন পরিবারের অন্যান্যরাও তা শুনতে পায়। এভাবে বাসায় জোরে জোরে কুরআন তিলাওয়াত বাজাতে বাজাতে তার বোনও এক সময় তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরে। ভাইয়ের কাছ থেকে ইসলাম সম্পর্কে জানতে শুরু করে।

এক পর্যায়ে অবস্থার উন্নতি দেখে এন্ড্রু ইসলাম গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করে। এবং একদিন এসে আমাকে জিজ্ঞেস করে "আমি ইসলাম গ্রহণ করতে চাই এবং কোন সময়টা উপযুক্ত সময়?" পরের মাসই ছিল রমাদান মাস, তাই আমি তাকে মাস খানেক পর রমাদান মাসে বুঝেশুনে ইসলাম গ্রহণ করার পরামর্শ দেই। যুবকটি এতে ধৈর্য ধরে সেদিনকার মত চলে যায়।

কিন্তু কয়েকদিন পরই সে আবার আমার কাছে দৌড়ে আসে এবং আমাকে অবাক করে দিয়ে বলে "আমি কুরআন পড়ে যা বুঝেছি তা হলো আমি যদি রমাদান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে গিয়ে আজ বা কাল মারা যাই তা হলে আমি সোজা জাহান্নামে যাবো। আমার এতো দিনের ইসলামকে জানা ও বুঝার কোন মানে নেই, সব বৃথা। সুতরাং আর দেরী নয় আমি এক্ষুণি কালিমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করতে চাই।

আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রসুলুহু।

আলহামদুলিল্লাহ, রমাদান মাস আসার আগেই আমার ঐ ক্যানাডিয়ান কলিগ ঐ মুহূর্তে ইসলাম গ্রহণ করে আমার সাথে একসাথে যোহরের সলাত আদায় করে। অতঃপর রমাদান মাস আসলো, এন্ড্রু জীবনের প্রথম সিয়াম পালন শুরু করল। কী যে তার আনন্দ তা ভাষায় বলে প্রকাশ করা যাবে না। মাঝে মধ্যে আমরা একসাথে ইফতার করি। একসাথে সলাত আদায় করি।

আলহামদুলিল্লাহ, এন্ড্রু ব্রাজিলিয়ান এক মেয়েকে বিয়ে করেছে, তাদের সন্তান হয়েছে, স্ত্রী সন্তানদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করছে। তাদেরকে নিয়ে নানা ইসলামিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করছে। কয়েক বছর হলো এন্ড্রু ব্রাজিলে চাকুরি নিয়ে গেছে এবং সপরিবারে বর্তমানে সেখানেই রয়েছে। আমাদের সাথে মাঝে মাঝেই যোগাযোগ করে এবং ইসলামের উপর বিভিন্ন বইপত্র চেয়ে ইমেইল করে।

ব্রিটিশ মহিলা সাংবাদিকের মুসলিম হওয়ার ঘটনা

এটি আফগানিস্তানের একটি ঘটনা। আমেরিকা-ব্রিটিশ সেনারা যখন আফগানিস্তান দখল করে আছে সেই সময়ের একটি সত্য ঘটনা সারা পৃথিবীতে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। তালেবান বাহিনী Yvonne Ridley নামে এক ব্রিটিশ মহিলা সাংবাদিককে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং বেশ কিছুদিন তাকে তাদের নিষিদ্ধ এলাকায় একটি বাড়িতে গৃহবন্দি করে রাখে।

ঐ ব্রিটিশ মহিলা সাংবাদিক যখন তালেবানদের হাত থেকে মুক্তি পান তখন তিনি ব্রিটেনে ফিরে গিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি কেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন এবং অপহরণ অবস্থায় যে দিনগুলি তিনি মুজাহিদদের সাথে সম্মানের সাথে অতিবাহিত করেছিলেন তার উপর তিনি একটি বই লিখেছেন যা প্রথম প্রকাশের সাথে সাথেই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলামের উপর সেমিনার করে বেড়াচ্ছেন। মুজাহিদরা যখন Yvonne Ridley-কে মুক্ত করে দেন তখন তাকে একটি ছোট্ট শর্ত দিয়ে দিয়েছিলেন যে, সে যেন ব্রিটেনে ফিরে গিয়ে আল কুরআনুল কারীমকে একবার পড়েন। তিনি ফিরে এসে শর্তানুযায়ী গোটা কুরআনের ইংলিশ ট্রান্সলেশন পড়েছিলেন। সেই Yvonne Ridley-র একটি ঘটনা এখানে শিক্ষণীয় হিসেবে তুলে ধরছি। তিনি তার বইয়ে বর্ণনা করেছেন তার নিজ চোখে দেখা Beauty of Islam। তিনি দেখেছেন মুসলিম মহিলাদের পর্দার বাস্তব রূপ। তিনি দেখেছেন মহিলাদের সম্মান। তিনি দেখেছেন মুসলিমদের পবিত্র চরিত্র, প্রকৃত সৎব্যবহার ইত্যাদি।

একদিন ঐ ব্রিটিশ মহিলা গোসলের পর তার ব্রা বাড়ির উঠানে একটি দড়ির উপর রোদে শুকাতে দিয়েছেন। এক সময় মুজাহিদ বাহিনীর লীডার এসে তাকে পরামর্শ দিলেন যে এভাবে খোলা জায়গায় পরপুরুষের সামনে তার ব্রা রোদে না দেয়াই উচিত। কারণ পুরুষরাতো মানুষ, আর শয়তানের প্ররোচণায় মানুষ ভুল করতে পারে। তাই তার এই undergarment দেখে কারো মনে খারাপ চিন্তা আসতে পারে এবং তার প্রতি কারো আকর্ষণ জাগ্রত হতে পারে।

এখানে শিক্ষণীয় যে, মহিলাদের পর্দার বিষয়টা কত সূক্ষ্ম এবং গুরুত্বপূর্ণ। একজন মহিলার অনেক দিক চিন্তা করতে হয়, আল্লাহ তাকে এতো দিক দিয়ে গুণ দিয়েছেন যে, যে কোন একটি দিক দেখেই পরপুরুষ আকর্ষণ বোধ করতে

পারে। আর একজন মহিলার কোন কিছু দেখে যদি কোন পরপুরুষ আকর্ষণ বোধ করে বা মনে মনে খারাপ চিন্তা করার প্রয়াস পায় তাহলে তার জন্য আখিরাতের ময়দানে ঐ মহিলাকেই সর্বপ্রথমে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে।

আরো একটি শিক্ষণীয় ঘটনা। তালেবানদের ঐ টিমে কোন মহিলা ছিল না। Yvonne Ridley-কে যখন তারা খাবার দিত তখন কোন পুরুষ তার দিকে চোখ তুলে কখনো তাকাতো না। তিনি যে কদিন সেখানে বন্দি ছিলেন কোন পুরুষই তার সাথে খারাপ আচরণ করেনি। খারাপ দৃষ্টিতে দেখা তো দূরের কথা তার দিকে কোন দিন চোখ তুলে তাকাই নি।

এখানে শিক্ষণীয় যে, তারা Yvonne Ridley-কে নানাভাবে নির্যাতন করতে পারতো, তার শ্লীলতাহানী করতে পারতো, কিন্তু তারা তার কিছুই করেনি বরং সর্বত্রই ভাল আচরণ করেছেন যা ইসলামে নির্দেশ দিয়েছে। অথচ দেখা যায় আমেরিকান আর্মি, নেভী এবং এয়ারফোর্সের মধ্যে পুরুষ সোন্যদের দ্বারা নারী সোন্যরা নানা রকম সেক্সুয়াল হেরাজমেন্ট হচ্ছে। রেপ হওয়ার কথাতো পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই দেখা যায়।

Yvonnne Ridley সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য তার ওয়েবসাইট দেখতে পারি ঃ

http://yvonneridley.org/

(Yvonnne Ridley British-born, award-winning Journalist, Broadcaster, Human Rights Activist)

কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ক্যানাডিয়ান এক যুবকের মুসলিম হওয়ার ঘটনা

টরন্টোতে শরীফ ভাই নামে আমাদের একজন দ্বীনি ভাই ও তার স্ত্রী গত সপ্তাহে (২০০৮ অক্টোবরের শেষের দিকে) একটি ইসলামিক গিফট কেনার জন্য একটি ইসলামী বইয়ের দোকানে গিয়েছিলেন। দোকানটি এখনো খুলেনি বিধায় তারা দোকানের সামনে অপেক্ষা করছিলেন এবং শরীফ ভাই লক্ষ্য করলেন সেখানে একটি নন-মুসলিম যুবকও অপেক্ষা করছে। শরীফ ভাই উৎসাহিত হয়ে তার কাছে জানতে চাইলেন 'তুমি এখানে কেন এসেছো?' সে প্রতি উত্তরে বলল সে এসেছে ইসলামের উপর কিছু বই কিনতে এবং সে মাঝে মধ্যেই এখানে আসে ইসলামের উপর বই, সিডি, ডিভিডি ইত্যাদি কিনতে। তারপর সে শরীফ ভাইকে জিজ্ঞেস করল 'তুমি কি মুসলিম?' শরীফ ভাই উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। তারপর সে দ্বিতীয় প্রশ্ন করল যে 'তুমি কি কুরআন পড়?' শরীফ ভাই উত্তরে বললেন, হ্যাঁ মাঝে মাঝে পড়ি। তখন ছেলেটি অবাক হয়ে বলল 'তুমি মুসলিম হয়ে কুরআন মাঝে মাঝে পড়? আমি তো কুরআন প্রতিদিন পড়ি।' তখন শরীফ ভাই এবং ভাবী তার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন এবং ভাবীর চোখে পানি এসে গেল। কারণ একজন নন-মুসলিম আজ তাদের চোখ খুলে দিল, তাদেরকে তাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। শরীফ ভাই তখন তার কাছে জানতে চাইলেন 'তুমি নন-মুসলিম হয়ে কেন কুরআন পড়ছো, ইসলামের উপর কেনইবা পড়াশোনা করছ?' এবং সেও নির্দ্বিধায় তার বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করল।

ছেলেটার নাম ডেভ, তার গার্লফ্রেন্ড তাকে ব্ল্যাক ম্যাজিক করেছিল, ক্যানাডিয়ান ডাক্তাররা কিছুতেই রোগ সারাতে পারছিলেন না এবং রোগটাও ধরতে পারছিলেন না। এতে ডেভ নিজে এবং তার পরিবারের সকলেই খুবই হতাশ হয়ে পড়েছিল। যাহোক, সে একদিন কোন এক মুসলিম ভাইয়ের নিকটে গিয়ে তার অসুখের কথা বলল এবং ঐ মুসলিম ভাই তাকে কুরআনের কিছু আয়াত পড়ে তার শরীরে ফুঁ দিয়ে দিলেন এবং আস্তে আস্তে সে কিছুটা সুস্থতাবোধ করতে লাগল এবং রোগ মুক্ত হতে লাগল। তখন সে ঐ মুসলিম ভাইয়ের নিকট আবার ফিরে গিয়ে জানতে চাইলেন তুমি কী পড়ে আমাকে ফুঁ দিলে আর আমি সুস্থ হতে থাকলাম? উত্তরে ঐ ভাই কুরআন খুলে তাকে দেখালেন যে সে সূরা বাকারার কিছু অংশ পড়েছিলেন। যাহোক ঘটনা এখানে শুরু।

সে দিন দিন সুস্থতার দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করল। এবার ডেভিডের মনে প্রশ্ন জাগলো এই বইয়ের মধ্যে কী এমন আছে যে তাকে সুস্থ করে তুলছে! তখন থেকে সে কুরআনের অর্থ পড়া শুরু করল এবং কয়েকবার গোটা কুরআনটা পড়ে ফেলল এবং মহান আল্লাহর কথাগুলো বুঝার চেষ্টা করতে লাগল। কুরআন এবং ইসলামকে বুঝার জন্য সে আরো ব্যাকুল হয়ে গেল এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে ইসলামের উপর প্রচুর বই-পত্র সংগ্রহ করে পড়তে লাগল। বাসায় নিয়মিত ইন্টারনেট থেকে সে ইসলামের উপর জ্ঞান অর্জন করে, কুরআন পড়ে এবং তিলাওয়াত শুনে, এভাবে তার পরিবারের উপরও ইসলামের প্রভাব পড়তে থাকে। সে এভাবে তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করছিল যে, সে যখন কুরআন পড়ে তখন সে শরীরের মধ্যে এক রকম পাওয়ার অনুভব করে, সেই সময় তার কাছে মনে মনে হয় আশেপাশের সবকিছু কেমন যেন অন্যরকম। যাহোক পড়াশোনা করতে করতে ইতিমধ্যে ডেভের কিছু প্রশ্নও জমা হয়ে যায়। তখন শরীফ ভাই তাকে তার বাসায় আমন্ত্রণ জানালেন এবং ক্যানাডায় বসবাসরত এক সৌদি স্কলারেরর কাছে নিয়ে গেলেন ডেভের জমানো প্রশ্নে সঠিক উত্তরের জন্য। আলহামদুলিল্লাহ, ঐদিনই ডেভ, শরীফ ভাই এবং ঐ স্কলারের নিকট ইসলাম (শাহাদাহ) গ্রহণ করে এবং তাদের সাথে একসাথে আসরের সলাত আদায় করে। আলহামদুলিল্লাহ, সেদিন থেকে শরীফ ভাইও প্রতিদিন নিয়মিত কুরআন পড়া শুরু করেছেন এবং আল্লাহর কথাগুলো বুঝার চেষ্টা করছেন এবং সেই সাথে জীবনে তা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করছেন।

এটা গেল একজন নন-মুসলিমের মুসলিম হওয়ার ঘটনার প্রথম ধাপ। এবার হচ্ছে দ্বিতীয় ধাপ। সে এখন আমাদের দ্বীনি ভাই এবং একজন মুসলিম। তার প্রতি আমাদের এখন আরো দায়িত্ব বেড়ে গেছে আর তা হচ্ছে তাকে সঠিক ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। যদি সে আমাদের অবহেলার কারণে এই বিষয়ে সহযোগিতা না পায় তাহলে আমাদেরকে মহান আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। বিষয়টা শুধু 'ওয়ান ওয়ে' নয় অর্থাৎ তাকেও (ডেভিডকেও) জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হবে। কারণ দ্বীন ইসলামের জ্ঞান অর্জন প্রত্যেকটি মুসলিম নরনারীর জন্য ফরয।

শিক্ষণীয় হিসেবে আমরা ডেভের ঘটনায় আবার ফিরে যাই। ডেভ সর্বপ্রথমে কুরআনের কিছু আয়াতের ঝাড়ফুঁকের মিরাকল দেখে কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। আসলে এই ঝাড়ফুঁকের উসিলায় আল্লাহ তাকে কুরআনের সংস্পর্শে এসে কুরআন বুঝার সুযোগ করে দিয়েছেন। কিন্তু মূলতঃ সে ঝাড়ফুঁকের জন্যই

ইসলাম গ্রহণ করেনি। সে গোটা কুরআনের অর্থ কয়েকবার পড়েছে এবং আল্লাহকে চেনার জন্য ইসলামের অন্যান্য বইপত্র পড়েছে, তারপর আল্লাহর দেয়া শ্রেষ্ঠ জীবন বিধান ইসলামকে বুঝেছে তাই শাহাদাহ নিয়েছে।

আমরা যেন এই ভুল ধারণা না করি যে আল কুরআন নাযিল হয়েছে ঝাড়ফুঁকের জন্য! হ্যাঁ কুরআনের কিছু আয়াত যেমন - সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরছি (সূরা বাকারার অংশ), সূরা ইখলাস, সূরা কাফিরূন, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস ইত্যাদির দ্বারা কিছু ঝাড়ফুঁক করা যেতে পারে যা রসূল ﷺ সহীহ হাদীসে বলে গেছেন। আরো একটি বিষয় মনে রাখতে হবে ঝাড়-ফুঁকের মধ্যে কোন পাওয়ার নেই, আরোগ্য শুধু আল্লাহই দিতে পারেন। কিন্তু কুরআন নাযিলের মূল উদ্দেশ্য ঝাড়ফুঁক নয়। আল কুরআন সত্যিই মিরাকল কিন্তু সেই মিরাকল হচ্ছে এটা গোটা মানব জাতির জন্য হিদায়াত (Guideline for whole mankind). এতে রয়েছে ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রিয় জীবন এবং আন্তর্জাতিক জীবন পরিচালনার constitution। যাকে বলা হয় Complete code of life বা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান।

বুঝার সুবিধার্থে আর একটি উদাহরণ দেয়া যাক। কেউ একজন খুব মনোযোগের সাথে একটি বই পড়ছে, হঠাৎ তার কানের ভিতর চুলকাচ্ছে তখন সে তার চোখ থেকে চশমাটি খুলে চশমার ডাঁটি দিয়ে কানটি চুলকালো। এতে অবাক হয়ে সে লক্ষ্য করল যে চশমার ডাঁটি দিয়ে ভালইতো কান চুলকানো যায়। এবার সে চশমার দোকানে গিয়ে বলল ভাই আমাকে কয়েকটা চশমা দিনতো, আমি কান চুলকাবো ! হ্যাঁ, প্রয়োজনে চশমার ডাঁটি দিয়ে কান চুলকানো যায় ঠিকই কিন্তু চশমা আসলে কান চুলকানোর জন্য তৈরী করা হয়নি, চশমা তৈরী হয়েছে চোখে দেয়ার জন্য। ঠিক তেমনি আল কুরআনের কিছু আয়াত দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা যায় ঠিকই কিন্তু আল কুরআন আসলে ঝাড়ফুঁকের জন্য পাঠানো হয়নি। আল কুরআন এসেছে মানুষের জীবনকে পরিবর্তন করার জন্য। এতে লিখা আছে আমরা কী করবো আর কী করবো না। এই কুরআনের সংস্পর্শে এসে ১৪০০ বছর আগে আরব দেশের হাজার হাজার বর্বর মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় আজ এই কুরআন ব্যবহৃত হচ্ছে মৃত ব্যক্তিদের জন্য, জীন-ভুত তাড়ানোর জন্য, তাবিজ-কবজ করার জন্য, চাল পড়া দেয়ার জন্য আর অর্থ না বুঝে তিলাওয়াত করার জন্য!!

ইংল্যান্ডের বিখ্যাত পপ সিংগার "ক্যাট স্টীভেনস" কিভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন

ব্রিটেনের বিখ্যাত পপ সিংগার "ক্যাট স্টীভেনস" কিভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তা আমরা অনেকেই জানি। তিনি তার জীবনের এক অশান্তিময় মুহূর্তে কুরআনের একটা অনুবাদের কপি পেয়ে পড়া শুরু করেছিলেন। পড়তে পড়তে এক সময় তিনি এই বইয়ের লেখক কে তা খুঁজতে শুরু করলেন, তিনি অনুবাদকের নাম দেখতে পেয়েছেন কিন্তু লেখকের নাম কোথাও খুঁজে পাননি। যাহোক, এই বইয়ের লেখককে খুঁজতে গিয়ে তিনি এমন এক লেখকের সন্ধান পেলেন যিনি হলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন। আর সে জন্য তিনি সেই লেখক মহান আল্লাহর নিকট মাথা নত করে স্বীকার করে নিয়েছিলেন "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ"। এই ক্যাট স্টীভেনস (বর্তমানে ইউসুফ ইসলাম) আজ ইউরোপের একজন বিখ্যাত ইসলামিক স্কলার। তিনি তার এক বক্তৃতায় বলেছেন যে, 'আমি আজ যে মুসলিমদের সাথে উঠাবসা করছি তাদের সাথে যদি আমার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে দেখা হতো তাহলে হয়তো আমার আর ইসলাম গ্রহণ করা হতো না। কারণ আমি ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে কুরআনের দেখা পেয়েছি, কুরআন পড়েছি, বুঝেছি তারপর ইসলাম গ্রহণ করেছি। কিন্তু আজ যাদের সাথে আমি উঠা-বসা করছি তাদের চরিত্রের সাথে আমি কুরআনের কোন মিল পাচ্ছি না'।

ক্যাট স্টীভেনস এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি পাশ্চাত্যের চাকচিক্যময় পপ জগত ছেড়ে খৃস্ট ধর্ম বদলে শান্তির ধর্ম ইসলামের ছায়াতলে নিজের আশ্রয় খুঁজে নিয়েছেন। তাই প্রতিপদে তাকে মুখোমুখি হতে হচ্ছে নানা প্রতিকূলতার। তবু তার জনপ্রিয়তা কমেনি একদমই। চালিয়ে যাচ্ছেন ইসলামের সৌন্দর্য প্রচারে নিরলস কর্মযজ্ঞ।

"এটি আল্লাহর হিদায়াত। তিনি এর মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ দেখান। (সূরা আন'আম ঃ ৪৪)

ইসলাম পালনের সাথে প্রগতি, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা, জীবনে উন্নতি, নারী স্বাধীনতা ইত্যাদি সাংঘর্ষিক -- এমন ভ্রান্ত ধারণা প্রায়ই শোনা যায়। কোন ধর্মই অশান্তির কথা বলে না। ধর্ম চায় মানুষ সামাজিক নিয়মের মধ্যে থেকে স্রষ্টাকে মেনে চলুক। কিন্তু নিজের এবং স্ব-গোষ্ঠীর হীন স্বার্থ পূরণের জন্য ধর্ম অপব্যবহার হয়ে আসছে, যুগে যুগে -- এখনও। কলুষিত হচ্ছে ধর্ম। ইউসুফ

ইসলামের জীবনী পর্যালোচনা করে দেখা যাবে, সঠিকভাবে ধর্ম-কর্ম পালন করেও সফল, পরোপকারী, আধুনিক মানুষ হিসেবে নিজেকে বদলে নেয়া যায়।

আঁধার থেকে আলোর পথে ঃ ১৯৭৬ সালের ছোট একটি দূর্ঘটনা বদলে দেয় তার সারাটা জীবন। ঘটনার দিন আমেরিকার ম্যালিবু বিচে সাতার কাটতে যেয়ে প্রায় ডুবতে বসেছিল। তখন সে মৃত্যু ভয়ে চিৎকার করে উঠে, "Oh God! If you save me I will work for you." বলতে না বলতেই অপ্রত্যাশিত উল্টো একটি ঢেউ তাকে তীরে আছড়ে ফেলে! এই ঘটনার পর থেকে ক্যাট স্টিভেন্সের মনে আমূল পরিবর্তন আসে। পাশ্চাত্যের জড়বাদী জগতের পিছনে না দৌড়ে মনের শান্তি এবং আধ্যাত্মিক সত্যানুসন্ধানের দিকে ঝুঁকে পরেন। শুরুতে বৌদ্ধ ধর্ম, জেন, রাশিফল, অ্যাস্ট্রলজি, নিউমারলজি, টেরট কার্ড ইত্যাদি তুলনামূলক বোঝার চেষ্টা শুরু করেন।

আবার স্টিভেন্সের ভাই ডেভিড গর্ডন জেরুজালেম ঘুরতে যেয়ে ভাইয়ের জন্য একটি পবিত্র কুরআন নিয়ে আসেন। এমন সময় ছুটিতে স্টিভেনস মরোক্কো ঘুরতে যেয়ে প্রথম আজানের ধ্বনি শুনতে পেয়ে অভিভূত হয়ে পরেন। জানতে চান, "এটা কিসের শব্দ?" উত্তরে জানতে পারেন, "এটা আজান, ঐশ্বরীয় বার্তা। যার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তাকে ডাকতে মুসলিমদের মসজিদ মুখে আহ্বান করা হয়।" স্টিভেন্স ভাবেন, জীবনে টাকার জন্য গান করতে শুনেছি, গান হয়েছে খ্যাতির জন্য.. ক্ষমতা.. কিন্তু ঐশ্বরিক গান? জীবনেও শুনি নি! অসাধারণ কনসেপ্ট! বলা যায় এই ভ্রমণটি ছিল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পথে তার শেষ পদক্ষেপ। সেই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৭ সালের ক্যাট স্টিভেন্স তেইশ ডিসেম্বর খৃস্টান ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। নিজের নাম 'ক্যাট স্টিভেন্স' পরিবর্তন করে 'ইউসুফ ইসলাম' রাখেন। পবিত্র কুরআন শরীফের ইউসুফ নাবীর কাহিনী পড়ে এই নামটির প্রতি তার বিশেষ দুর্বলতা তৈরি হয়।

ইসলাম ধর্ম প্রচারে অবদান ঃ বর্তমানে ইংল্যান্ডে মুসলিম কমিউনিটিতে ইউসুফ ইসলাম জনপ্রিয় একজন ব্যক্তিত্ব। মূলত তিনটি মৌলিক ক্ষেত্রে তিনি নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন ঃ

১) শিশুদের ইসলাম শিক্ষা ঃ ১৯৮৩ সালে মাত্র ৩ থেকে চার বছর বয়সের ১৩ জন শিক্ষার্থী নিয়ে লন্ডনে Islamia Primary School প্রতিষ্ঠা করেন। অসাধারণ ব্যাপার সে বছরেই অতিরিক্ত শিক্ষার্থীর আবেদনের ভীড়ে অপেক্ষামান শিক্ষার্থীর সংখ্যা এক হাজার ছাড়িয়ে যায়! ১৯৮৯ Islamia Girls Secondary School প্রতিষ্ঠা করে অভূতপূর্ব সাফল্য পান। GCSE

examination level-এ এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা গড়ে ফলাফল সবার চাইতে ভাল হয়। যা ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক নতুন ধারণা, মানদণ্ডের ভীত তৈরি করে। ইউসুফ ইসলাম Brondesbury College নামের আর একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন। এখানে মূলতঃ স্কলারশিপ নিয়ে ছাত্ররা ইসলামী শিক্ষার আলোকে পড়াশোনা করে থাকে। তাদের ঈর্ষণীয় রেজাল্ট দেখলে ধারণা করা যায় তাদের সাফল্য।

ইউসুফ ইসলাম United Kingdom Islamic Education Waqf (UKIEW) প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। এ প্রতিষ্ঠান মূলত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকে। তিনি Association of Muslim Schools-এর ও চেয়ারম্যান। যারা সমগ্র ইংল্যান্ডে সকল ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অর্থ, তথ্য, শিক্ষা, ট্রেনিং ইত্যাদি দিয়ে থাকে। ১৯৯২ সালে ইংল্যান্ডে তার তত্ত্বাবধানে Waqf Al-Birr Educational Trust নামের একটি চ্যারিটি প্রতিষ্ঠান নথিভুক্ত হয়। এই প্রতিষ্ঠান ইসলাম প্রচারে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠা এবং গবেষণার কাজও করে থাকেন তারা। ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (মুসলিম/অমুসলিম) তারা International Board of Educational Research and Resources (IBERR) সাথে নিয়ে বিষয় ভিত্তিক ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োগ, ট্রেনিং, শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করে থাকে।

২) ইসলামের দাওয়াত ঃ ১৯৯৪ সালে ইউসুফ ইসলাম Mountain of Light প্রতিষ্ঠা করেন। সংস্থাটি মূলতঃ ইসলাম ধর্ম বিষয়ক দাওয়াতি তথ্য উপকরণ, প্রচারের বিভিন্ন মাধ্যম তৈরি করে থাকে। যেমন, মাল্টিমিডিয়া অডিও-ভিডিও ক্যাসেট, সিডি, ডিভিডি। এখান থেকে রিলিজ পায় Life of the Last Prophet। অ্যালবামটি ইন্সট্রুমেন্ট একদমই ব্যবহার হয়নি। এটা ২০ বছর মিউজিক ইন্ড্রাস্ট্রিস থেকে দূরে থাকার পর তার প্রথম অফিসিয়াল রিলিজ। তাদের নতুন রিলিজ A Is for Allah। ইসলাম শিক্ষা বিষয়ক ডাবল অ্যালবাম।

৩) বিশ্বের সুবিধা বঞ্চিত মানুষদের পাশে ঃ Muslim Aid একটি আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা। ১৯৮৫ সালে ইউসুফ ইসলাম সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেন। পৃথিবীর অন্যান মুসলিম সাহায্য সংস্থার সাথে মিলিতভাবে তারা তাদের কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থাটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ এবং প্রাকৃতিক বিপর্যস্থ মানুষদের সাহায্য করে থাকে। এযাবৎ কালে প্রায় চার লক্ষ মানুষকে

তারা প্রত্যক্ষ সাহায্য করেছে। এছাড়া এতিম শিশু এবং দুস্থ পরিবারদের বিভিন্ন সাহায্য দিয়ে থাকে। আফ্রিকা, ইরাক, ইন্দেনেশিয়া এবং কসোভোতে হাজার হাজার দুস্থ পরিবার এবং এতিম শিশুকে পুনর্বাসন করেছে। বাংলাদেশে অনেকদিন ধরে এই সংস্থাটি বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। 'ক্যাট স্টিভেনস মিউজিক' হতে বছরে আয়কৃত প্রায় দের মিলিয়ন ডলার পুরোটা ইসলাম প্রচার প্রসার এবং বিভিন্ন ত্রাণ কার্যে দান করে থাকেন। ইউসুফ ইসলাম Forum Against Islamophobia And Racism (Fair) নামের ফোরামের হয়ে ইসলাম ভীতি এবং বর্ণবাদ (Islamophobia and Racism)-এর বিরুদ্ধে সর্বদা একটি সোচ্চার গলা। ভিন্ন বর্ণ-ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া নানা বৈষম্যমূলক নীতি, আইনের বিরুদ্ধে তারা কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ভ্রমণ ঃ UNICEF-এর বিশেষ দূত হয়ে ক্যাট স্টিভেন্স যুদ্ধ বিধ্বস্থ বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, পটুয়াখালি, ভোলা, রংপুর ইত্যাদি স্থানে ঘুড়ে বেড়িয়েছেন। দেশের ধনী ও গরীব শ্রেণীর বৈষম্য এবং রাজনীতির দৈন্যতা তার ভালই চোখে পরেছে!

হিজাব বিতর্ক ঃ জার্মানে The Echo music award অনুষ্ঠানে life achievements as musician and ambassador between cultures নিতে যেয়ে ইউসুফ ইসলামের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ ওঠে যে, সে নিজের স্ত্রী ছাড়া হিজাব না পরা অন্য কোন নারীর সাথে কোন প্রকার কথা/ভাব আদান প্রদান করেন না! সে কারণে ইউসুফ ইসলামের প্রতিনিধি নাকি আগেই জানিয়েছে, কোন নারী উপস্থাপিকা থাকলে ইউসুফ ইসলাম সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবেন না। World Entertainment News Network এর পক্ষে Contactmusic.com (প্রতি মাসে প্রায় বাইশ লক্ষ্য বার হিট) এ প্রকাশিত এক আর্টিক্যালে এই অভিযোগ জোরেসোরে ওঠে। এই মিথ্যা অভিযোগের কারণে ইউসুফ ইসলাম মামলা ঠুকে দেন। যথারীতি সত্যের জয় হয় এবং ক্ষতিপূরণ পান। এবং ক্ষতিপূরণ থেকে প্রাপ্ত সমস্ত টাকা Small Kindness Charity-তে দান করে দেন।

পরে এই বিষয়ে ইউসুফ ইসলাম বলেন, এটা সত্য যে আমার ম্যানেজার আগেই সেই অনুষ্ঠানের আয়োজকদের বলে রেখেছিল যেন উপস্থাপিকারা এমন কিছু না করে যাতে ইউসুফ ইসলাম কোন বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পরেন। তার সাথে বিধর্মী কেউ হিজাব পরবে বা না পরবে সেটা নিয়ে আমার কাছ থেকে আপত্তি আসবে কেন? নারী স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কোন মর্যাদাহানিকর দাবী

এখানে ছিল না যা সবাই অপপ্রচার করছে। ইসলামে নারীদের সম্মান সব থেকে বেশি। তবে ইসলাম ধর্মে যে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক নারীর সাথে দৈহিক সংস্পর্শ আসে এমন কোন মেলামেশা নিষেধ আছে। আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর থেকে নারীর সম্মান বুঝতে শিখেছি। কারণ আমার বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখেছি পশ্চিমা কালচারে নারীদের শুধু চকচকে ভোগ্য পণ্য হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। সেখানে ইসলামের ন্যায় নারীর সম্মান বলতে কিছু নেই।

মুসলিম হবার পর পর মায়ের কাছে ফিরে আসি আমি এবং সাথে থেকে তাঁর দেখভাল শুরু করি। আমি আমার মায়ের পছন্দের মেয়েকে বিয়ে করি। ব্যাপারটা ছিল এই রকম, তাকে অনেকগুলো পাত্রীর ছবি দেখানো হলো। তাদের মধ্যে বউ হিসাবে একজনকে বেছে নিতে বলি। মা এভাবে আমার জীবন সঙ্গিনী বেছে দেন। অদ্ভুত ব্যাপার তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল শতভাগ সঠিক! আমি আমার স্ত্রীর সাথে সুখী জীবনযাপন করছি। পরের বছরই আমাদের কোল জুড়ে ফুটফুটে একটি মেয়ে সন্তান জন্ম নেয়। আল্লাহর রহমতে আমার এখন চার মেয়ে এক পুত্র সন্তান।

আমি সব সময়ই নারী শিক্ষা বিষয়ে জোড় দিয়ে থাকি। নারীদের শিক্ষা প্রসারে আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। আমার চার কন্যা সন্তান উগ্রতা প্রকাশ পায় না এমন পোশাক ব্যতিত সাধারণ-স্বাভাবিক সব পোশাকই পরে এবং সেই সকল পোশাক অবশ্যই তাদের শরীর ঢাকা থাকে। আমার মেয়েরা সবাই এই জীবন ব্যবস্থা থেকেই উচ্চ শিক্ষিত হয়েছে। আমার বড় মেয়ে, হাসনা, দুবাইতে একটি রেকর্ড কোম্পানী চালায়। তার পরের জন আসমা যোগ্যতাসম্পন্ন আইনজীবী এবং ছোট মেয়ে 'সু ডিজাইনার' বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠা হতে হিজাব কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। বরং হিজাবের কারণে তারা পশ্চিমা বিশ্বের আর দশজন নারীর ন্যায় জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা অযথা বিউটিফিকেশনে পেছনে ব্যয় না করে কনস্ট্রাকটিভ কাজে ব্যয় করতে পেরেছে বলে মনে করি।

বিশেষ সাক্ষাৎকারে ইউসুফ ইসলাম ঃ লন্ডন ভিত্তিক মুসলিম এইড গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সাবেক পপ সঙ্গীত শিল্পী জনাব ইউসুফ ইসলাম বলেছেন, "বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের আজকে বড় সমস্যা ইসলামের বাস্তব শিক্ষার অভাব এবং জীবনাচরণে ইসলামী আদর্শের অনুপস্থিতি। আমাদের ধর্মে যে আমাদের সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে সে সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ।" তিনি যখন

বাংলাদেশ ভিজিটে এসেছিলেন তখন একটি পত্রিকায় সাক্ষাতকার দিয়েছিলেন তা শিক্ষামুলক হিসেবে তুলে ধরা হলো ঃ

প্রশ্ন ঃ আপনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন কেন?

উত্তর ঃ তিনি হেসে জবাব দিলেন, দেখুন সঙ্গীত আমাকে ঐশ্বর্য দিয়েছিল অপার। জীবন ভাগের সব আয়োজন ছিল আমার নাগালে। কিন্তু ভোগ বিলাস আমার মনকে শান্ত করতে পারেনি। আমি কিছুতেই তৃপ্তি পাচ্ছিলাম না। এই অশান্তি আমাকে ধর্মের দিকে ঝুঁকিয়ে দেয়। আমি আমার তদানীন্তন স্বধর্ম খ্রিস্টবাদ সম্পর্কে পড়তে শুরু করি। এরপর ইহুদী, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের উপর আমি পড়াশোনা করি। কিন্তু আমি বিফল হই। আমার আকাঙ্খিত শান্তি আমি পেলাম না। এ সময় আমার ভাই জেরুজালেম থেকে আবেগ জড়িত কণ্ঠে অনেক কথাই বলল। আমি যে অনুসন্ধানের জন্য তখন ব্যাকুল হয়ে আছি, আমার ভাই সেই খবর জানতো। আমার জন্ম দিনে সে জেরুজালেম থেকে নিয়ে কুরআন আসা একখানা পবিত্র কুরআন শরীফ উপহার দিলো। আমি পবিত্র কুরআন পড়তে শুরু করি। কুরআন সেই মহা গ্রন্থ যা আমার জীবন ও চেতনার জগতকে পালটে দিয়েছে। আমার মনের সকল প্রশ্নের জবাব এই গ্রন্থে পেলাম। আমি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। আমি মুসলিম হলাম।

প্রশ্ন ঃ এখন আপনি আপনার বিগত জীবনকে কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

উত্তর ঃ দেখুন আজ আমি পরিতৃপ্ত, সুখী। আল্লাহর সন্তুষ্টিই আমার লক্ষ্য, সে লক্ষ্যেই আমার জীবনকে পরিচালিত করার চেষ্টা করছি। আর আমার পূর্বের জীবন ছিল মোহাচ্ছন্ন, ভোগ বিলাসের, জীবনের কোন লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল না।

প্রশ্ন ঃ আপনার পুরানো বন্ধুরা আপনার সম্পর্কে কী বলে?

উত্তর ঃ ওদের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। দেখা সাক্ষাৎ ও কুশল বিনিময় হয়। তবে আমাদের জীবনের মৌল দর্শন পালটে গেছে। আমার লক্ষ্য হচ্ছে অনন্ত জীবন আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ, আর তাদের লক্ষ্য হচ্ছে এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীকে ভোগের জন্য প্রাণপাত করা।

প্রশ্ন ঃ মুসলিমদের এই দুর্ভোগের কারণ কি বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর ঃ আমাদের সমস্যা তো একটি। ইসলাম সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ ধারণার অভাব। ইসলামকে আমরা মুখে মুখে গ্রহণ করলেও আমাদের জীবনে এর আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে পারিনি। ইসলামকে অনুসরণ করলে আমাদের

সমস্যা থাকতো না। আমি পশ্চিমের ঐতিহ্য নিয়ে যেভাবে ইসলামের সৌন্দর্য, গুরুত্ব এবং সম্পদকে উপলব্ধি করছি, আমার সন্দেহ হয় অনেকেই হয়ত সেভাবে করছেন না।

প্রশ্ন ঃ অনেকেই তো বলেন, ইসলাম ১৪শ বছরের পুরাতন আদর্শ, এ যুগের জন্য অচল। এ সম্পর্কে আপনি কি বলেন?

উত্তর ঃ আমি বিনয়ের সাথেই বলছি, যারা এসব বলেন, তারা নিজেদের মনে স্থান করে নেয়া ইসলাম সম্পর্কে পূর্ব ধারণার বশবর্তী হয়েই ইসলামকে বিচার করে। যদি সঠিকভাবে তারা এ ব্যাপারে জানতে চাইতো তবে তাদের উক্তি হতো ইতিবাচক। এমন দায়িত্বহীন হতো না।

প্রশ্ন ঃ যুক্তরাজ্যে ইসলামের দাওয়াতী কাজ কেমন চলছে?

উত্তর ঃ সেখানকার পরিবেশ ও প্রচার মাধ্যমগুলো ইসলামের জন্য অত্যন্ত প্রতিকূল। কিন্তু এরপরও কাজ হচ্ছে। নতুন নতুন লোক ইসলাম গ্রহণ করছে। আর এসব মুসলিম যেহেতু সেই দেশেরই নাগরিক, তাই সেখানকার সামাজিক জীবনে এর একটা প্রতিক্রিয়া পড়ছে। যুক্তরাজ্যে মুসলিম শিশুদের ইসলামী শিক্ষা দানের জন্য স্কুল খুলেছি।

প্রশ্ন ঃ আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

উত্তর ঃ ১৯৩৮ সালের রমাদান মাসে আমি লন্ডনে জন্মেছি। আমার পিতা ছিলেন গ্রীক সাইপ্রিয়ট, মা সুইডিশ। আমার মা এখনো জীবিত। ১৯৭৭ সালে আমার ইসলাম গ্রহণের পর আমার স্বজনদের অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করেছে। আমার স্ত্রী ফাউজিয়া আফগান ও তুর্কী বংশোদ্ভূত মুসলিম। আমাদের তিন কন্যা ও এক পুত্র রয়েছে। আমি ব্যবসায় কিছু পুঁজি বিনিয়োগ করেছি। এতেই আমার চলে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশী মুসলিম ভাইদের জন্য আপনার কি কোন বাণী রয়েছে?

উত্তর ঃ তাদের প্রতি আমার আবেদন, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে ইসলামী উম্মাহর প্রতি তাদের দায়িত্ব অপরিসীম। ইসলামকে নিজেদের জীবনে সর্বোত্তমভাবে পালনের জন্য সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের প্রস্তুতি নেয়া।

Dr. Yusuf Islam, UK
www.yusufislam.com

ড. শিবশক্তি স্বরূপজীর ইসলাম গ্রহণ

"অজ্ঞানতার দুনিয়ায় আমি 'ভগবান' হিসেবে পূজিত ছিলাম, আলোকিত বিশ্বে আমি নিজকে মানুষ হিসেবে খুঁজে পেয়েছি।"-ড. স্বরূপজী। ড. স্বরূপজী ইসলামে মুক্তির স্বাদ পেলেন গত ১০ই মে (১৯৮৬) ভারতের সাম্প্রতিক কালের এক মহাত্মা ধর্মগুরু যিনি সেদিন পর্যন্ত সেদেশের সর্বত্র 'ভগবান' নামে পরিচিত ও পূজিত ছিলেন সেই ডঃ শিবশক্তি স্বরূপজী মহারাজ উদাসেন নিজ স্ত্রী ও কন্যাসহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাহার নতুন নাম রাখা হয় ইসলামুল হক, পত্নীর নাম খাদিজা হক আর কন্যা নাম রাখা হয় আয়িশা হক। গুজরাটের প্রভাবশালী সাপ্তাহিক 'শাহীন' এর তরফ হতে সম্প্রতি ড. ইসলামুল হকের এক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

প্রশ্ন ঃ ইসলাম গ্রহণের পর আপনি কি অনুভব করছেন?

উত্তর ঃ আল্লাহর হাজার শোকর যে, তিনি আমাকে ঈমানের অমূল্য সম্পদ প্রদান করেছেন। আমি নিজকে পৃথিবীর এক ভাগ্যবান ও বিজয়ী পুরুষ বলে মনে করি। অজ্ঞানতার দুনিয়ায় আমি 'ভগবান' হিসেবে পূজিত ছিলাম, আলোকিত বিশ্বে আমি নিজকে মানুষ হিসেবে খুঁজে পেয়েছি।

প্রশ্ন ঃ আপনাকে ধন্যবাদ। এখন আপনি মেহেরবানী করে আপনার আগের নাম ও পরিচয় সম্বন্ধে কিছু বলুন?

উত্তর ঃ আমার নাম মহানত, ড. শিবশক্তি স্বরূপজী মহারাজ উদাসেন, ধর্মচারিয়া, আদ্যশক্তিপীঠ। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আমার পেশা মহানতগিরি। বৃন্দাবনে 'অনাখন্ড আশ্রম' নামে আমার বড় আশ্রম ছিল। দ্বিতীয় আশ্রম ছিল বোম্বাইয়ের মুলুনডে। আর তৃতীয় দেবালেইনে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এই আশ্রমটির নির্মাণ কাজ প্রায় ৫০ একর জমির উপর চলছিল। 'খারাপ পথে' চলা মানুষের সুপথে আনার উদ্দেশ্যে শিক্ষাদান' পথ প্রদর্শন ও শিষ্য তৈরী করা ছিল আমার প্রাত্যাহিক কাজ।

প্রশ্ন ঃ আপনার পান্ডিত্যের খ্যাতি সর্বত্র। আপনি আপনার নিজের সম্পর্কে, নিজের শিক্ষা জীবন ও ধর্মজীবন সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর ঃ আশ্রমেই আমার শিক্ষার সূচনা হয়। পরে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওরিয়েন্টালিজমে এম.এ.। গুরুকুল কাংড়ি থেকে 'আচারিয়া' (আচার্য) পদবী লাভ। বৃটেনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশ্বের দশটি প্রধানতম

ধর্মের উপর ডক্টর অব ডিভাইনিটি এবং সেই সাথে ওরিয়েন্টালিজমে আরেক পি.এইচ.ডি. । পোপ পল-৬ এর আহবানে ইতালী যাই । সেখানে সাতটি বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ দান করি । আমাকে এক মহাসম্মান ভাটিকানের নাগরিকত্ব দান করা হয় । এবং খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণের জন্য বিশেষ অনুরোধ জানান হয় । আমি তাদের অনুরোধ উপেক্ষা করে ভারতে এসে বিধিমত মুকুট ধারণ করে আশ্রমের গদিতে বসে পড়ি । আমি প্রায় ১২টি ভাষা জানি, এর মধ্যে ইংরেজী, সংস্কৃত, গ্রীক, হিন্দি, পালি, গোরমুখী, মারাঠী, গুজরাতি, উর্দু ও আরবী আমার ভাল লাগে । আগেই বলেছি, আমি দুনিয়ার দশটি প্রধানতম ধর্মের উপর তুলনামূলক পড়াশুনা ও গবেষণা করেছি । সে জন্য সত্য স্বীকারে আমার কোন সংকোচ ছিল না । আমার সমকালীনদের মধ্যে হিন্দু জগতের বড় বড় জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিত্ব ও পন্ডিত রয়েছেন । যেমন জগৎগুরু শংকরাচার্য, রামগোপাল শারওয়ালে, পুরীর শংকরাচার্য, মহামন্ডেলশ্বর স্বামী অখন্ডানন্দজী, গুরু গোলওয়ালকার বাবা সাহেব দেশমুখ, বালঠাকুরে, অটলবিহারী বাজপায়ী, নানা সাহেব, দেশমুখ, বিনোবা ভাবে এবং অন্যান্য । একবার তিনি তার "পরমধাম" আশ্রমে আমাকে বক্তৃতাদানের বিশেষ আমন্ত্রণ জানান । সেখানে উপস্থিত লোকজনের সামনে দাদা ধর্মাধীকারী আমাকে জিজ্ঞাসা করে বসেন ঃ "আপনি পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে পড়াশুনা করেছেন, মানুষের জন্য কোন ধর্ম শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়? আমি জবাবে বলেছিলাম,'ইসলাম' আমার জওয়াবে দাদা খুশী হন নাই । তিনি বলেন, উঠেন, "ইসলাম নানা বাধা-বন্ধন আরোপ করে ।" আমি জবাব দিলাম, "যে বন্ধন বাঁধে, সেই বন্ধনই মুক্তি দিতে পারে । আর যে প্রথম থেকে স্বাধীন, তার সারা জীবনের জন্য বন্ধন সৃষ্টি প্রবণতা থেকে যাবে । এ ধরণীতে মানুষকে এক সাথে বেঁধে রাখার জন্য বন্ধনকারী ধর্মের প্রয়োজন রয়েছে, যা তাদের পৃথিবীতে ভাল করে বেঁধে রাখবে এবং পরলোকে মুক্ত করে দেবে । আর এ রকম ধর্ম আমার মতে একমাত্র ইসলামেই রয়েছে । ইসলাম ছাড়া এরকম ধর্ম আমি আর দেখি না ।"

প্রশ্ন ঃ আপনি বহু ধর্ম অধ্যয়ন করেছেন । ইসলামের পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থে আল্লাহ, কুরআন, মুহাম্মাদ ﷺ অথবা ইসলাম সম্পর্কে কোন বর্ণনা দেখতে পেয়েছেন?

উত্তর ঃ বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদ ছাড়া বাকী সব ধর্ম গ্রন্থে আল্লাহ, মুহাম্মাদ ﷺ অথবা আহমদ নাম পাওয়া যায় । বেদে খুবই স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় ।

প্রশ্ন ঃ আপনি লাখ লাখ টাকার সম্পদের মোহ ছেড়ে দিয়ে ইসলাম কবুল করেছেন । বর্তমানে আপনি কিভাবে জীবন নির্বাহ করছেন?

উত্তর ঃ আমি সমগ্র বিশ্বের রাজত্বও ইসলামের এই মহান উপহারের বদলে ত্যাগ করতে দ্বিধা বা কুণ্ঠাবোধ করতাম না। ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে যে তৃপ্তি আমি পেয়েছি সাতরাজ্যের ধন সম্পদ লাভ করেও তা পাওয়া সম্ভব নয়। আমি আয়ুর্বেদিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা করি। আল্লাহ তায়ালার কৃপায় প্যারা মাইক্রো পন্থায় দুরারোগ্য ব্যাধির উপশম ঘটাই। এতেই আমার, আমার পরিবারের ডাল রুটির ব্যবস্থা হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?

উত্তর ঃ আমি আল্লাহ তা'আলাকে চিনতাম না। আল্লাহর কসম, তিনি আমাকে চিনিয়ে দিয়েছেন...।

প্রশ্ন ঃ ইসলামের সিপাহী হিসেবে আপনি দুনিয়ার মুসলিমদের উদ্দেশ্যে কি বাণী রাখতে চান। ... আপনার মতে মুসলিমদের কেমন হওয়া উচিত?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে নাবীজি যা বলেছেন তার চেয়ে ভাল কিছু আর কে বলতে পারে? তিনি মুসলিমদেরকে এমন সোনার টুকরার সাথে তুলনা করেছেন কোন অবস্থায়ই যার ঔজ্জ্বল্য কমে না। আরেক জায়গায় তিনি মুসলিমদের তুলনা করেছেন মধুমক্ষীকার সাথে, যা ফুলের উপর গিয়ে বসে, নোংরা জায়গায় বসে না। ফুল থেকে রস চুষে মধু বানায়, বিষ তৈরী করে না। আর তা সে নিজের জন্য নয়, অপরের জন্য তৈরী করে। সে ডালে বসে, সে ডালের কোন ক্ষতি করে না। অন্যত্র তিনি বলেছেন, মুসলিম সেই, যার হাত ও কথা থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে।

প্রশ্ন ঃ আপনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর ঃ স্বার্থপরতার জাল হঠাতে হবে। মুসলিম মুজাহিদদের নতুন শপথ নিয়ে মাঠে নামতে হবে। সাহস, নিঃস্বার্থ ঈমান, আর মন-প্রাণ ঢেলে কাজে নামতে হবে। আমার নিজের তরফ থেকে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টায় আছি। সমগ্র মুসলিম সমাজকে এক দেহ আর এক প্রাণে পরিণত করতে হবে। এ বিষয়ে আমার কার্যক্রম নিম্নরূপ ঃ

(১) ইসলামের সুরক্ষা (২) মুসলিমদের দ্বীন-দুনিয়ার মূল্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা (৩) সারা বিশ্বের মানুষের কাছে তাদের ভাষায় ইসলামের দাওয়াত পৌছান। তিনি সম্প্রতি একটি বই লিখেছেন, যার নাম "লিজিয়ে আপভি সোঁচে" এর বাংলা অর্থ- নিন আপনিও চিন্তা করুন। আশা করি হিন্দু ভাইয়েরা সত্যই চিন্তা করবেন।

মাইকেল জ্যাকসনের আইনজীবি মার্ক শেফার-এর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী

বিশ্বের অন্যতম মিডিয়া আল-জাজিরা একটি প্রতিবেদন দেখিয়েছিল। সেই প্রতিবেদনটির শিরোনাম ছিল এমন ঃ 'ব্রিটিশ নারীদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রবণতা বাড়ছে'। এতে বলা হয় ঃ

'ব্রিটেনে গত দশ বছরে প্রায় ৪০ হাজার মানুষ ধর্মান্তরিত হয়েছে। তাদের মধ্যে এগিয়ে রয়েছে নারীরা। তারা মূলত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। 'ফেথ ম্যাটার্স' একটি ব্রিটিশ সংস্থা। এই সংস্থাটি সম্প্রতি একটি জরিপে চালিয়ে এ তথ্য জানায়। ব্রিটেনে শ্বেতাঙ্গরা, বিশেষ করে মেয়েরা খ্রিস্টান ধর্ম ছেড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে। ফলে রক্ষণশীল ব্রিটিশরা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে। জরিপে জানানো হয়, যারা ধর্মান্তরিত হয়েছে তাদের কারো বয়সই ২৭-এর বেশি নয়। এদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা প্রায় ৬২ শতাংশ।'

বিশ্বের সকল মিডিয়া যখন ইসলামের উপর হামলা করছে; ইসলামের সুন্দর রূপটিকে কদর্য হিসেবে উপস্থাপনে আদাপানি খেয়ে মাঠে নেমেছে, তদুপরি ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয়গ্রহণকারীর সংখ্যার এমন উচ্চবৃদ্ধি কেবল ইসলামের সত্যতাই প্রমাণ করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণতাদানকারী। যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে"। (সূরা আন-নূর ঃ ০৮) এ আয়াতেরই উজ্জ্বল প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি উপরোক্ত প্রতিবেদনটিকে। প্রতিদিনই বিশ্বের নানা দেশে অশান্তিভরা জীবন ত্যাগ করে শান্তি ও মুক্তির অব্যর্থ ঠিকানা ইসলামের পরিবারে শামিল হচ্ছেন অনেক সাধারণ নর-নারী থেকে নিয়ে জ্ঞানী-পণ্ডিতরা। এদের দীন বদলের গল্প হতে পারে আমাদের হেদায়াতের পাথেয়। হতে পারে অনেকেরই ইসলামের প্রতি পথ নির্দশক।

গত ২৪ অক্টোবর ২০০৯ শনিবার প্রখ্যাত আমেরিকান এ্যাডভোকেট ও মিলিয়নিয়ার মার্ক শেফার তার দশদিনের সৌদি ভ্রমণ শেষে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। জনাব শেফার আমেরিকার লসএঞ্জেলস-এর একজন ডাকসাইটে আইনবিদ ও কোটিপতি। তিনি একজন খ্যাতনামা অর্পিতসম্পত্তি আইন বিশেষজ্ঞ। সর্বশেষ তিনি মৃত্যুর এক মাস আগে মাইকেল জ্যাকসনের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাটির বিরুদ্ধে লড়েছেন।

জনাব মার্কের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ব্যক্ত করতে গিয়ে সৌদি ট্রাভেল গাইড জাবি বিন নাসির শরীফ বলেন, মার্ক শেফার সৌদি আরব পৌঁছার পর থেকেই ইসলাম সম্পর্কে, ইসলামের অন্যতম রুকন সলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুরু করেন। রিয়াদে আমরা দুদিন অবস্থান করি। সেখানেও তিনি ইসলামের খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস অব্যাহত রাখেন। তারপর আমরা গেলাম নাজরান। সেখান থেকে আবহা আবার সেখান থেকে উলায় গেলাম। উলায় পৌঁছার পর ইসলামের ব্যাপারে তার কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। এখানে একবার আমরা ঘুরতে বেরুনোর পর উলায় আমাদের সঙ্গে আসা তিনজন সৌদি যুবকের প্রশান্ত চিত্তে মরুবালুকার ওপর সলাত আদায় করার দৃশ্য তার হৃদয়কে প্রবলভাবে আন্দোলিত করে।

দু'দিন উলায় কাটিয়ে আমরা যাই জাউফ নামক স্থানে। জাউফে গিয়ে মার্ক শেফার আমার কাছে ইসলাম সম্পর্কিত যে কোনো গ্রন্থ চাইলেন। আমি তাকে ইসলাম ধর্মের ওপর লিখিত কয়েকটি পুস্তিকা সরবরাহ করি। তিনি মনোযোগসহ সেসব পড়া শুরু করলেন। ভোরবেলা তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন, সলাত কীভাবে আদায় করতে হয়? আমি তাকে সলাত কিভাবে পড়তে হয়, অযু করতে হয় কিভাবে তা ব্যাখ্যা করলাম। তৎক্ষণাৎ তিনি আমার পাশে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আমার সঙ্গে সলাত আদায় করলেন। সলাত আদায়ের পর আমাকে জানালেন, তিনি সলাত আদায় করে খুব প্রশান্তি লাভ করেছেন।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আমরা জেদ্দায় ফিরে এলাম। তিনি কিন্তু পুস্তিকাগুলোর ওপর চোখ বুলানো অব্যাহত রেখেছেন। শুক্রবার সকালে আমরা পুরান জেদ্দায় গেলাম। জুমার সলাতের সময় ঘনিয়ে এলে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। সবাইকে জানালাম, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি জুমার সলাত আদায় করতে যাব। মার্ক বললেন, 'আমি তোমার সঙ্গে যেতে চাই। আমি তোমাদের সলাত আদায় দেখব।' আমি তাকে স্বাগত জানালাম। মসজিদে গেলাম এবং সমবেত অনেক মুসল্লির সঙ্গে মসজিদের বহির্প্রাঙ্গণে জুমার সলাত আদায় করলাম। অনতিদূর থেকে সবই লক্ষ্য করছিলেন মার্ক শেফার। সলাত আদায়ের পর সব মুসল্লি একে অন্যকে সালাম-সম্ভাষণ জানাচ্ছেন। সবার মুখে এক অপার্থিব খুশির দীপ্তি। এসব দৃশ্য তাকে খুবই মুগ্ধ করলো।

আমরা যখন হোটেলে ফিরে এলাম, তিনি বললেন, 'আমি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে চাই।' আমি তাকে গোসল করতে বললাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি গোসল করলেন। আমি তাকে কালিমায়ে শাহাদাতের তালকিন দিলাম। তিনি পড়লেন,

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'। তারপর তিনি দু'রাকাত সলাত আদায় করলেন। সলাতের পর তিনি আমাকে বললেন, আমি সৌদি ত্যাগ করার আগে পবিত্র মক্কার হারাম শরীফে যাবার বাসনা রাখি। শনিবার সন্ধ্যায় হারাম শরিফে গিয়ে তিনি সলাত আদায় করলেন। তারপর আমরা হামরায় অবস্থিত "দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ" অফিসে গেলাম। সেখানে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাকে ইসলাম গ্রহণের সাময়িক সনদ দেয়া হল। শনিবার সন্ধ্যায় তার আমেরিকান সঙ্গীরা যেহেতু চলে যাবেন তাই প্রফেসর তুরকিস্তানি মার্ক শেফারকে হারাম শরিফে পৌঁছানোর দায়িত্ব নিলেন।

স্যার মার্ক শেফারের হারাম শরীফ গমন সম্পর্কে প্রফেসর মুহাম্মদ আমিন তুরকিস্তানি বলেন, সাময়িক সনদ গ্রহণের পর মার্ক শেফার এবং আমি মক্কার হারাম শরিফে গেলাম। হারাম শরীফ দর্শন মাত্র তার চেহারায় ফুটে উঠল এক অনাবিল লাবণ্য। তার কপাল ও কপোল উদ্ভাসিত হল সৌভাগ্যের এক বিরল বৈভবে। আমরা যখন হারামে প্রবেশ করলাম। সরাসরি পবিত্র কাবা দেখতে পেলাম। তখন তার আপাদমস্তকে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। প্রাপ্তি ও তৃপ্তিতে ভরে উঠলো যেন তার মন। আল্লাহর শপথ! আমি সে দৃশ্যের বর্ণনা দিতে অক্ষম। মার্ক শেফার কাবা তাওয়াফ করলেন। আমরা সলাত আদায় করলাম। যখন ফিরছিলাম তখন মনে হচ্ছিল, এ ঘর তার কত আপন! কত চেনা! কাবাকে ছেড়ে তার মন যেন কিছুতেই ফিরে আসতে চাইছিল না।

'আমি যেন নব জীবন লাভ করেছি।' ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেবার পর রিয়াদে এক সংবাদ সম্মেলনে মার্ক শেফার তার ইসলাম কবুলের সৌভাগ্যের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, 'আমার পক্ষে এ মুহূর্তের অনুভূতি ব্যক্ত করা আসলেই সম্ভব নয়। শুধু এতোটুকু বলতে পারি যে, আমি এক নব জীবন লাভ করেছি। আজ আমার নতুন জীবনের সূচনা ঘটলো।' তিনি আরও বলেন, আমি তো সৌভাগ্যের চূড়ায় উপনীত হয়েছি। যখন হারাম শরীফে প্রবেশ করলাম, পবিত্র খানায়ে কাবা দেখলাম সে যে কী প্রাপ্তি ও তৃপ্তির পূর্ণতার মুহূর্ত ছিল, তা আমি আপনাদের সামনে ব্যক্ত করতে সক্ষম নই।

পরবর্তীতে তিনি কী করবেন এমন এক প্রশ্নের জবাবে মার্ক শেফার বলেন, 'আমি ইসলাম সম্পর্কে আরও বেশি বেশি জানার চেষ্টা করব। আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে গভীরতায় পৌঁছার প্রয়াস চালাব এবং পবিত্র হাজ্জ সম্পাদনের জন্য অচিরেই আবার সৌদি আরবে ফিরে আসব।'

ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হলেন কীভাবে এমন প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'ইসলাম সম্পর্কে খুব অল্পই জানা-শুনা ছিল। আমি যখন সৌদি আরব ভ্রমণ করলাম, সেখানকার মুসলিমদের জীবন যাপন প্রণালী দেখলাম, বিশেষত তাদেরকে প্রশান্তচিত্তে সলাত আদায় করতে দেখলাম, তখন ইসলাম সম্পর্কে জানতে প্রবলভাবে আগ্রহ বোধ করলাম। ইসলাম সম্পর্কে জানতে শুরু করা মাত্রই আমার প্রবল বিশ্বাস জন্মাল যে, এটি সত্য ধর্ম।

রবিবার প্রভাতে স্যার মার্ক আমেরিকার উদ্দেশে জেদ্দাস্থ কিং আব্দুল আজিজ বিমানবন্দর ত্যাগ করেন। এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশন পর্ব অতিক্রম করার সময় ধর্ম ঘরে লিখেন ইসলাম। পাঠক, ছবিসহ মার্ক শেফারকে দেখতে চাইলে ভিজিট করতে পারেন।

http://www.ebnmaryam.com/vb/showthread.php?goto=newpost&t=50738

ইংল্যান্ডের ইউসুফ চেম্বারের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা

ইংল্যান্ড- লন্ডনের একটি ঘটনা। বর্তমান নাম Yousuf Chambers। তিনি ২০১০ সালে ICNA-র "Carry The Light" Annual Conference-এ Guest Speaker হিসেবে ক্যানাডায় এসেছিলেন। তিনি তার জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা তার বক্তৃতায় শিক্ষণীয় হিসেবে বলেছিলেন তা তার নিজের ভাষায়ই তুলে ধরা হলো।

সত্যের সন্ধানে ঃ আমি একটি লোকের সাথে উঠাবসা করতাম, সে একদিন আমাকে বলল তোমার মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে, সে আমাকে ডাক্তার দেখাতে বলল। আমি জানি আমি কেন এমন করছি, কারণ আমি বর্তমান সোসাইটির সাথে পেরে উঠতে পারছি না। আমি সত্য খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, আমি এই পৃথিবীর অসৌন্দর্য্য থেকে বেড়িয়ে আসতে চাচ্ছি। আমি এই জীবনের কোন উদ্দেশ্য খুঁজে পাচ্ছিলাম না (What is the urpose of Life?). আমার মনে হচ্ছিল এই পৃথিবীতে বেঁচে থেকে লাভ কি? মানুষের সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে দীর্ঘদিন একাকী জীবন-যাপন করতে থাকি। আমি নানা রকম বইপত্র পড়তে থাকি। জ্যোতিষবিদ্যা সম্পর্কে পড়াশোনা করি। আমি নিজে নিজের সাথে যুদ্ধ করতে থাকি।

একদিন একটি চার্চে যাই। কারণ চার্চ থেকে হয়তো আমার সকল সমস্যার সমাধান পাবো। চার্চের কর্মকর্তার সাথে দেখা করি, সে আমাকে এপয়েন্টমেন্ট নিয়ে অন্য দিন আসতে বলে। আমি তার কথা মতো এপয়েন্টমেন্ট করে আরেকদিন যাই, কিন্তু গিয়ে দেখি সে খুব ব্যস্ত, আমার দিকে আগ্রহই প্রকাশ করছে না। অনেক্ষণ পর আমাকে জিজ্ঞেস করল 'তোমার জন্য কী করতে পারি?' আমি তাকে বললাম ঃ 'তুমি গডের পক্ষ থেকে একজন মানুষ, তুমি আমাকে বল গড কে? আমি কেন এই পৃথিবীতে এসেছি? সে উত্তরে বলল ঃ 'তুমি কি কখনও থিওলজী ডিগ্রি (theology degree) সম্পর্কে চিন্তা করেছ?' আমি উত্তরে বললাম ঃ 'হ্যাঁ, আমি এই বিষয়ে চিন্তা করেছি এবং ডাবলিন ট্রিনিটি (dublin trinity) নিয়ে চেষ্টাও করেছি, কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে এসবই ডগমেটিক (dogmatic) এবং এগুলোর কোন মানে হয় না।' আমার এই ধরণের কথা শুনে যে অবাক হলো এবং আমাকে বলল 'আমি দুঃখিত আমি

তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারছি না।' তবে তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন পড়ে দেখতে।

এর পর আমি বুদ্ধিজম, হিন্দুইজম, সোসালিজম, এবং খৃষ্টানিটি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করলাম। শুধু এগুলোই শেষ নয় আমি তাই-চাই, মেটারিয়াল আর্টস, মেডিটেশন এবং ভেজিটারিয়ানিজম, এস্ট্রলজি সাইন্স (Tai Chi, martial arts, meditation, vegetarianism, astology science)-এর উপরও পড়াশোনা করলাম। কিন্তু কোন বিদ্যাই আমাকে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলো না।

ইউনিভার্সিটিতে একটি মালইশিয়ান মেয়ের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল। আমি জানতাম না সেদিন ছিল রমাদান মাস। মেয়েটি আমাকে বলল এই এক মাস তুমি আমার কাছে আসবে না। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম কেন? সে বলল আমার ধর্মে নিষেধ আছে। আমি আর দেরি করলাম না, সাথে সাথে চলে গেলাম ইউনিভার্সিটির ইসলামিক সোসাইটিতে। সেখানে গিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস বললাম 'আমি ইসলাম সম্পর্কে জানতে চাই, আমি এই মেয়েটিকে ভালবাসি, তাকে কিভাবে পেতে পারি।' তারা আমাকে জানালো বিয়ের আগে সে তোমরা সাথে কোন প্রকার সম্পর্কে করতে পারবে না, তুমি তাকে ছেড়ে দাও।

আমি এবার নানা রকম বইপত্র জোগাড় করে ইসলামের উপর রীতিমতো পড়াশোনা শুরু করলাম। ইসলাম সম্পর্কে প্রতিদিন কিছু না কিছু জানছি ও শিখছি এবং প্রায়ই ঐ মেয়েটার নিকট গিয়ে তাকে বলছি তোমার এটা করা উচিত না, ওটা করা উচিত না। আমি আমার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে থাকলাম, দিন দিন আমার ইসলামের জ্ঞান বাড়তে থাকলো। আস্তে আস্তে আমার চোখের পর্দা সরে যেতে থাকলো, আমার এতো দিনের সকল প্রশ্নের জট আপনা আপনি খুলতে থাকলো। আমার মাথার উপর থেকে কালো মেঘ সরে যেতে থাকলো। আমি মসজিদে যাওয়া শুরু করলাম, মুসল্লিদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করতে থাকলাম, এক রমাদান মাস থেকে সিয়ামও পালন শুরু করলাম। আমি এর পর আবিস্কার করলাম যে আমার এখনকার পৃথিবীটা আগের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা।

একদিন সকালে উঠে ওযূ-গোসল করে মসজিদে গেলাম। আমি জেনে গেছি যে কুরআন আমার সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে। আমি জানতাম না ইসলাম গ্রহণকে 'শাহাদাহ' বলে। আলহামদুলিল্লাহ আমি মহান আল্লাহর অনুগ্রহে ঐ

দিন সকালে ইসলাম গ্রহণ করি। ঐ দিন মসজিদে ৩০০ থেকে ৪০০ লোক উপস্থিত ছিল, সবাই আমাকে কনগ্রাচুলেশন জানালো।

এই বৃটিশ নাগরিকের ইসলাম গ্রহণ করার আগের ঘটনা। তিনি লন্ডনে একটি বাড়িতে দীর্ঘ দিন ভাড়া ছিলেন। বাড়ির মালিক বাংলাদেশী মুসলিম, মালিক সপরিবারে ঐ বাড়ির উপরের তলায়ই বসবাস করতেন। Yousuf Chambers-এর সাথে তাদের নিয়মিতই দেখা-সাক্ষাৎ হতো, এক সাথে খাওয়া দাওয়া হতো। সেই সময় Yousuf Chambers-এর খুব দুর্দিন চলছিল, অশান্ত মন নিয়ে দিন কাটাচ্ছিল কিন্তু তার কোন সমাধান তিনি পাচ্ছিলেন না যা বাড়িওয়ালা জানতেন। একসময় তিনি বাড়ি পরিবর্তন করে অন্যত্র চলে যান।

তিনি মুসলিম হওয়ার পর নিজেকে একজন ইসলামের দা-'ঈ হিসেবে তৈরী করেন এবং ইংল্যান্ডের Islamic Education and Research Academy (IERA)-এর সাথে মিলে দাওয়াতী কাজ শুরু করেন। তিনি অবাক হয়ে ভাবেন যে তিনি দীর্ঘ দিন একটি মুসলিম পরিবারের সাথে ছিলেন কিন্তু কোন দিন দ্বীন ইসলামের দাওয়াত পাননি, ইসলামের কোন নামগন্ধও শুনেননি তাদের থেকে।

পরবর্তীতে তিনি তার ঐ মুসলিম বাড়িওয়ালার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন এবং তার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ঘটনা বললেন। বাংলাদেশী মুসলিম বাড়িওয়ালা এতে খুবই অবাক হলেন এবং মন্তব্য করলেন যে Are you OK? তিনি মনে করলেন Yousuf Chambers-এর মাথা হয়তো ঠিক নেই, হয়তো মানসিকভাবে অসুস্থ। কারণ বাড়িওয়ালার দৃষ্টিতে ইসলাম গ্রহণের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, সে এই কাজ করে ভুল করেছে (নাউযুবিল্লাহ)।

www.facebook.com/OfficialYusufChambers

একজন জন্মান্ধ ক্যানাডিয়ান নাগরিকের ইসলাম গ্রহণের করুণ কাহিনী

বর্তমান নাম আবু হাফসা। তিনি জন্মান্ধ কিন্তু খুব ট্যালেন্টেড অর্থাৎ মেধা সম্পন্ন। আমরা জানি এই আধুনিক যুগে অন্ধরাও অন্যান্যদের মতো সব কিছুই করতে পারেন, তারা পড়াশোনা করেন, বড় বড় ডিগ্রি অর্জন করেন, আর উন্নত দেশে হলে তো কথাই নেই। যাহোক, আবু হাফসা টরন্টোর একটি ইসলামিক কনফারেন্সে তার ইসলাম গ্রহণের পূর্বের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা আমাদের শিক্ষণীয় হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন।

তিনি ছাত্রজীবনে বই পড়তে খুবই পছন্দ করতেন। পাঠ্য বই পড়ার পাশাপাশি তিনি অন্যান্য বিষয়ের বইও পড়তেন। এক সময় তিনি MalcolmX এর জীবনী পড়লেন, ইসলামের ইতিহাস পড়লেন এবং তখন থেকে তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। ইসলামকে আরো জানার জন্য এবং ইসলাম কবুল করার জন্য মুসলিমদেরকে খোঁজা শুরু করলেন। তিনি চিন্তা করলেন, মুসলিমদেরকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে? তার জানা মতে অনেক মুসলিই পিজ্জা ডেলিভারি দেয়। তাই তিনি বিভিন্ন পিজ্জা স্টোরে ফোন করা শুরু করলেন। পিজ্জাম্যানদের থেকে তিনি কোন সাড়া পেলেন না, কারণ তারা তাকে দেখে কাষ্টমার হিসেবে, ইসলাম নিয়ে তারা মাথা ঘামান না।

এবার তিনি আবিষ্কার করলেন যে এই শহরে সবচেয়ে বেশী ট্যাক্সি ড্রাইভার হচ্ছে মুসলিম। তিনি তখন ট্যাক্সি ড্রাইভারদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করলেন কিন্তু তাতেও ব্যর্থ হলেন। কারণ ইসলাম নিয়ে তাদেরও কোন মাথা ব্যাথা নেই, তারা খুঁজে প্যাসেঞ্জার। তিনি যে শহরে থাকেন (Newfoundland) সেখানে মসজিদ খুবই কম। এবার তিনি একটি মসজিদের ঠিকানা যোগাড় করে সেখানে গেলেন এবং ইসলামকে জানার জন্য, সেখানেও তেমন কাউকে পেলেন না।

তবুও তিনি হাল ছাড়লেন না। তিনি তার পরিবারের সাথে পরামর্শ করলেন যে তিনি নিজ জন্মভুমি ত্যাগ করে যে শহরে সবচেয়ে বেশী মুসলিম থাকে সেখানে যাবেন। যেই কথা সেই কাজ। তিনি প্লেনের টিকেট কেটে টরন্টো শহরে চলে এলেন। এবার তিনি ইসলামকে জানলেন, বুঝলেন এবং শাহাদাহ নিয়ে মুসলিম হলেন (১৯৯৬ সালে)। আলহামদুলিল্লাহ, আবু হাফসা বর্তমানে টরন্টোর একটি বড় মসজিদের ইমাম এবং নর্থ আমেরিকার একজন বিখ্যাত ইসলামিক স্কলার।

তার বক্তৃতার ডিভিডি বাজারে এবং ইউটিউবে পাওয়া যায়। আরেকটি আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে তিনি অসাধারণ কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেন।

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দাওয়াতী কাজের প্রাথমিক যুগে পুরো সমাজটাই ছিল অজ্ঞতার মুঠোয়। তিনি যে দ্বীন প্রচারে নেমেছিলেন তাতে মানুষের দ্বীন গ্রহণের প্রবণতা অতি কম ছিল। তথাপি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্বীন গ্রহণের মূলে কাজ করেছে ব্যক্তিগত সম্প্রীতি, ভাল ব্যবহার, উদ্দেশ্যের খোলামেলা প্রকাশ ও আলোচনা, গোঁজামিলের আশ্রয় না নেয়া, মানুষের প্রতি ভালবাসা, ন্যায়বিচার, ইনসাফ ও ইহসান ইত্যাদি। আমরা যদি দাওয়াতী কাজ করে ভাল ফল পেতে চাই তা হলে নিজেদের সেভাবে প্রস্তুত করে নিতে হবে। আশা করা যায় নিয়মিত দাওয়াতী কাজ একজন ব্যক্তির আত্মগঠনে ব্যাপক সাহায্য করবে। এভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব হবে। তার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই আমরা সকল কাজ করে থাকি।

Abu Hafsah Abdul Malik Clare, Canada
www.facebook.com/AbuHafsahAbdulMalikClare

মুসলিম রোগী দেখে আমেরিকান ডাক্তার অরিভিয়ার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা

সম্প্রতি আমেরিকান শিশু ও নারী বিশেষজ্ঞ ডা. ইউ এস অরিভিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। নিজের ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে ডা. অরিভিয়া বলেন, আমি আমেরিকার একটি হাসপাতালে নারী ও শিশু বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করি। একদিন হাসপাতালে এক আরব মুসলিম নারী এলেন বাচ্চা প্রসবের জন্য। প্রসবের পূর্ব মুহূর্তে তিনি ব্যথায় কাতরাছিলেন। প্রসব মুহূর্ত ঘনিয়ে তাকে জানালাম, আমি বাসায় যাছি, আর আপনার বাচ্চা প্রসবের দায়িত্ব অর্পণ করে যাছি অন্য এক ডাক্তারের হাতে। মহিলা হঠাৎ কাঁদতে লাগলেন, দ্বিধা ও শঙ্কায় চিৎকার জুড়ে দিলেন, 'না না, আমি কোনো পুরুষ ডাক্তারের সাহায্য চাই না। আমি তার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। এমতাবস্থায় তার স্বামী আমাকে জানালেন, সে চাইছে তার কাছে যেন কোনো পুরুষের আগমন না ঘটে। কারণ সে সাবালক হওয়া থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত আপন বাপ, ভাই ও মামা প্রভৃতি মাহরাম পুরুষ ছাড়া অন্য কেউ তার চেহারা দেখেনি।

আমি হেসে উঠলাম আর অপার বিস্ময় নিয়ে তাকে বললাম, অথচ আমি কিনা এমন এক আমেরিকান নারী, হেন কোনো পুরুষ নেই যে তার চেহারা দেখেনি। অতঃপর আমি তার আবেদনে সাড়া দিলাম।

বাচ্চা প্রসবের পরদিন আমি তাকে সাহস ও সান্ত্বনা দিতে এলাম। পাশে বসে তাকে জানালাম, প্রসাবোত্তর সময়ে দাম্পত্যমিলন অব্যাহত রাখার দরুন আমেরিকায় অনেক মহিলা অভ্যন্তরীণ সংক্রমণ এবং সন্তান প্রসবঘটিত জ্বরে ভোগেন। তাই এ সম্পর্ক স্থাপন থেকে আপনি কমপক্ষে চল্লিশ দিন বিরত থাকবেন। এ চল্লিশ দিন পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ এবং শারীরিক পরিশ্রম থেকে দূরে থাকার গুরুত্বও তুলে ধরলাম তার সামনে। এটা করলাম আমি সর্বশেষ ডাক্তারি গবেষণার ফলাফলের নিরিখে।

অথচ আমাকে হতভম্ব করে দিয়ে তিনি জানালেন, ইসলাম এ কথা বলে দিয়েছে। প্রসবোত্তর চল্লিশ দিন পবিত্র হওয়া অবধি ইসলাম স্ত্রী মিলন নিষিদ্ধ করেছে। তেমনি এ সময় তাকে সলাত আদায় এবং সাওম পালন থেকেও অব্যাহতি দিয়েছে।

এ কথা শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। বিস্ময়ে বিমূঢ় হলাম। তাহলে আমাদের এত গবেষণা আর এত পরিশ্রমের পর কেবল আমরা ইসলামের শিক্ষা পর্যন্ত পৌঁছলাম!!

আরেকদিন এক শিশু বিশেষজ্ঞ এলেন নবজাতককে দেখতে। তিনি শিশুর মায়ের উদ্দেশ্যে বললেন, বাচ্চাকে যদি ডান কাতে শোয়ান তবে তা শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। এতে করে তার হৃদস্পন্দন স্বাভাবিক থাকে। শিশুর বাবা তখন বলে উঠলেন, আমরা সবাই সবসময় এ নিয়ম মেনে চলি। আমরা সর্বদা ডান পাশ হয়ে ঘুমাই। এটা আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাক্‌টিস। এ কথা শুনে আমি বিস্ময়ে থ হয়ে গেলাম!!

এই জ্ঞান লাভ করতে আমাদের জীবনটাই পার করলাম আর সে কিনা তার ধর্ম থেকেই এ শিক্ষা পেয়ে এসেছে! ফলে আমি এ ধর্ম সম্পর্কে জানার সিদ্ধান্ত নিলাম। ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনার জন্য আমি এক মাসের ছুটি নিলাম এবং আমেরিকার অন্য শহরে চলে গেলাম, যেখানে একটি ইসলামিক সেন্টার রয়েছে। সেখানে আমি অধিকাংশ সময় নানা জিজ্ঞাসা আর প্রশ্নোত্তরের মধ্যে কাটালাম। অনেক আরব ও আমেরিকান মুসলিমদের সঙ্গে উঠাবসা করলাম। আলহামদুলিল্লাহ এর কয়েক মাসের মাথায় আমি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলাম।

কুরআনের ভালোবাসায় রাশিয়ান তরুণীর ইসলাম গ্রহণ এবং রুশ ভাষায় কুরআনের অনুবাদ

বিশ বছরের অধিককাল আগে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। বর্তমানে তাঁর করা কুরআনের অর্থানুবাদকে বিশেষজ্ঞ ও গবেষকরা অন্যতম সেরা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদ হিসেবে গণ্য করছেন। তিনিই এগিয়ে এসেছেন রাশিয়ায় কুরআনুল কারীমের ক্ষেত্রে অনেক গবেষণাকারী ও বিজ্ঞজনদের মৃত্যুজনিত অভাব পূরণে। তিনি হলেন রাশিয়ান নারী ভেলেরিয়া বোরোচভা (Valeria Borochva)। নিজের কুরআন অনুবাদ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত আমাকে তার প্রেমিক বানিয়েছে আর এ ভালোবাসাই আমাকে তা রুশ ভাষায় অনুবাদে অনুপ্রাণিত করেছে।'

ভেলেরিয়া বোরোচভা কিন্তু কোনো আলেমা বা ইসলাম বিশেষজ্ঞ নন। ইসলামের আইনশাস্ত্র বা ফিকহ বিষয়েও তিনি কোনো ডিগ্রিধারী নন। হ্যা, তাঁর বিশেষত্ব হলো তিনি রাশিয়ান ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ সমাপ্ত করেছেন। সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার ৬০ মিলিয়ন মুসলিমের জন্য যা এক গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি হিসেবে বর্ণিত ও প্রশংসিত হচ্ছে।

আল-আরাবিয়া ডট নেটকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর রুশ ভাষায় মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অনুবাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'আমার স্বামী সিরিয়ার দামেস্ক শহরে বসবাসকারী এক আরব। তাঁর সঙ্গে আমি ১০ বছর কাটাই দামেস্কে। ইতোপূর্বে আমি আরবী জানতাম না। সেখানেই আরবী শিখি। আরবী শেখার পর সেখানে আমি একটি আরবী-রুশ অভিধান রচনা করি।'

তিনি আরও বলেন, 'আমার শ্বশুর একজন ধার্মিক পুরুষ ছিলেন। তাঁর একটি বড় লাইব্রেরি ছিল। সেখানে নিয়মিত অধ্যয়নের পাশাপাশি আমি পূর্ণ আন্ত রিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কুরআন তরজমায় মনোনিবেশ করি। দামেস্ক থেকে ফি বছর মিশরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন একটি গবেষণা একাডেমির উদ্দেশ্যে সফর করতাম। একাডেমিতে ছিল একটি অনুবাদ দপ্তর। দশ পারা অনুবাদ সম্পন্ন করার পর একাডেমির আলেমগণ পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি রিভিউ কমিটি গঠন করেন। আরবী ও রুশ ভাষা জানা তিন বিজ্ঞ আরব ও দুই রাশান আলেম সদস্যের এ কমিটি খুব ভালোভাবে আমার তরজমা পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন।'

বোরোচভা উল্লেখ করেন, প্রথমে এ বোর্ড তাঁর তরজমা সম্পর্কে অনেক টীকা যোগ করেন। পাশাপাশি তাঁরা অনুবাদের ভূয়সী প্রশংসাও করেন। তাঁরা বলেন, অনুবাদ হয়েছে প্রথম শ্রেণীর। এ কারণেই আমরা এর অধ্যয়ন ও মূল্যায়ন চালিয়ে যেতে পারছি। এর মধ্যে যদি অনেক ভুল-ভ্রান্তি পেতাম তবে পর্যবেক্ষণে আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারতাম না। প্রতিবারই তাঁরা অনুবাদ সম্পর্কে বৈঠক বসতেন এবং এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা করতেন।'

তিনি জানান, তাঁকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবে সিরিয়ায় বসবাসের সুবাদে তা সহজেই ডিঙ্গানো সম্ভব হয়েছে। সিরিয়ার সাবেক মুফতী শায়খ আহমদ কিফতারো এবং তার পুত্র শায়খ মাহমুদ কিফতারো সবসময় তাকে সাহায্য করেছেন। প্রেরণা এবং দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি প্রতিনিয়ত অনেক বিষয়ে তাঁদের জিজ্ঞেস করেছি। প্রয়োজনীয় সব কিছুই তাঁদের কাছ থেকে জেনে নিয়েছি। তেমনি ড. যুহাইলিরও সাহায্য নিয়েছি, যার কাছে কুরআনুল কারীমের তাফসীর সংক্রান্ত অনেক কিতাব ছিল।'

তিনি যোগ করেন, 'বহু আলেম আমাকে সাহায্য করেছেন। 'আমি ভেলেরিয়া যদি একা একা বসে থাকতাম তাহলে কুরআনের তরজমায় অনেক ভুল হত।' নিজের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কুরআনের ভালোবাসাই আমাকে ইসলামে দীক্ষিত হতে প্রেরণা ও চেতনা জুগিয়েছে। আমার বিশ্বাস, খোলা মন নিয়ে যিনিই এ কুরআন শেষ পর্যন্ত পড়বেন, শেষাবধি তাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ বলতেই হবে।'

অনুবাদের মুদ্রণ ব্যয় সংগ্রহ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'শেখ যায়েদ ইবন সুলতান (আল্লাহ তার ওপর রহমত করুন) আল-আজহার একাডেমির কাছে একটি চিঠি পাঠান, তরজমা যথার্থ কি-না তিনি তা জানতে চান। নিশ্চিত হবার পর ২৫ হাজার কপি অনুবাদ ছাপার খরচ বহনে আগ্রহ প্রকাশ করেন শেখ যায়েদ। এ পর্যন্ত অর্ধ মিলিয়ন কপি অনুবাদ ছাপা হয়েছে। সৌদি আরবের শায়খ খালেদ কাসেমীও অনেক কপি ছাপিয়েছেন। লিবিয়া ও কাতারে থেকেও এ অনুবাদ ছাপা হয়েছে।'

মুসলিম বালকের হাতে খ্রিস্টান প্রশিক্ষকের ইসলাম গ্রহণ

ফিলিপাইনের জাতীয় সাঁতার দলের প্রশিক্ষক, ম্যানিলা বিশ্ববিদ্যালয় থকে মনোবিজ্ঞানের ওপর ডিগ্রি নেয়া ক্যাপ্টেন আব্দুল কারীম এরসিনাস নিজের ইসলাম গ্রহণের গল্প তুলে ধরেন এভাবে- আল্লাহর অসংখ্য প্রশংসা যে, (এরসিনাস) খ্রিস্টান পরিবারের প্রথম সদস্য হিসেবে তিনি আমাকে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার সৌভাগ্যে ভূষিত করেছেন। আমার জন্ম ও শিক্ষা রাজধানী ম্যানিলার এক খ্রিস্টান পরিবেশে। এখানে কোনো মুসলিম নেই। ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চলগুলোতেই মুসলিমদের অবস্থান সীমিত। বাল্যকালে আমার পরিবার চাইতো গির্জায় আমি বেশি বেশি সময় দেই। বাবা যখন আমাকে গির্জায় নিয়ে যাবার সুযোগ করতে পারছিলেন না, তখন আমার বয়সে বড় এক ভাই এলেন। তিনি রোজ আমাকে গির্জায় নিয়ে যেতেন।

আমি যখন যৌবনে পা রাখলাম, গির্জায় যেতে কোনো আগ্রহ বোধ করছিলাম না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর নিজ ধর্ম খ্রিস্টবাদ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলাম। এ সম্পর্কে বিস্তর পড়াশুনা শুরু করলাম। আমি বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে পেলাম, খ্রিস্ট ধর্মে ক্যাথলিক, প্রোটেস্টান্টসহ নানা বিভক্তি। আমার বিস্ময় বেড়ে গেল যখন দেখলাম ধর্মমতে ব্যাপক বিভক্তি থাকলেও তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদে ঈমান না আনার বেলায় এরা সব এক।

শিক্ষা জীবন শেষে সাঁতার প্রশিক্ষক হিসেবে আমি সৌদি আরব গেলাম। এই প্রথম আমার মুসলিমদের সংস্পর্শে আসা। আগেই বলেছি ফিলিপাইনে থাকতে আমি কোনো মুসলিমের সঙ্গ পাইনি। ফিলিপাইনের মুসলিমরা তাদের অঞ্চলগুলোতেই সীমাবদ্ধ থাকেন। আমরা তাদের সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য পাই না। সরকারি প্রচার মাধ্যম যা প্রচার করে অগত্যা আমাদেরকে তা-ই বিশ্বাস করতে হয়। মিডিয়া দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে, দক্ষিণাঞ্চলে মুসলিমদের সঙ্গে সরকারি বাহিনীর যেসব সংঘর্ষ হয় তা রাজনৈতিক। এর সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। তারা মুসলিমদের একটি উগ্রগোষ্ঠী হিসেবে তুলে ধরে। যারা কেবল তাদের দেশকে দ্বিখণ্ডিত করতে চায়। পেতে চায় তাদের রাজনৈতিক অধিকার। আল্লাহর অসংখ্য শুকরিয়া যে, আজ আমি যাদের একজনে পরিণত হয়েছি সেই মুসলিম ভাইদের কারও দিকে কখনো অস্ত্র তাক করিনি।

আমি সৌদি আরবে যাওয়ার পরেই কেবল মুসলিম সম্পর্কে জানতে পারি। তাদের অবস্থা, আচার ও আকীদা (বিশ্বাস) সম্পর্কে অবহিত হই। আমি যাদের সাঁতার প্রশিক্ষণ দিতাম তাদের মধ্যে এক বালক ছিল। বয়স তার অনূর্ধ্ব তেরো। ক্ষুদে এই মুসলিমের চলাফেরা ও কাজকর্মে লক্ষ্য করতাম দারুণ এক নিয়মানুবর্তিতা। ওর স্বভাব শান্ত। জীবন যাপন সুশৃঙ্খল। আমাকে দেয়া প্রতিশ্রুতির অন্যথা করে না সে কখনো। যথাসময়ে সলাত আদায়ে তার চেষ্টা দেখার মতো। অবসরের সিংহভাগ সময়ই কাটত তার নিবিষ্টমনে কুরআন তেলাওয়াতে।

মুসলিম বালকটির ছিল তীক্ষ্ণ মেধা আর বিস্ময়কর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। আমি তার কর্মকাণ্ডের প্রতি লক্ষ্য করছি, তার সঙ্গ আমাকে আনন্দ দিচ্ছে- এতটুকু বুঝতে পেরেই সে আমার সামনে একগাদা ইংরেজিতে অনূদিত ইসলাম ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের বই উপস্থাপন করল। ইংরেজি অনুবাদসহ কুরআন শরীফের একটি কপিও দিল। সঙ্গে সে এও বলল, 'আপনি এসব পড়লেই আমার সুবিন্যস্ত জীবন যাপনের রহস্য উদ্ধার করতে পারবেন।'

এই প্রথম ইসলাম সম্পর্কে জানার অভিজ্ঞতা। যত পড়লাম আমার সামনে একে একে অজানা জগত উদ্ভাসিত হতে লাগল। আমি বা আমার মতো অন্য কেউ এ জগতের সন্ধান পাননি। এসব পড়ে আমি খুব প্রভাবিত হলাম। বিশেষ করে যখন কুরআন শরীফের তরজমা পড়লাম। এ কিতাবে যে একক স্রষ্টার কথা বলা হয়েছে, তা আমার চিন্তার সঙ্গে মিলে গেল। এ চিন্তায় আমি খুব তৃপ্তি ও স্বস্থি বোধ করলাম। এরপর আমি প্রবলভাবে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হলাম। এমনকি আমি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়ার আগেই নিজের নতুন নামও (আব্দুল করীম) ঠিক করে ফেললাম। আসলে ইসলামের সঙ্গে আমার এই পরিচয়ের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহের পর এই বালকটির প্রতিই আমি কৃতজ্ঞ। এই পরিচয়ের পরই শুরু হয় হিদায়াতের পথে আমার অভিযাত্রা।

আমি খুব গুরুত্ব দিয়ে প্রতিদিন দেখতে লাগলাম আমার সহকর্মীদের সময়মতো সলাত আদায়ের দৃশ্য। আমার কর্মক্ষেত্রেই ছিল মসজিদ। আমি পর্যবেক্ষণ করতাম তাদের সলাত। কী বিস্ময়কর তন্ময়তায় তারা সলাতে নিমগ্ন হত! সবাই একসঙ্গে রুকু করছে, সিজদা করছে! একই ইমামের পেছনে সবাই কত শৃঙ্খলা ও গুরুত্বের সঙ্গে সলাত আদায় করছে!

আমার কর্মস্থলের বন্ধুরাও অনুদারতা দেখাননি। তারা আমাকে জেদ্দায় রাখা এই বালকটির মতই সহযোগিতা করেছেন। যথেষ্ট যত্ন-আত্তি করেছেন। তারা যখন আমার ইসলাম সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা, ইসলাম নিয়ে বেশি বেশি আলোচনা এবং সলাতের ব্যাপারে অনন্ত কৌতূহল লক্ষ্য করলেন, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে কিছু বই পড়তে দিলেন।

তাদের দেয়া গ্রন্থগুলোর মধ্যে ছিল পাদ্রীদের সঙ্গে আহমদ দিদাতের সংলাপের বই। আমি অনেক শুনেছি, মুসলিমরা অন্যদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করে। সৌদি আরবে আসার আগে থেকেই আমার মাথায় এই চিত্র আঁকা ছিল। কিন্তু এখানে এসে আমি এ ধরনের কোনো আচরণ দেখলাম না। সিজওয়ার্টের সঙ্গে আহমদ দিদাতের বিতর্ক অনুষ্ঠানের বই আমার মনে অনেক গভীর প্রভাব সৃষ্টি করল। এই লোকটির ব্যাপারে আমি যার পর নাই বিস্মিত। কিভাবে তিনি একেরপর এক প্রমাণ উপস্থাপন করেন! একটির পিঠে আরেকটি যুক্তি তুলে ধরেন! বর্ণনা আর যুক্তি কোনোটির অভাব নেই তাতে! প্রতিটি আসর পাঠে আমি হেসে মরি আর সিজওয়ার্ট পরাজিত বিষন্ন হতে থাকে। তার প্রতিক্রিয়া ছিল অতৃপ্ত মানুষের নির্ভুল প্রতিক্রিয়া। তার অবস্থান যে ভ্রান্তির পক্ষে, মুসলিমদের আগে তা খ্রিস্টানরাও বুঝতে পারছিল। এক পর্যায়ে আমি আহমদ দিদাতের কাছে চিঠি লিখলাম। এতে আমি তার যুক্তির শাণিত অস্ত্র দিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার অসাধারণ ক্ষমতার প্রশংসা করলাম। তার কাছে এ ধরনের অসত্য থেকে সত্য উন্মোচনকারী বিতর্ক ও সংলাপের বেশি বেশি বই চাইলাম।

এখন আমি খ্রিস্টান থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিম হওয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম। এতদুদ্দেশ্যে আমার সহকর্মীদের কাছে এ জন্য আমার করণীয় কী তা জানতে চাইলাম। আর সেদিনই আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর উপর, তাঁর রসূলের উপর এবং শেষ দিবসের উপর। বিশ্বাস স্থাপন করলাম জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কেও। সে এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি। আমি নিজের অপরিমেয় সৌভাগ্য অনুভব করলাম। আজ অনুগত মুসলিম হিসেবে জীবন যাপন করি। আমি সলাত আদায়ে মসজিদে যাই। সেখানে সিজদাবনত হয়ে এক অপার্থিব তৃপ্তি ও সুখ বোধ করি। জীবন যাপনেও তেমনি অপূর্ব প্রশান্তির আস্বাদ পাই। আমার অতীত জীবন ছিল বিশৃঙ্খলা আর উদ্দেশ্যহীন হট্টগোলে পূর্ণ। আল্লাহ আমাকে সে অবস্থার বদলে আজ আলো, শৃঙ্খলা, সচ্চরিত্র ও মূল্যবোধের জীবন দান করেছেন। সত্যিই আমি মুসলিম ভাইদের সঙ্গ পেয়ে সৌভাগ্যবান। সন্দেহ নেই ইসলাম অনেক মহান ধর্ম। এর সঙ্গে জড়িয়ে ধন্য আমার জীবন।

"বহু কষ্টে পাওয়া ইসলাম"
এক কলেজ তরুণীর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী

অনেকেই আমার কাছে আমার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে জানতে চান এবং আমি তাদেরকে খুব সংক্ষেপেই আমার ঘটনাটা বলে থাকি। কিন্তু আজ আমি আপনাদের সাথে আমার কাহিনীর পুরোটাই শেয়ার করতে চাই কিভাবে আমি এই সত্য ও সুন্দরের ধর্ম ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে আশ্রয় গ্রহণ করলাম। প্রায় আট বছর আগের কথা বলছি; হঠাৎ একদিন এক অদ্ভুত রকমের স্বপ্ন দেখলাম; বিশ্বাস করুন, একেবারেই অদ্ভুত এক স্বপ্ন; স্বপ্নটা কোনভাবেই মেলাতে পারছিলাম না। স্বপ্নটা কতটা অদ্ভুত তা গল্পের বাকিটা পড়লেই বুঝতে পারা যাবে।

ঘটনার প্রথম সূত্রপাত ২০০২ সালে ঃ অ্যাকাউনটিং বিষয়ে পড়াশোনা করার জন্য কিছুদিন আগেই আমাকে নিজ শহর ছেড়ে পাশের উপশহরে আসতে হয়েছে। নতুন জায়গা, আশপাশের মানুষরা সব অপরিচিত, নতুন পড়াশোনা- সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল স্কুলের প্রথম দিনটার কথা। প্রথম যেদিন স্কুলে গিয়েছিলাম সেদিনও ঠিক এমনটাই মনে হয়েছিল।

কলেজের প্রথম দিন; প্রথম ক্লাস শুরু হয়েছে প্রায় পনেরো মিনিট হল। দেখলাম মেয়েটি ক্লাসে প্রবেশ করল। হয়ত এমনিতেই খুব বেশী মনোযোগ দিতাম না ওর দিকে কিন্তু দিলাম কারণ আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানে ওর মতো কাউকে দেখিনি কখনো। আর যদিও বা দুই একজনকে দেখা যায় তাদের দিকে মানুষের দৃষ্টি থাকে ঘৃণা আর অবজ্ঞার। মেয়েটির নাম ফাতিমা; লেবাননের মেয়ে; ইসলামী হিজাবে আপদমস্তক ঢাকা। একটু পরেই শুরু হবে দ্বিতীয় ক্লাস; ক্লাসে ঢুকতেই ফাতিমার দিকে চোখ পড়ল। কেন জানিনা ওর দিকে তাকাতেই মনে হল ও আমার অনেক দিনের পরিচিত কেউ। ওকে জিজ্ঞাস করলাম, "তোমার পাশে বসতে পারি?" সেই যে শুরু বন্ধুত্বের, আলহামদুলিল্লাহ্, এতো বছর পরেও আমরা একে অপরের বন্ধু। পুরো কলেজ লাইফে আমরা ছিলাম একেবারে আত্মার আত্মীয়। আমাদের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা দেখে শিক্ষকরা বলাবলি করতেন আমরা সম্ভবত দু'বোন। কলেজের ঐ বছরগুলোতে আমি নিজে একজন খ্রিষ্টান হওয়া সত্ত্বেও ফাতিমার ধর্মের (ইসলাম) ব্যাপারে ছিলাম চরম আগ্রহী। সেও যতটুকু জানত আমার সাথে শেয়ার করত। দেখতাম ইসলাম সম্পর্কে কথা বলার সময় তার চোখ দুটো কেমন স্পৃহায় ছলছল করে

উঠত। আর এই ব্যাপারটি আমাকে খুব নাড়া দিত। কারণ আমিও একটা ধর্মের অনুসারী অথচ আমার মাঝে ঐ ধরনের কোন বিষয় কাজ করত না।

এমনকি মাঝে মাঝে আমরা আন্তঃধর্ম বিতর্কের আয়োজন করতাম যেখানে আমি কথা বলতে গিয়ে প্রায় রেগে যেতাম যখন দেখতাম নিজের ধর্মের অনেক বিষয়ই আমার জানা নেই বা তার করা কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না। তবে ফাতিমার প্রতি ছিল আমার অগাদ শ্রদ্ধাবোধ। আমার এখনও মনে আছে আমি ভাবতাম কি করে ফাতিমা দিনে পাঁচ পাঁচবার করে সলাত আদায়ের জন্য ওযূ করত, গ্রীষ্মের তপ্ত দুপুরেও নিজেকে হিজাব পরে ঢেকে রাখত, রমাদান মাসে সারাদিন না খেয়ে রোজা রাখত এমন আরো অনেক বিষয়। অথচ নিজেকে একজন ধর্মপ্রাণ খ্রিষ্টান বলে ভাবলেও অনন্ত রবিবার করেও চার্চে যাওয়া হয়ে উঠত না আমার।

আমরা দু'জন দুই ধর্মের হলেও আমাদের জীবন যাত্রার অন্যান্য বিষয়গুলো ছিল একই ধরনের। আমি কখনই ছেলেদের সাথে ঘনিষ্ঠ হতাম না। আর সত্যি কথা বলতে কি, এসব ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই আমার একধরনের লজ্জাবোধ কাজ করে। তবে যে ব্যাপারটি ফাতিমার জন্য স্বস্তির বিষয় ছিল তা হল আমি কখনই খোলামেলা পোশাক পরতাম না যেটা ফাতিমা আর আমার ভিতর সাদৃশ্যগুলোর অন্যতম। একদিন ফাতিমা আর আমি কলেজের ভিতর দিয়ে হেঁটে দুপুরের খাবারে জন্য আমাদের একটা নির্ধারিত জায়গায় যাচ্ছিলাম। আমরা প্রায় ওখানেই খাই। কিন্তু আজ যখন ওখান দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন একটি ব্যাপার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। জায়গাটার দিকে ভালো করে খেয়াল করতেই মনে পড়ল সেই অদ্ভুত স্বপ্নটার কথা যেটা একবছর আগে কলেজে ভর্তির শুরুতেই দেখেছিলাম।

মনে পড়ে গেল আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম আমি যেন একটা হিজাব পরা মেয়েকে আমার ডান পাশে নিয়ে কোথাও হেঁটে যাচ্ছি। আর জায়গাটা ঠিক আজকের এই জায়গা। অন্য কেউ হলে হয়ত স্বপ্নে কি দেখল বা দেখেছিল তা নিয়ে মাথা ঘামাতো না। কিন্তু স্বপ্নের সাথে বাস্তবতার এমন অসম্ভব মিল দেখে আমি একেবারেই হতবাক হয়ে গেলাম। আমার মনে হচ্ছিল আমি আর হাঁটতে পারছিলাম না। হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল। আমি ফাতিমাকে বললাম, "কি আশ্চর্য! এটা কি করে সম্ভব!! আমি তো এটা স্বপ্নে দেখেছি!!" এমন তো নয় যে ফাতিমার আগে আমার মুসলিম কোন বন্ধু ছিল বা আমি কোনভাবে কাউকে চিনতাম। তাহলে না হয় বলতাম তাদের সাথে ঘুরে বেড়িয়েছি আর তাই হয়ত

স্বপ্নে দেখেছি। কলেজে ভর্তি হওয়ার আগেও কখনো আমি এই কলেজে প্রবেশ করিনি। অথচ হুবহু আমাদের খাওয়ার সে জায়গাটায় স্বপ্নে দেখেছি। এই বিষয়টিই আমার কাছে বেশী আশ্চর্যজনক মনে হয়েছিল। যাই হোক, অনেকেই হয়ত বলবেন এই আর এমনকি, স্বপ্ন নিয়ে কে আর এতো মাথা ঘামায়। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, ঐ স্বপ্ন ছিল আমার জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট হিদায়াতের নিদর্শন এবং ফাতিমা আর আমার বন্ধুত্ব হল তাঁরই ইচ্ছার প্রতিফলন। ফাতিমার মাধ্যমেই আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন আমাকে ইসলামের সাথে পরিচিত করালেন।

সেদিনের পর থেকে এক অজ্ঞাত কারণে ইসলামের প্রতি আমার আগ্রহ বহুগুণে বাড়তে থাকে। আমি ফাতিমাকে ইসলাম বিষয়ে অনেক অনেক প্রশ্ন করতে থাকি। লক্ষ্য করি, নিজ ধর্মের প্রতি আমার বিশ্বাস ও আস্থা ক্রমশই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে। আমার নীতি হল আমি যদি কোন বিষয়ে একবার সন্দেহ পোষণ করি এবং নিজেকে প্রশ্ন করে সন্দেহের কোন জবাব না পাই তাহলে ধরে নিই যে আমার সন্দেহ বাস্তব এবং আমার বিশ্বাসে গোলমাল আছে।

আমার সকল সন্দেহের অবসান হল যেদিন ফাতিমা আমাকে আহমেদ দিদাত (রাহিমাহুল্লাহ্)-এর সাথে খ্রিষ্টান পন্ডিতদের বিতর্কের কয়েকটি ডিভিডি দিল। দিনটি ছিল সত্যিই আমার জীবনকে বদলে দেয়ার দিন। বিতর্কগুলো দেখার পর আমার অন্তর চক্ষু দিয়ে উপলব্ধি করলাম এতোদিন যে ধর্মকে পুঁজি করে বেঁচে আছি তা আসলে সত্য নয়। আমি দেখলাম কোন একজন খ্রিষ্টান পন্ডিতও আমার তথাকথিত ধর্মের ব্যাপারে সন্দেহগুলোর সত্য উত্তর দিতে পারেনি। তাহলে আমি কি করে নিজে নিজে আমার সন্দেহ দূর করতে পারি? আমি সত্যিই হতবাক হয়ে গেলাম!! বিশ্বাস করুন, একটুও বাড়িয়ে বলছিনা। ফাতিমার সাথে কথা বলতে বলতে হঠাৎ কেঁদে ফেললাম। আর কাঁদতে কাঁদতেই বাড়ীর দিকে হাঁটতে লাগলাম। আমার বারবার মনে হতে লাগল, "সর্বনাশ!! আমি এতদিন কী করেছি!!"

আমি তখন আমার বন্ধুর সাথে থাকতাম। সেও নিজেকে একজন ধর্মপ্রাণ খ্রিষ্টান বলে মনে করত। আমার ভেঙ্গেপড়া দেখে ও আমাকে সান্তনা দিতে লাগল। ও আসলে বোঝাতে চাচ্ছিল যে ফাতিমা ইসলামের ব্যাপারে আমার মগজধোলাই করার চেষ্টা করছে। প্রথমে শুনে আমারও খানিকটা তাই মনে হল। পরের দিন ফাতিমার কাছে গিয়ে বললাম যে আমি আর ধর্ম নিয়ে তার সাথে কোন কথা বলতে চাই না। উত্তরে ফাতিমা যা বলল তা খুবই সহজ!! কি বলল জানেন? ও

বলল, "তোমার কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া আমার কর্তব্য ছিল। আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি। ইসলাম মানবে কি না মানবে সেটা নিতান্তই তোমার ব্যাপার। শেষ বিচারের দিন তুমি আমাকে এই বলে দোষ দিতে পারবে না যে আমি তোমাকে ইসলামের দাওয়াত দেয়নি।"

বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। আমি আর ফাতিমা এখনও আগের মতোই ভাল বন্ধু। ইতোমধ্যেই আমি ফাতিমার পরিবারের সাথে অনেক বেশী সময় কাটাতে শুরু করেছি। ফলে ইসলাম সম্পর্কেও আমার জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি আগের চেয়ে অনেক বদলে গেছে। তাদের সাথে থাকতেও আমার ভাল লাগে। তাদের ওখানে নেই কোন মদ্যপানের আসর বা কোনরকম হারাম কাজকর্ম। এখনও মনে হয় ঐ সময়টা ছিল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। আটটি বছর আমি আমার বিশ্বাসের চড়াই-উৎরাই দেখলাম। মনে হল যেন আল্লাহ্ আমাকে ইসলামের সঠিক পথ দেখানোর আগেই অন্যান্য মিথ্যা পথগুলো ভালভাবে চিনিয়ে দিলেন।

ইসলামে আসার আগে আমার প্রথম পর্যায়টা ছিল অজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। কোন ধর্মই আমার ছিল না তখন, না খ্রিশ্চিয়ানিটি না ইসলাম। আমি প্রথমে কোনটাই জানতাম না ফলে মানতামও না। আমার দ্বিতীয় পর্যায়টা ছিল বিদ্রোহপূর্ণ। আপনজন কারোর কথাতেই আমি কর্ণপাত করতাম না। সকলকে ত্যাগ করে মত্ত ছিলাম শয়তানি কর্মকান্ডে। ২০০৮ সালটি ছিল আমার জীবনে সবচেয়ে ভয়াবহ। চরম ভুগেছি ঐ বছর। নিজের সাথে লড়েছি। জর্জরিত থেকেছি হাজারো সমস্যায়। যেন জীবন গিয়ে সর্বনাশের অতল গহীনে ঠেকেছিল। ঐ বছরই ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় আমার সাত বছরের প্রেমিকের সাথে। সবখানেই আঘাত আর আঘাত। ভাল সব বন্ধুরা পর হয়ে যেতে থাকে, এসে জুটে যতসব খারাপের দল। পরিবারের একজন মানুষের সাথেও ভাল ব্যবহার করতে পারছিলাম না। আর ঐ সময়টাতেই আমি ফাতিমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতাম। নিজের কাছেই নিজেকে অনেক বড় অপরাধী মনে হচ্ছিল। আমি চাইনি ফাতিমা আমাকে ঐ অবস্থায় দেখে দুঃখ পাক।

হঠাৎ মনে হল, "এসবের মানে কি? কেন এই অপরাধ বোধ? আমি কেন ফাতিমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি? সে তো আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু; আমি যা করছি তা ভুল হলে কেন তা করছি?" এমন হাজারো প্রশ্ন মনে উদয় হতে লাগল। আমি তখনও জানতাম আমি যা করছিলাম তা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না এবং আমি ওসব কাজ বন্ধ না করলে নির্ঘাত জাহান্নামে যেতে হবে। এসব ভাবতাম এবং লজ্জিত হতাম। ফাতিমার মাধ্যমেই আমার ইসলামের সাথে

যোগসূত্র। তার ওসীলায় ইসলামকে সত্য বলে জানার সুযোগ হয়েছে। তাই আমার কাছে মনে হল আমি আসলে ফাতিমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি না বরং আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ানোর চেষ্টা করছি যা অসম্ভব।

শেষ পর্যায়টা ছিল আমার জন্য অনেকটা সতর্ক সংকেতের মত। শেষবার দেখা হল আরেকজন মুসলিমের সাথে; তার সাথে দেখা হওয়াটাই বলতে গেলে আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার মত ঘটনা। সে আমাকে অনেকটা জোর করেই খারাপ কাজগুলো থেকে বাধা দিতে শুরু করল। শুনে অবাক লাগতে পারে কিন্তু সত্যি হল আমি ঐ সময়টাতে কারোর কোন কথাই শুনতাম না। আর তাই হয়ত বাধ্য হয়েই সে আমার উপর জোর খাটাতে শুরু করল। আলহামদুলিল্লাহ্‌, সে সময়মত আমার জীবনে হাজির হয়েছিল। আমি তখন যে মানসিক অবস্থার মধ্যে ছিলাম তাতে মনে হয়না যে কোন খ্রিষ্টান, বা ইহুদী এমনকি কোন নাস্তিক আমার ঐ মানসিক খট্‌কা দূর করতে পারত।

ফাতিমার দেয়া ডিভিডিগুলো দেখার দিন থেকেই আমি জানতাম আমি ইসলাম গ্রহণ করব। শুধু একটা শেষ ধাক্কা বাকি ছিল। আল্লাহ্‌ রাব্বুল 'আলামীন যা করেন ভালোর জন্যেই করেন। তিনি আট বছর আগে আমাকে একটি হিজাব পরা মেয়েকে (যে পরে হলো আমার বেস্ট ফ্রেইন্ড) স্বপ্নের মাধ্যমে জানিয়েছিলেন যে ইসলাম সত্য। তিনি আমাকে দেখিয়েছেন স্রষ্টায় বিশ্বাস না করার কি কষ্ট; তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন নিষিদ্ধ জীবন যাপন কতটা যন্ত্রণাদায়ক; অবশেষে তিনি আমাকে ইসলাম উপহার দিয়ে দেখিয়েছেন মানব জীবনে প্রকৃত সুখ কোথায়। আলহামদুলিল্লাহ, অবশেষে আমি ২০০৯ সালের ১লা জানুয়ারি ইসলাম গ্রহণ করি।

ইসলাম গ্রহণ করলেন আমেরিকার প্রভাবশালী ক্যাথলিক ধর্ম যাজক

যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী ক্যাথলিক ধর্মযাজক কার্ডিনাল থিওডোর ম্যাককারিক ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ওয়াশিংটনের আর্চবিশপ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০১ সালে তিনি ক্যাথলিকদের শীর্ষস্থানীয় ধর্মযাজক বা কার্ডিনাল পদে উন্নীত হন। ১০ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে এক সংবাদ সম্মেলনে পরোক্ষভাবে তিনি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন।

মুসলিম পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কাউন্সিল আয়োজিত এক অনুষ্ঠান তিনি শুরু করেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম পাঠ করে। পবিত্র কুরআনের একটি বাদে প্রতিটি সূরাই শুরু হয়েছে এই মহান বাক্যটি দিয়ে।

ম্যাককারিক বলেন, ক্যাথলিক ধর্মের সামাজিক শিক্ষা হচ্ছে মানবিক মর্যাদা। আপনি যদি কুরআন অধ্যয়ন করেন অথবা ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করেন তবে দেখবেন যে মুহাম্মাদ ﷺ এটাই শিক্ষা দিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে ইসলামিক সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকার প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। ম্যাককারিক বলেন, 'আমরা সবাই খারাপের বিরুদ্ধে, হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে এবং ধ্বংসের বিরুদ্ধে। আল্লাহ এই কাজে আপনাদের সহায়তা করুন।'

'আমরা বিশ্বাস করি ইসলাম এমন একটা ধর্ম যা মানুষকে সাহায্য করে, তাদেরকে হত্যা করে না মুসলিম সম্প্রদায় এই শিক্ষাই দিয়েছেন।'

ইরাক ও সিরিয়ার সমস্য নিয়ে আমেরিকান মুসলিমদের সমর্থন নিয়ে সংশয় দূর করতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

তিনি বলেন, 'অবশ্যই অনেক খ্রিস্টান দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। কাজেই আজ আমি এখানে এসেছি মুসলিম সম্প্রদায়ের ভাইবোনদের প্রতি সমর্থন জানাতে যারা যুক্তরাষ্ট্রে অত্যন্ত শক্তিশালী নেতৃত্ব দিচ্ছেন।' 'আমেরিকান হতে পেরে তারা গর্বিত, তারা আমেরিকাকে ভালাবাসে', যোগ করেন ম্যাককারিক।

"যা কিছু পেয়েছি কুরআন থেকে পেয়েছি" এক জাপানী নারীর কাহিনী

২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের রহস্যময় হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্বের বহু প্রচার মাধ্যম ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যাপক নেতিবাচক প্রচারণা শুরু করে তখন ইসলাম ধর্মের প্রকৃত চিত্র সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন জাপানি যুবতী 'অতসুকু হুশিনু'। ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা ও জানা-শোনার পর অবশেষে তিনি এই ধর্মের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

'অতসুকু হুশিনু' ইন্টারনেটে অনুসন্ধান চালিয়ে সংগ্রহ করেন পবিত্র কুরআন। পবিত্র কুরআনের পরিপূর্ণতা ও সার্বজনীনতা অভিভূত করে অতসুকু হুশিনু-কে। আর এ জন্যই তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে সবার থেকে দূরে থেকে ইন্টারনেট থেকে পবিত্র কুরআন পড়তেন তিনি যাতে এ মহাগ্রন্থের বাণীগুলো ভালোভাবে বুঝতে পারেন। অতসুকু অত্যন্ত কোমল ও দয়ার্দ্র মনের মানুষ। তিনি পড়াশুনা করেছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে। বর্তমানে অতসুকু ইরানে রয়েছেন এবং তিনি ইসলাম ও বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ ﷺ -র পবিত্র আহলে বাইত সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা অর্জনের চেষ্টা করছেন।

ইসলামের প্রতি ঈমান আনার ঘটনা তুলে ধরতে গিয়ে তিনি জানান, ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলার দৃশ্য বার বার দেখার পর প্রথম দিকে তিনি গভীরভাবে মর্মাহত হন। এরপর তার কাছে মনে হয়েছে এই ঘটনার সঙ্গে হলিউডের ছায়াছবিগুলোর বেশ মিল রয়েছে এবং ঘটনাটি এমন রহস্যময় যে এর পেছনে বা নেপথ্যে অনেক চালিকাশক্তি কাজ করছে। এই ঘটনার সঙ্গে ইসলাম ও মুসলিমদের জড়িয়ে অনেক নেতিবাচক কথা প্রচার করা হয়। আর সেসব প্রচারণায় প্রভাবিত না হয়ে বরং এ ধর্ম সম্পর্কে সত্যিকারের চিত্র জানতে আগ্রহী হন অতসুকু। এরপর অনুসন্ধান চালিয়ে দেখতে পান যে ইসলামই হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে মহৎ ও বড় ধর্ম। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পেক্ষাপট প্রসঙ্গে অতসুকু বলেছেন ঃ 'আমি বড় হয়েছি এক বৌদ্ধ পরিবারে। বৌদ্ধরা নিজ ধর্ম বিষয়ে খুবই রক্ষণশীল। আমার এক চাচা জাপানী সংসদে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিনিধি ছিলেন। তাই এ ধর্ম সম্পর্কে আমার গভীর জানাশোনা ছিল। আমার আরেক চাচা ছিলেন পুরোহিত। তিনি খ্রিষ্টানদের বাইবেলও পড়েছেন। ফলে খ্রিষ্ট ধর্মের সঙ্গেও আমি পুরোপুরি পরিচিত ছিলাম। আমার মনে কোনো কোনো বিষয়ে কিছু প্রশ্ন জাগতো, কিন্তু কেউই সেসব প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম হননি।

কিন্তু ইসলামের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর আমার জীবনের রঙ ও ঘ্রাণ বদলে যায়। মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআন প্রথমবারের মত পড়েই মনে হয়েছে যে, সত্যিই তা আসমানী কিতাব এবং অন্য ধর্মগ্রন্থগুলোর সঙ্গে এর রয়েছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তাই বুঝলাম যে ইসলামই প্রকৃত ধর্ম। পবিত্র কুরআন আমার মনের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে এবং দূর করেছে দ্বিধা-দ্বন্ধ। ফলে ইসলামের দিকে আরো গভীরভাবে ঝুঁকে পড়ি এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেই।

নিজের উপর পবিত্র কুরআনের অমূল্য ও অতুলনীয় বাণীর প্রভাব প্রসঙ্গে জাপানী নওমুসলিম অতসুকু বলেছেন ঃ 'আমি যা কিছু পেয়েছি তা এই কুরআন থেকেই পেয়েছি। কুরআনই আমাকে চিনিয়েছে ধর্মের বাস্তবতা ও এর ফলে আমি মুসলিম হয়েছি। এ মহাগ্রন্থ আমাকে দিয়েছে প্রশান্তি এবং কুরআনের নির্দেশনা পেয়েই আমি কঠোর পরিস্থিতিতেও ধৈর্য ধরেছি ও হিযরত করেছি নিজ দেশ থেকে এমন এক দেশে যে দেশ আর তার জনগণ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। এই দেশে আমি ছিলাম আগন্তক বা প্রবাসী; কিন্তু কুরআনের কারণেই আমি এখানে নিঃসঙ্গতা অনুভব করিনি। কুরআন সব সময়ই আমার জন্য আলো ও মুক্তির উৎস। এ মহাগ্রন্থ আমাকে ভয় ও নিঃসঙ্গতার শিকার হতে দেয়নি। যে কেউ কুরআন পড়লে অবশ্যই সুপথ বা মুক্তির দিশা পাবেন। আমি আমার সমগ্র অস্তিত্বের মধ্যে এই মহাসত্যটি অনুভব করছি। কঠিন অবস্থার মধ্যে আমি যখন বিশ্বনাবী ﷺ -এর পবিত্র আহলে বাইতের দু'আগুলি পাঠ করতাম তখন মনে হত যেন স্বয়ং মহানাবী ﷺ ও তাঁর পবিত্র আহলে বাইত যেন আমাকে শিক্ষা দিচ্ছেন। তাই যতই আহলে বাইতের সঙ্গে সম্পর্কিত দু'আ ও যিয়ারত পাঠ করি ততই তাঁদের প্রতি এবং তাঁদের জীবনাদর্শ সম্পর্কে আমার ভালবাসা বাড়তেই থাকে ও তাঁদের মাধ্যমে বাড়তে থাকে আল্লাহপ্রেম।'

জাপানী নওমুসলিম অতসুকু মহানাবী ﷺ -এর পবিত্র আহলে বাইতের সদস্য নাবী-নন্দিনী ফাতিমা জাহরা (রা.)-কে গভীরভাবে ভালবাসেন। আর তাই মুসলিম হওয়ার পর নিজের নাম হিসেবেও বেছে নিয়েছেন জ্যোতির্ময় ও পবিত্র এই নাম। তিনি ফাতিমা (রা.)-র জীবনী ও বাণী অধ্যয়ন করে নিজেকে তাঁরই আদর্শের অনুসারী হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন।

অতসুকু তার স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আগে ইন্টারনেটে ফাতিমা (রা.)-র জীবনী সম্পর্কে জেনেছেন। বিশ্বের সর্বকালের সেরা এই নারীর জীবনাদর্শ তাকে এতটা অভিভূত করেছে যে তিনি নিজেকে তাঁরই অনুসারী হিসেবে গড়ে তুলতে আগ্রহী হন। এই মহিয়সী নারী আলী (রা.)-র সঙ্গে বিবাহ

বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন অতি সামান্য মোহরানা নিয়ে, আর কনের জন্য নির্ধারিত সেই পুরস্কার বা মোহরানাও সংগ্রহ করা হয়েছিল আলী (রা.)-র বর্ম বিক্রি করার মাধ্যমে। এ ঘটনাও জাপানী নওমুসলিম অতসুকুকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ফলে তিনিও নিজের জন্য একই ধরনের পরিস্থিতি কামনা করেছেন মহান আল্লাহর কাছে যাতে নাবী-নন্দিনীর মতই আচরণ করতে পারেন। এরপর অতসুকু বিয়ের মোহরানা হিসেবে স্বামীর কাছে কেবল একটি স্বর্ণমুদ্রা দাবি করেন এবং তা দিয়েই নতুন সংসারের জন্য প্রয়োজনীয় বা জরুরি জিনিসগুলো কেনেন। এত কম পরিমাণ মোহরানা নেয়ার জন্য তিনি মোটেই অনুশোচনা করছেন না, বরং দাম্পত্য জীবন শুরু করার ক্ষেত্রে হাসান-হোসাইনের মাতা ও আলী (রা.)-র স্ত্রী ফাতিমা (রা.)-র আদর্শ অনুসরণ করতে পেরে গভীর আধ্যাত্মিক তৃপ্তি অনুভব করছেন। তার মতে মাত্র এই একটি স্বর্ণমুদ্রা তার জীবনে এনেছে অনেক বরকত বা প্রাচুর্য। আর এ জন্য তথা ফাতিমা (রা.)-র আদর্শ অনুসরণের সুবাদে এতো বরকত পেয়ে অতসুকু আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ।

অতসুকুর পরিবার তার মুসলিম হওয়ার প্রবল বিরোধিতা করেছিল। বিষয়টা তাদের কাছে ছিল বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত। প্রথমে তারা বিষয়টিকে বিশ্বাসই করেননি। পরে দেখলেন যে তাদের মেয়ে নিজেকে অনেক কিছু থেকেই দূরে রাখছে, বিশেষ করে তারা যখন দেখলেন যে অতসুকু হারাম গোশত খাচ্ছেন না তখন তারা বিরোধিতা জোরদার করেন। এবার তারা অতসুকুর উপর অর্থনৈতিক ও মানসিক চাপসহ নানা ধরনের চাপ দিতে থাকে ও তাকে হয়রানি করতে থাকে যাতে সে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে। অতসুকুর সমস্ত বন্ধু ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরাই তাকে ত্যাগ করেন। ফলে পরিবার ও নিজ শহরে নিঃসঙ্গ ও কোনঠাসা হন অতসুকু। অত্যন্ত কঠিন সেই দিনগুলোতে ইন্টারনেটে পবিত্র কুরআনই ছিল তার একমাত্র সঙ্গী যে তাকে যোগ্যতা প্রশান্তি ও সহায়তা। কুরআনের সহায়তার কারণেই তিনি সে সময় নিজ ঈমানের উপর অবিচল থাকতে পেরেছেন। নানা ধরনের চাপ অতসুকুর ঈমানকে বরং আরো মজবুত করে দেয়। ফলে চাপ ও হয়রানি বাড়তেই থাকে। কিন্তু প্রশান্ত হৃদয়ে সব সহ্য করে যান তিনি। এ সময় অতসুকু পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী কেবল আল্লাহর উপরই ভরসা করতেন ও আশার আলো দেখতেন। অতসুকু হুশিনু থেকে ফাতিমা হুশিনুতে পরিণত হওয়া জাপানী নারী ইসলাম সম্পর্কে ভালোভাবে জানার জন্য ইরানে আসেন। কোনো একটি ইসলামী দেশে জীবন যাপন করা ছিল হুশিনুর বহু বছরের স্বপ্ন। তার সেই স্বপ্ন পূরণ হওয়ার ফলে একটি অমুসলিম দেশে মুসলিমত্ব বজায় রাখার কঠোরতা থেকে মুক্তি পান তিনি।

"ইসলামেই পেয়েছি আমার প্রকৃত সত্ত্বা"
আমেরিকান ডাক্তার সারা ট্রাস

উনত্রিশ বছর বয়স্ক সারা ট্রাস একজন আমেরিকান ডাক্তার। তিনি ও তার বাবা ছিলেন খ্রিষ্টান। আর মা ছিলেন ইহুদি। ট্রাস ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আগের কথা তুলে ধরে বলেন, আমি কৈশোরেই ইসলাম সম্পর্কে কিছু না জানা সত্ত্বেও উৎসব অনুষ্ঠানগুলোতে শালীন পোশাক পরার চেষ্টা করতাম। কারণ, তাতে আমি প্রশান্তি পেতাম। সে সময় পর্যন্ত কখনও কোনো মুসলিমকে কাছ থেকে দেখিনি। আর ইসলাম সম্পর্কেও তেমন কিছুই জানতাম না। আশপাশের লোকদের কাছ থেকে কেবল এটা শুনেছিলাম যে ইসলাম নারীদের সঙ্গে সহিংস আচরণ করে। মুসলিমদের কাছে নারী হল দাসী-বাঁদীর মত। কিন্তু ব্যাপক গবেষণার পর এখন এটা বুঝতে পেরেছি যে এ সম্পর্কে আমি যা শুনেছিলাম তা ছিল ভুল। আমি সৌভাগ্যবান যে সত্যকে জানতে পেরেছি।

কৈশোরেই ধর্ম সম্পর্কে সারার আগ্রহ ছিল ক্রমবর্ধমান। ধর্ম সম্পর্কে নানা প্রশ্ন ও অস্পষ্টতা তার জীবনের এক বড় উৎকণ্ঠা হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমার ও সব মানুষের প্রকৃতিই হল ইসলাম। তাই সব মানুষের মধ্যেই রয়েছে ধর্মের প্রতি আকর্ষণ। আসলে ধর্ম ও আল্লাহতে বিশ্বাস হচ্ছে মানুষের এমন এক চাহিদা যা মানুষকে দেয় নিরাপত্তা ও প্রশান্তি। তাই প্রকৃতিগত এই চাহিদা পূরণের জন্য চেষ্টা করতাম। আর এ জন্য নানা ধর্ম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করতাম। কিন্তু যতই জানার চেষ্টা করতাম ততই প্রশ্ন ও অস্পষ্টতা বাড়তেই থাকে।'

সারা ট্রাস তার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রাথমিক আগ্রহের উন্মেষ প্রসঙ্গে বলেন 'আমার আশপাশে কোনো মুসলিম ছিল না। এমন কেউ ছিল না যিনি ইসলাম সম্পর্কে আমার মনে আগ্রহের আলো জ্বেলে দিতে পারেন ও ইসলামের পরিচয় তুলে ধরতে পারেন। যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম সেখানে নানা ধর্মের অনুসারীদের দেখতে পেতাম। বিষয়টা আমার কাছে ছিল বেশ আকর্ষণীয়। তাদের কারো কারো সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর তাদের আচার-আচরণ এবং দৃষ্টিভঙ্গি বা মন-মানসিকতায় আমি অভিভূত হই। বিশেষ করে, এক ব্যক্তির আচার-আচরণ ও মন-মানসিকতা আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়েছে। তিনি ছিলেন অন্যদের চেয়ে ভিন্ন ধরনের। আর ইবাদত-বন্দেগি, আল্লাহভীতি, সততা ও চারিত্রিক পবিত্রতা আমাকে বেশ আকৃষ্ট করে।

আমেরিকান নও-মুসলিম সারা ট্রাস আরো বলেন, 'অবশ্য আমি ও অন্য কেউই জানতাম না যে তিনি ছিলেন মুসলিম। তার আচার-আচরণ আমার কাছে ছিল আদর্শ স্থানীয়। যখন বুঝলাম যে তিনি মুসলিম তখন অনেকেই তার কাছ থেকে আমাকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন। কিন্তু আমি এর পেছনে কোনো যুক্তি দেখলাম না। কারণ, তিনি ছিলেন সেই সময় পর্যন্ত আমার দেখা লোকদের মধ্যে অন্য সবার চেয়ে পবিত্র ও সর্বোত্তম। আমি তাকে তার কোনো কোনো বিশেষ চিন্তা-ভাবনা ও আচরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি জানান যে ধর্মই এর কারণ। তার কথাবার্তা ও আচার-আচরণ ইসলাম সম্পর্কে আমার এতদিনের ভুল ধারণা ভেঙ্গে দেয়। আমি তার কাছে ইসলাম সম্পর্কে জানতে অনুরোধ করি এবং এভাবেই ইসলামের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হই।

ইসলাম এমন এক ধর্ম বা মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে মানানসই। কেউ যদি প্রকৃত অর্থেই সত্যের সন্ধান করেন মহান আল্লাহ তাকে পথ দেখাবেন। ঠিক যেমনটি আমি মহান আল্লাহর দয়ায় ইসলামের মধ্যেই আমার প্রকৃত সত্ত্বাকে খুঁজে পেয়েছি, যা হারিয়ে গিয়েছিল।

ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্তের কারণে কখনও অনুতপ্ত হয়েছেন কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে সারা ট্রাস দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, না তিনি কখনও তা অনুভব করেননি, বরং ইসলাম গ্রহণের পর নবজন্মের অনুভূতি ও প্রশান্তি লাভ করেছেন তিনি। এখন নতুন করে আল্লাহর অসন্তুষ্টি জাগানোর ভয় ছাড়া কোনো ভয় তার মধ্যে নেই। সারা আরো জানান, পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াতও তাকে প্রশান্তি দেয়। কারণ, কুরআন তার প্রশ্নগুলোর জবাব দেয় এবং তাকে ইসলামের আরো কাছে নিয়ে যায়।

উল্লেখ্য, ইউরোপ-আমেরিকায় খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে ইসলাম। বিশেষ করে সেখানকার নারী সমাজ ব্যাপক হারে আকৃষ্ট হচ্ছে এ ধর্মের দিকে। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করেন পশ্চিমে আধ্যাত্মিক শূন্যতা, আত্মপরিচয়হীনতা ও নৈতিক অধঃপতনের প্রতি বিতৃষ্ণার কারণেই ইসলামের দিকে ঝুঁকছেন সেখানকার জনগণ। নারীরা যত্ন, সম্মান ও সুরক্ষার মত যা যা পছন্দ করেন ইসলামের মধ্যে তা পাচ্ছেন বলেও এই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। নারী ও পুরুষের বৈশিষ্ট্য যে ভিন্ন- ইসলামে এর স্বীকৃতি এবং এ ধর্মে পরিবার ও মায়ের প্রতি অফুরন্ত সম্মানও পশ্চিমা নারীদের মন জয় করছে।

পশ্চিমা নারীরা ক্রমেই এটাও বুঝতে পারছেন যে পাশ্চত্য নারীকে একটি পণ্য হিসেবে দেখে থাকে। তাই মর্যাদাহীন এই জীবনের মোকাবেলায় ইসলামের

হিজাব, শালীনতা ও আধ্যত্মিকতা তাদেরকে দিচ্ছে সার্বিক নিরাপত্তার সুদৃঢ় আশ্রয়। শহীদ অধ্যাপক আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মুতাহহারির মতে ইসলাম নারী ও পুরুষের সৃষ্টিশীলতা বা প্রতিভা বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে সচেতন। নারী ও পুরুষের সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং পবিত্র ও যৌক্তিক সম্পর্ক সমাজকে সব ধরনের বিচ্যুতি আর প্রবৃত্তি-পূজা থেকে রক্ষার মাধ্যমে তাদেরকে দেয় প্রকৃত সৌভাগ্য।

আমেরিকান নও-মুসলিম সারা ট্রাস ঘরের বাইরে হিজাব পরে বের হন। তার মতে, ইসলাম তার সামাজিক তৎপরতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি, বরং তিনি এখনও তার পছন্দের কাজগুলো হিজাব পরে অব্যহত রাখছেন। সারা মনে করেন হিজাব মানুষের আত্মিক পবিত্রতা ও সমাজকে অধঃপতন থেকে রক্ষার মাধ্যম। অথচ তার মতে এটা খুবই লজ্জাজনক যে পশ্চিমা সমাজপতিদের অনেকেই এমন একটি জরুরি বা অপরিহার্য বাস্তবকে অন্ধের মত চোখ বুজে নিষিদ্ধ ঘোষণা করছেন।

তিনি বলেন, কখনও এটা ভাবিনি যে একদিন মুসলিম হব। এখন এটা বুঝি যে মুসলিমদের সম্পর্কে আমার আগের ধারণা ছিল পুরোপুরি ভুল। পশ্চিমা গণমাধ্যমের কারণেই এ ধরনের ভুল ধারণা জন্মেছিল আমার মধ্যে। সে সময় পর্যন্ত পশ্চিমা গণমাধ্যম যা-ই বলতো আমি তাই বিশ্বাস করতাম। যে মুসলিমদের আমি পছন্দ করতাম না একদিন সেই মুসলিম সমাজেরই সদস্য হব তা কখনও ভাবিনি। কিন্তু আজ মুসলিম হতে পারার জন্য আমি গর্বিত এবং এ জন্য আমি খুবই আনন্দিত।

সম্পূর্ণ শরীর প্যারালাইজ্‌ড একজন আমেরিকান যুবকের গল্প

আমেরিকান একজন ইসলামিক স্কলার নুমান আলী খান এক খুৎবায় রবার্ট ডেভিলার গল্প সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, তিন মাস আগে আমি আমেরিকার ফোর্টওয়ার্টে খুৎবা দিয়েছিলাম। সেই মসজিদটিতে আমি গত চার থেকে পাঁচ বছরেও যায়নি। কোন এক কারণে তারা সেখানে আমাকে আমন্ত্রণ করেন। আমার খুৎবার বিষয় ছিল দু'আ। খুৎবা শেষ হয়ে গেলে একজন ইজিপশিয়ান যুবক আমার কাছে এসে বলল- আল্লাহ আজ আমার দু'আ কবুল করেছে। জিজ্ঞাসা করলাম আপনার দু'আ কী ছিল? তিনি বললেন রবার্ট ডেভিলার সাথে যেন নুমান আলী খানের সঙ্গে দেখা হয়। নুমান আলী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি রবার্ট ডেভিলা?" সে বলল না। আমি রবার্ট ডেভিলা নই, আমি তার বন্ধু। কিন্তু আমার ধারণা আল্লাহ আমার দু'আ কবুল করা শুরু করেছেন। আমি খুব আগ্রহী হলাম।

রবার্ট ডেভিলা যেখানে থাকে সেখান থেকে ফোর্টওয়ার্টের দূরত্ব ৪০ মিনিটের পথ। তিনি এক সময় কৃষি কাজ করতেন। তার কোন একটা জেনেটিক সমস্যা ছিল যার কারণে জীবনের একটা সময় এসে তার শরীরের গলার নিচ থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীর প্যারালাইজ্‌ড হয়ে গিয়েছিল। এখন সে একটা নার্সিং হোমেই ভর্তি আছে। বেশির ভাগ রোগীই সেখানে ৯০ বা ১০০ বছরের বৃদ্ধ। একমাত্র রবার্ট ডেভিলাই ৩০ বছরের যুবক যার পুরো শরীরই প্যারালাইজ্‌ড। সে গত ১০ বছর যাবৎ এই নার্সিং হোমেই আছে। তার পরিবার তার জন্য এক বিশেষ ধরনের Voice Command Computer-এর ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। যেটা দিয়ে সে তার কণ্ঠের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করে পৃথিবীর খোঁজ খবর রাখত। তার রুমে খৃস্টান পাদরিরা সাপ্তাহিক প্রার্থনার জন্য আসত। আর তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু তার পাশের বেডেই থাকতো। সে ও প্যারালাইজ্‌ড ছিল। তার একটা লিভারের প্রয়োজন ছিল। তারা সবসময় স্রষ্টা, জীবন ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করত। তারা একে অপরে খুবই ভাল বন্ধু ছিল। একদিন রবার্টের বন্ধু খবর পেল তার জন্য এক লিভার ডোনার পাওয়া গেছে। সে খুবই খুশী হল। সে রবার্টকে বলল-আমি একজন ডোনার পেয়েছি আমাকে যেতে হবে। আমি তোমাকে খুবই মিস করব। কিন্তু আমাকে যেতে হবে। রবার্টের বন্ধু চলে যায়। সে আসলেই চলে যায়। অপারেশন টেবিলে লিভার ট্রান্সপ্লান্টের সময় সে মারা যায়। রবার্টের এই বন্ধুটি ও একজন খৃস্টান ছিলেন। তার গলায়

একটা ক্রুশ ঝুলতো সবসময়। তার বোন ক্রুশটা স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে রবার্টকে দিয়ে দেয়। ক্রুশটা রবার্টের বিছানার পাশেই ঝুলতো। সেটা তার বন্ধুর স্মৃতি ছিল।

রবার্ট খুব সাধারণ জীবনযাপন করত। আর সে নার্সিং হোমেই থাকত। নার্সরা তাকে দেখাশুনা করত। একদিন রবার্ট স্বপ্নে একজন লোককে দেখলো। সে তার নাম বলল মুহাম্মাদ। লোকটি আঙ্গুল দিয়ে ক্রুশটি দেখিয়ে রবার্টকে বললেন, আল্লাহ এই জন্য তার নাবীদের পাঠাননি যেন মানুষ তাদের উপাসনা করে বরং আল্লাহ নাবীদের পাঠিয়েছেন যেন মানুষ আল্লাহর উপাসনা করে। আর ঈসা (আ.) হচ্ছেন কেবলমাত্র একজন মানুষ। তিনি (ঈসা) বাজারেও যেতেন খাবারও খেতেন। স্বপ্নটা এখানেই শেষ হয়ে যায়। রবার্ট শুধুমাত্র ঈসা (আ.) নামে একজনকে জানত। এখন সে মুহাম্মাদ নামে একজনের নাম শুনলো যে তাকে বলেছেন, নাবীদের কাজ হল তারা মানুষকে আল্লাহর ইবাদত করতে বলা। সে মুহাম্মাদ ﷺ -কে খুঁজতে লাগল। মুহাম্মাদ ﷺ -কে খুঁজতে গিয়ে ইসলামকে খুঁজে পেলো। সে ঈমান আনলো।

যেহেতু সে একজন মুসলিম সে কুরআন সম্পর্কে জানতে চাইলো। সে খুঁজে খুঁজে কিছু ইন্টারনেটের চেট রুমে গেলো এবং অনুরোধ জানালো কেউ একজন আমাকে কুরআন শিখাও। প্রায় সাথে সাথেই সে একজন ইজিপশিয়ানকে পেয়ে গেলো। সে তাকে আরবী শিখাতে এগিয়ে আসে। সে তাকে আরবী বর্ণমালা শিখিয়ে দেয়। আর যখন আরবী বর্ণমালা শিখা হয়ে গেলো তখন সে কুরআন পড়া শিখলো। সে তার বেডে শুয়ে শুয়ে দশটি সূরা মুখস্ত করল। রবার্টের মনে হল আমি কুরআন পড়তে শিখলাম, নাবী মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে জানা শুরু করলাম। কিন্তু আমাকে জানতে হবে কুরআনের শিক্ষা আসলে কী? সুতরাং সে খুঁজতে লাগল কীভাবে কুরআন বুঝা যায়। কোন এক ভাবে সে আমার (নুমান আলী খান) লেকচারের ভিডিও গুলো পায়। সে সেগুলো দেখা শুরু করে এবং প্রায় সবগুলোই দেখে ফেলে।

এর মধ্যে আরও একটি ঘটনা আছে। সেই নার্সিং হোমেই আরো একজন লোক ছিল সে টুকটাক সার্ভিসিং এর কাজ করত। তার নিজেরই একটা চমৎকার গল্প আছে । সে একজন মুসলিম। কিন্তু সে খুব একটা ধর্ম মেনে চলতো না। তার সবচেয়ে কাছের মসজিদ ছিল প্রায় পঁঞ্চাশ মাইল দূরে। সে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য চার্চে যেতো! সে মুসলিম কিন্তু আল্লাহকে পাওয়ার জন্যে সে চার্চে যেতো! একদিন সে রবার্টের রুমের পাশ দিয়ে যেতে শুনলো "ওয়াল আসরী ইন্নাল

ইনসানা লাফী খুসর.....”। সে রুমে ঢুকে জিজ্ঞেস করল ‘রবার্ট তুমি কী শুনছো?’ রবার্ট বলল কই কিছু নাতো আমিই পড়ছিলাম। সে জিজ্ঞেস করল তুমি মুসলিম হয়েছো? রবার্ট বলল হ্যাঁ আমি মুসলিম হয়েছি। এবার রবার্টের বন্ধু খুবই অবাক হল। কীভাবে আল্লাহ আমেরিকার চার্চের নগরীর মধ্যে একজনকে পথ দেখাতে পারলো। যার বেডের পাশে ক্রুশ ঝুলে থাকে। নাসিং হোমে শুয়ে থাকা ছাড়া নড়াচড়া করার মত যার কোন ক্ষমতা নেই। সে নিজে নিজে বলে উঠলো আমি আবার আল্লাহর কাছে ফেরত আসতে চাই। রবার্ট তার এই ইজিপশিয়ান বন্ধুকে তার অনলাইন শিক্ষক নুমান আলী খানের কথা বলে। এবার সে ও আমার ভিডিওগুলো দেখতে শুরু করল।

একদিন রবার্ট তার বন্ধুকে বলল আমার খুব ইচ্ছা যদি নুমান আলী খানের সাথে আমার দেখা হত। বন্ধুটি বলল ঠিক আছে আমি তোমার জন্য দু’আ করব। ঠিক পাঁচ বছর পড়ে সেই বন্ধুটি আমার খুৎবা শুনতে আসে যেখানে আমি বিগত চার বছরেও যায়নি। জুম’আর সলাতের শেষে সে আমাকে বলল, মনে হয় আল্লাহ আমার এবং আমার বন্ধুর দু’আ পূরণ করতে যাচ্ছেন। আমি বললাম হ্যাঁ আমারও তাই মনে হচ্ছে। আমরা কয়েকজন মিলে সেখানে গেলাম। রবার্টের সাথে দেখা করলাম। আমরা সেখানে চমৎকার কিছু সময় কাটালাম। আমরা সবাই যখন সেখানে যাই নার্সরাও আমাদের দেখে অবাক হল। জিজ্ঞেস করল আপনারা সবাই তাকে দেখতে এসেছেন? তিনি বললেন, কেন দেখা করতে চান? আমরা বললাম ‘তিনি আমাদের অনুপ্রেরণা’। নার্সরা সমস্ত সিকিউরিটি চেকআপ করে তারপর আমাদের যেতে দিল। রবার্ট আমাদেরকে দেখে চমকে উঠল। আমি (নুমান আলী খান) রবার্ট এর সাথে কথা বললাম। তাকে বললাম রবার্ট আমি (নুমান আলী খান) শুনেছি আপনি কয়েকটি সূরা মুখস্ত করেছেন। সে বলল হ্যাঁ। আমি (নুমান আলী খান) বললাম আমাকে একটু শুনাতে পারবেন। সে আমাদেরকে সূরা আসর শুনালো। আমাদের মধ্যে এমন একজন ছিল না যে তাদের চোখ থেকে পানি ঝরছিল না। যখন কেউ আল্লাহর পথে ফিরে আসতে চায় তখন সাহায্য নিয়ে ভাববেন না। আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই আসবে, পথ নির্দেশনাও অবশ্যই আসবে।

আমি (নুমান আলী খান) রবার্টকে নিয়ে তরুণদের উদ্দেশ্য করে আরো কিছু বলতে চাই। আমি (নুমান আলী খান) রবার্টের প্যারালাইজ্ড সম্পর্কে বলেছি। তার একটা বিশেষ হুইল চেয়ার ছিল যেটি তার শরীরের প্রত্যেকটি অংশকে আটকে রাখতো। এটি তার ঘার থেকে পুরো শরীরকে আটকে রাখতো। কারণ শরীরের উপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না এবং তার একটা বিশেষ গাড়ি ছিল

যেটি তার এই হুইল চেয়ারকে আটকে রাখতো। যাতে করে তার শরীরে কোন প্রকার ঝাকুনি না লাগে। সে ঝাকুনি সহ্য করতে পারতো না। একদিন সে অনুরোধ করল সে জুম'আর সলাতে যাবে। সেদিন তার বিশেষ গাড়িটি ছিল না। তাকে একটা সাধারণ গাড়িতে মসজিদে পাঠানো হল এতে তার বেশ আঘাত লাগল। তিনি জুম'আর সলাত থেকে ফিরে এল প্রচন্ড ব্যাথা নিয়ে। ডাক্তাররা বলল রবার্ট আমরা দুঃখিত তোমাকে আর হুইল চেয়ারটিতে বসতে দিতে পারবো না। তোমাকে বেড রেষ্ট এ থাকতে হবে অন্তত আগামী ছয় মাসের জন্য। তুমি যদি এরপর ভাল হও তারপর আমরা ভেবে দেখবো।

আমরা যখন তার সাথে দেখা করতে যাই তখন প্রায় তিন মাস হয়ে গেছে সে পুরোপুরি বিছানায়। তার পিঠে ব্যাথার কারণ ছিল সে জুম'আর সলাতে গিয়েছিল। তারপরও সে আমাদের বলে, আমি আমার জীবনের এত শান্তিপূর্ণ জায়গায় কোনদিন যায়নি। নুমান ভাই আপনি জানেন আমি কি করব? আমি আমার চেয়ারটি ফেরত পেলেই আবারো সলাতে যাবো, আবারো মসজিদে যাব। কারণ আমার জীবনে আমি এরকম অনুভূতি কোন দিন পাইনি। সে এমন একজন লোক যার চোখ এবং মুখ ছাড়া কোনই শারীরিক ক্ষমতা নেই। তারপরও সে বলে আমি মসজিদে শান্তি পাই। রবার্ট আমাকে আরো বলেছে জানেন আমার মাঝে মাঝে মনে হয় আল্লাহ আমার সাথে কেন এমন করলেন? তারপর আমি নিজেই নিজের উপর হাসি। আল্লাহ আমাকে অনেক অনেক কিছু দিয়েছেন। আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ। যদি এটাই হয় প্ল্যান আমাকে ইসলামের পথে আনার জন্য তবে এটাই যথেষ্ট, এটাই ঠিক আছে।

আপনারা এমন অনেক মুসলিম দেখবেন যারা অল্প একটু অসুখ হলেই বলে আল্লাহ আমার সাথে এটা করতে পারলেন? এবং মাঝে মাঝে এ লোকটাই বলে বসে যে আল্লাহ বলতে আসলে কেউ নেই। আমি (নুমান আলী খান) আপনাদের বলতে চাই যদি একজন লোকের এই কথা বলার অধিকার থাকে তবে সে হল রবার্ট ডেভিলার। আমি তার মত সুখী মানুষ দেখিনি। সে একজন পরিপূর্ণ সুখী মানুষ। আল্লাহ যদি রবার্ট ডেভিলাকে পথ দেখাতে পারেন তাহলে তিনি যে কাউকে পথ দেখাতে পারেন।

https://www.youtube.com/watch?v=r7kjLJL7Z1o

একজন আমেরিকান শিল্পী এবং লেখিকার গল্প
'ড্যানিয়েলে লোডুকা'

আমি কখনোই আল্লাহকে খোঁজার গরজ অনুভব করিনি। যখন কিছুই করার থাকত না, তখন কোনো পুরনো বই বা ভবন দেখে সময় কাটাতাম। কখনো কল্পনাও করিনি আমি মুসলিম হব। আমি খৃস্টানও হতে চাইনি। যেকোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রতিই আমার তীব্র বিতৃষ্ণা ছিল। প্রাচীন কোনো গ্রন্থ আমার জীবনযাপনের পথ-নির্দেশ করবে, তা নিয়ে কখনো ভাবিইনি। এমনকি কেউ যদি আমাকে কয়েক কোটি ডলার দিয়েও কোনো ধর্ম গ্রহণ করতে বলত, আমি সরাসরি অস্বীকার করতাম।

আমার প্রিয় লেখকদের অন্যতম ছিলেন বার্টান্ড রাসেল। তার মতে, ধর্ম হলো কুসংস্কারের চেয়ে একটু ভালো, সাধারণভাবে লোকজনের জন্য ক্ষতিকর, যদিও এর ইতিবাচক কিছু বিষয়ও আছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, ধর্ম ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি জ্ঞানের পথ বন্ধ করে দেয়, ভীতি আর নির্ভরতা বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া বিশ্বের যুদ্ধ, নির্যাতন আর দুর্দশার জন্য অনেকাংশে দায়ী ধর্ম। আমার মনে হতো, ধর্ম ছাড়াই তো ভালো আছি। আমি প্রমাণ করতে চাইতাম, ধর্ম আসলে একটা জোচ্চুরি। ধর্মকে হেয় করতে আমি পরিকল্পিত কাজ করার কথা ভাবতাম।

হ্যাঁ, সেই আমিই এখন মুসলিম। আমি ঘোষণা দিয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছি। আর সেটা না করে উপায়ও ছিল না। আমি অনুগত হয়েছি, ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। মজার ব্যাপার হলো, যখন ধর্মাবলম্বনকারীদের সাথে বিশেষ করে মুসলিম হিসেবে পরিচয়দানকারীদের সাথে কথা বলতাম, আমি প্রায়ই লক্ষ করতাম, তারা বিশ্বাস করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। তাদের ধর্মগ্রন্থে যতই সাংঘর্ষিক বিষয় থাকুক, ভুল থাকুক, তারা সবকিছু এড়িয়ে দ্বিধাহীনভাবে ধর্মকে আঁকড়ে ধরে। তারা জানে, তারা কী বিশ্বাস করে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি কখনো আল্লাহকে খুঁজতে চাইনি, সেই ইচ্ছাও আমার কখনো হয়নি। একদিন আমার এক বন্ধু ইসলামে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে বোঝাতে চাইল, আমি ক্ষুব্ধ হলাম। কোনো মানুষ যখন কিছু বিশ্বাস করতে চায়, তখন তার মধ্যে অনেক সময়ই এমন একটা বোধ সৃষ্টি হয়, যার ফলে সেটা গ্রহণ করার ব্যাপারে আগ্রহ তার মধ্যে তৈরি হয়। ধর্মের ব্যাপারেও আমার মধ্যে তেমন একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। আমি ধর্মকে স্রেফ একটা বাজে জিনিস হিসেবে বিশ্বাস করতে চাইতাম। এমন বিশ্বাস কিন্তু কোনো দৃঢ় প্রমাণের

ভিত্তিতে হয়, এমন নয়। স্রেফ অনুমানের উপর গড়ে ওঠে এ ধরনের বিশ্বাস। আমি যখন কোনো ধর্মীয় বই পড়তাম, তখন সেগুলোর প্রতি আমার কোনো পক্ষপাতিত্ব থাকত না, তবে আমার উদ্দেশ্য থাকত তা থেকে ভুল-ত্রুটি বের করা। এর ফলে আমি আমার উদ্দেশ্যের প্রতি অটল থাকতে পারতাম।

আমার কুরআনের পেপারব্যাক অনুবাদটি পেয়েছিলাম বিনা মূল্যে। একদিন দেখলাম, এমবিএ'র কিছু ছেলে কুরআন বিলি করছে। আমি জানতে চাইলাম, এগুলো কি ফ্রি? তারা হ্যাঁ সূচক জবাব দিলে আমি একটা নিয়ে রওনা দিলাম। এসব বইয়ের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। কেবল ফ্রি পেয়েছিলাম বলে নিয়েছিলাম। তবে আমার উদ্দেশ্য ছিল, বইটা পড়ে আরো কিছু খুঁত যদি পাওয়া যায়, তবে ধর্মটির বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে।

আমি কুরআনের যে কপিটা পেয়েছিলাম, সেটির পাতাগুলো মলিন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমি যতই পড়তে থাকলাম, ততই বশীভূত হতে লাগলাম। আমি আগে যেসব ধর্মীয় গ্রন্থ পড়েছি, তা থেকে এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি অর্থ সহজেই বুঝতে পারছিলাম। সবকিছুই ছিল স্পষ্ট। আমার মনে পড়ল, আমার এক বন্ধু যখন আমাকে ইসলামে আল্লাহ কেমন তা বোঝাচ্ছিল, আমি রেগে গিয়েছিলাম, কিন্তু এবার পাতার পর পাতা উল্টে অনেক জায়গায় দেখতে পেলাম তাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।'

মনে হলো, পবিত্র কোরআন সরাসরি আমার সাথে কথা বলছে, আমার জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে। এটা একটা 'পুরনো গ্রন্থ' কিন্তু পুরোপুরি প্রাসঙ্গিক। এর কাব্যিকতা, কল্পনাশক্তি এবং যেভাবে বার্তা পৌঁছে দেয়, তা আমাকে অন্তর থেকে নাড়া দিল। এর অভূতপূর্ব সৌন্দর্য আমি আগে কখনো টের পাইনি। মরুভূমির দমকা হাওয়া যেন সবকিছু উল্টে দিল। মনে হলো আমি যেন কিছু একটার জন্য দৌড়াচ্ছি। কুরআন আমার বোধশক্তিতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। নিদের্শনাবলী দেখে তারপর আমাকে চিন্তা করতে, ভাবতে, বিবেচনা করতে বলল। এটা অন্ধ বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে উৎসাহিত করে। কুরআন মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করে, স্রষ্টাকে স্বীকার করে নিতে বলে, সেইসাথে আধুনিকতা, মানবিকতা, সহমর্মিতার কথা বলে।

অল্প সময়ের মধ্যেই আমার জীবনকে বদলে দেয়ার আগ্রহ তীব্র হয়। আমি ইসলাম সম্পর্কে অন্যান্য বই পড়তে শুরু করলাম। আমি দেখতে পেলাম, কুরআনে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, অনেক হাদিসেও তেমনটা আছে। আমি দেখলাম, পবিত্র কুরআনে অনেক স্থানে নাবী মুহাম্মাদকে সংশোধন করা

হয়েছে। আমার কাছে অদ্ভূত লাগল। এতেই বোঝা যায়, তিনি গ্রন্থটির লেখক নন। আমি নতুন পথে হাঁটতে শুরু করলাম, পবিত্র কুরআনের জ্যোতি আর নাবী মুহাম্মাদের দেখানো রাস্তায়। এই লোকটির মধ্যে মিথ্যাবাদির কোনো আলামত দেখা যায়নি। তিনি সারা রাত সলাত আদায় করতেন, তিনি নির্যাতনকারীদের ক্ষমা করে দিতেন, দয়া প্রদর্শনকে উৎসাহিত করতেন। সম্পদ আর ক্ষমতা তিনি প্রত্যাখান করতেন, কেবল আল্লাহর দিকেই নিবেদনের বিশুদ্ধ বার্তাই প্রচার করতেন। আর তা করতে গিয়ে নির্মম নির্যাতন সহ্য করেছেন।

সব কিছুই সরল, সহজেই বোঝা যায়। আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। এই মহাবিশ্বের জটিল আর বৈচিত্রময় কোনো কিছুই ঘটনাক্রমে ঘটেনি। তা-ই সাধারণ বিষয় হলো, সেই একজন- যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তাকে অনুসরণ করতে হবে। আমার এপার্টমেন্টের কৃত্রিম লাইটিং এবং বাতাসের ওজন নিয়ে ভাবতে ভাবতে পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি পড়লাম ঃ

কাফিররা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমন্ডলীর ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল, এরপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না? (কুরআন ২১ঃ৩০)

এই আয়াত পড়ে আমার মাথা যেন দুই ভাগ হয়ে গেল। এটাই তো বিগ ব্যাং তত্ত্ব, এটা স্রেফ একটা তত্ত্ব নয়। সব জীবন্ত সত্তাই পানি থেকে সৃষ্টি হয়েছে, বিজ্ঞানীরা মাত্র এটা আবিষ্কার করেছে। এটা ছিল অবাক করা বিষয়। এটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে উত্তেজনাকর এবং সবচেয়ে ভীতিকর সময়। আমি বইয়ের পর বই অধ্যায়ন করতে লাগলাম, তথ্যগুলো যাচাই করতে থাকলাম। এক রাতে আমি প্র্যাট ইনস্টিটিউট লাইব্রেরিতে বসে খোলা বইগুলোর দিকে হা করে তাকিয়ে ছিলাম। কী ঘটতে যাচ্ছে, আমি বুঝতে পারছিলাম না। তবে এটুকু অনুভব করলাম, আমার সামনে যা রয়েছে, তা হলো সত্য। আগে আমি যেটাকে সত্য ভাবতাম, সেটার আর কোনা অস্তিত্ব ছিল না।

এখন কি আমার সামনে কোন বিকল্প ছিল? আসলে কোনো বিকল্পই ছিল না। আমি যা আবিষ্কার করেছিলাম, তা অস্বীকার করতে পারছিলাম না, অগ্রাহ্য করতে পারছিলাম না। আগের মতোই চলব, এমনটাও ভাবছিলাম সামান্য সময়ের জন্য। সেটাও সম্ভব ছিল না। আমার কাছে পথ খোলা ছিল কেবল একটাই। ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না আমার সামনে। অন্য কিছু করা মানেই ছিল সত্যকে অস্বীকার করা।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের শালিকা লরেন বুথের ইসলাম গ্রহণ

লরেন বুথকে অনেকে চেনেন। তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের শালিকা। পেশায় তিনি একজন সাংবাদিক এবং সোসাল একটিভিস্ট। তার নিজ মুখেই শুনা যাক তার জার্নি টু ইসলাম-এর ঘটনা।

আমি আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তিনি আমাকে মুসলিমদের সাথে এক মাস সময় কাটানোর একটা সুযোগ করে দিয়েছিলেন। আমার প্রফেশনাল কাজের অংশ হিসেবে আমি রমাদানের শেষের দিকে রাফাতে একটি রিফুজি ক্যাম্পে গিয়েছিলাম এবং সেখানে তাবুতে একটি দরিদ্র পরিবারের সাথে থেকেছিলাম। আমি ঐ পরিবারটির সাথে ইফতার করেছিলাম। তাদের একটি মাত্র পাটি ছিল যেটা তারা রাত্রে ঘুমানোর জন্য ব্যবহার করত। তাবুর মাঝখানে মা বাচ্চাদেরকে খাবার বেড়ে দেয়। যদি কোন খাবার অবশিষ্ট থাকে তা থেকে মা খায়। এই মহিলাটি আমাকে আমন্ত্রণ করল তার তাবুতে। আমার মনে হল সে আমাকে আমন্ত্রণ করল তাজমহলে। সে হাসি দিয়ে বলল, আসসালামু আলাইকুম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম রাফাতে রমাদান কেমন কাটে এত কম খাবার দিয়ে? সে হাসি দিয়ে বলল, আলহামদুলিল্লাহ! আমিও তাদের সাথে ইফতার করলাম। ইফতারে ছিল রুটি ও চানা। আমি মনে মনে অনেক রেগে গেলাম ঈশ্বরের উপর। আমি ভাবলাম ঈশ্বর কেন যে ক্ষুধার্ত মানুষদেরকে আরও ক্ষুধার্ত করে রাখে। এটা কেমন ঈশ্বর যে দরিদ্র মানুষদের জন্য রোযার নিয়ম বানিয়েছে। আমি বোনটির দিকে ঘুরে তাকিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম "সম্মানের সাথে আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাচ্ছি, আপনার ঈশ্বর কেন আপনাদেরকে ক্ষুধার্ত রাখে রমদানের সময়"? বোন আপনি কেন রোযা রাখেন আমাকে একটু বুঝাতে পারেন? সে আমাকে বলল "বোন আমরা রোযা রাখি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে"। তখন আমি ভাবলাম নিশ্চয় ইসলাম আমার জন্য না এটা অন্য মানুষের জন্য।

এবার এক বছর পরের ঘটনা। পরবর্তী বছরের রমাদানে আমি ইরানে গিয়েছিলাম একজন সাংবাদিক হয়ে। এখানে উল্লেখ্য যে আমরা অমুসলিম হলেও মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশে কোন কাজে গেলে সেখানে তাদের মতোই পর্দা করি। আমি ওখানে একটি মসজিদে গেলাম। মসজিদটির নাম ছিল ফাতিমা মসজিদ। আমি ওযূ করলাম এবং তা আমি আগেই শিখে নিয়েছিলাম, আমি

আমার হিযাবটা পড়ে নিলাম এবং মসজিদে অন্যান্যদের মতো নামাযও পড়লাম (যদিও আমি অমুসলিম)। নামাযের পর আমি বললাম "আল্লাহ আমাকে কিছু দিওনা আমার সবকিছু আছে। শুধু তোমাকে ধন্যবাদ জানাই এই ভ্রমণটার জন্য কিন্তু আল্লাহ তুমি প্যালেস্টিয়ান মানুষদেরকে ভুলে যেও না।"

তারপর আমি এই ব্যস্ততম মসজিদে বসে থাকলাম। কিন্তু যখন আমি মসজিদে বসলাম তখন আমি কেমন যেন শান্তি অনুভব করলাম। যে শান্তি আমি আগে কখনও অনুভব করিনি, আমার সব দুশচিন্তা দূর হয়ে গেলো। একটা সময় একজন মহিলা আমার কাছে এসে বলছে আমরা আপনাকে অনেক ভালোবাসি। কিছুক্ষণ পর একটা বাচ্চা এসেও আমাকে একই কথা বলল। আমি আমার সাথী নাদিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম "একে অন্যের প্রতি আন্তরিক ব্যবহার এটা কি মসজিদে সাধারণত হয়ে থাকে"? নাদিয়া বলল আসলে না। আমি সেই রাতটি মসজিদের ফ্লোরে মহিলা সেকশনে অন্যান্য মহিলাদের সাথে থাকলাম। পরের দিন সকালে ফযর ওয়াক্তে আযান দিল আমি তখন মসজিদের ভেতরে ফযরের নামায পড়ে নিলাম। তারপর আমার ভেতরে অদ্ভুত কিছু পরিবর্তন হচ্ছিল।

তেহেরান থেকে লন্ডনে ফিরে যাবার জন্য আমি প্লেনে উঠলাম। যখন প্লেনটা লন্ডনের কাছাকাছি এলো তখন পাইলট এসে আমাকে বলল- আমাদের সাথে এই ভ্রমণটায় থাকার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমরা লন্ডনে ২০ মিনিটে পৌঁছে যাবো। আমি ঐ মূহূর্তে ভাবলাম আমার মাথার হিযাবটা খুলে ফেলবো। কিন্তু আমি তা পারলাম না। সাতদিন পর আমি লন্ডনের একটি মসজিদে ইসলাম গ্রহণ করলাম। যখন আমার কুরআনের কাছে ফিরে যাওয়ার সময় তখন আমি কুরআন খুললাম। কুরআন খুলে প্রথমেই দেখলাম সূরা আল ফাতিহা। আমার মনে হল সূরা ফাতিহা আমাকে শান্তির ধর্মে আমন্ত্রণ জানালো। আমি আর কুরআন পড়া বন্ধ করতে পারলাম না।

কেউ হয়তো আমাকে বলেছিল তুমি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছো। কিন্তু ঈশ্বর কখনও তোমার প্রতি বিশ্বাস হারাবে না। আমার দুই মেয়ে ৮ এবং ১০ বছর বয়স। আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করলাম তখন তারা আমাকে কিছু প্রশ্ন করেছিল তার মধ্যে একটি প্রশ্ন হচ্ছে "মা তুমি যে এখন মুসলিম হলে তুমি কি এখনোও আমাদের মা থাকবে"? আমি উত্তরে বললাম, "আমি এখন মুসলিম, আমি আগের থেকে এখন আরো ভালো মা হবো তোমাদের জন্য"।

https://www.facebook.com/Official.Lauren.Booth/

ক্যানাডিয়ান স্কলার
ড. আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপ্‌স

ড. আবু আমিনাহ বিলা ফিলিপ্‌স জন্মগ্রহণ করেন জামাইকার একটি খৃষ্টান পরিবারে। তিনি বড় হয়েছেন ক্যনাডার টরোন্টো শহরে এবং সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করেন ১৯৭২ সালে। তিনি মদিনা ইসলামিক ইউনিভার্সিটির কলেজ অব ইসলামিক ডিসিপ্লিনস থেকে ১৯৭৯ সালে ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জন করেন। তারপর তিনি ১৯৮৫ সালে রিয়াদের কিং সাউদ ইউনিভার্সিটি থেকে আকীদার উপর মাষ্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। সবশেষে, তিনি ১৯৯৪ সালে ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েল্‌স থেকে ইসলামিক থিউরোলজীর উপর পি.এস.ডি করেন। কেউ কেউ তার নাম দেখে মনে করতে পারেন যে আমিনাহ তো মেয়েদের নাম। হ্যাঁ, তার মেয়ের নাম আমিনাহ আর আরবীতে আবু মানে বাবা। সেই সুবাদে তার নাম আমিনাহর বাবা বিলাল ফিলিপ্‌স।

কীভাবে ইসলামে পর্দাপণ?

তিনি বললেন- "আমি একটি খৃষ্টান পরিবারে বড় হয়েছি। আমি আমার ইউনিভার্সিটিতে থাকাকালিন একটি কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেই, এই ইচ্ছা নিয়ে যেন আমরা পৃথিবীকে একটি ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে পারি। পৃথিবী থেকে অবিচার, অনাচার, নিপীড়ন সব মুছে ফেলতে পারি এবং সমতা গড়তে পারি। কিন্তু কিছুদিন পর আমি বুঝতে পারলাম যে এই কমিউনিষ্ট পার্টিতে থেকে বেশি কিছু করা যাবে না। কমিউনিষ্ট পাটির মধ্যে আমার একটি ঘনিষ্ট বন্ধু ছিল যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এই বিষয়টি আমাকে ইসলামের ব্যাপারে জানার জন্য উৎসাহিত করল। আমি একটি অটো বায়োগ্রাফি করেছিলাম সেটা ছিল ম্যালকম-এক্স-এর ব্যাপারে। যিনি ১৯৬০ ও ১৯৭০ সালে কালো আমেরিকান যাদের ইসলাম গ্রহণ করার পেছনে একটি বড় কারণ ছিল। কিন্তু আমি ভাবলাম আমি কি ম্যালকম-এক্স-এর মত মানসিকভাবে তৈরি আছি এরকম কিছু করার। আমাকে আরো সবচেয়ে বেশি ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে যেই বিষয়টি আকর্ষণ করেছিল সেটি ছিল একটি বই যেটার নাম ছিল "Islam, The Misunderstood Religion" এই বইটির লেখকের নাম ছিল মুহাম্মাদ কুতুব। এই বই পড়ে ইসলামের উপর আমার অনেক ভুল ভেংগে গেল।

আমার একদিন একটি ভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমি ঘুমন্ত অবস্থায় একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম। দেখি আমি একটি অন্ধকার জায়গায় বন্ধি এবং বের

হওয়ার কোন রাস্তা নেই, মনে হচ্ছিল যে আমি মরে যাচ্ছি, আমি বাঁচার জন্য চেঁচামেচি করছি কিন্তু কেউ আমার আওয়াজ শুনতে পারছিল না। যখন কোন অবস্থায় আমি নিজেকে বাঁচাতে পারছিলাম না, তখন আমি হার মানলাম আর ভাবতে লাগলাম আমি এখন মরে যাবো। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি আমার জীবন আত্মসমর্পন করলাম। তখনি আমি ঘুম থেকে উঠে পরলাম এবং বুঝতে পারলাম যে ঈশ্বর বলে কেউ আসলেই আছেন। সে আমাকে সাহায্য করল, যখন কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারছিল না।

আমার মূল লক্ষ্য হল ইসলামের পড়ালেখা ও প্রচারের উপর। আমি পৃথিবীর অনেক ইউনিভার্সিটিতে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেক লেকচার দিয়েছি। ইসলামের নামে যতো ধরনের সহিংসতা হয়েছে আমি ওগুলোকে কখনই সমর্থন করি না।

ইসলাম গ্রহণ করার পর পারিবারিকভাবে আমাকে তেমন কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। কারণ আমার বাবা-মা অনেক খোলা মনের মানুষ। তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাস করেছিলেন। যেমন - নাইজেরিয়া, মালয়েশিয়া, ইয়ামেন, সউদি আরব ইত্যাদি। তাই মুসলিমদের সাথে তাদের অনেক উঠা বসা হয়েছিল ছিল। তাদের অনেক ভাল মুসলিম বন্ধুও ছিল এবং সেই কারণে ইসলামের প্রতি তাদের ভাল ধারণা ছিল। অবশেষে আমার ইসলাম গ্রহণ করার ২১ বছর পর তারাও ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

ড. বিলাল ফিলিপ্স-এর কাতার ভিত্তিক একটি অনলাইন ইসলামিক ইউনিভার্সিটি রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ এই ইউনিভার্সিটিতে বর্তমানে দেড় লাখের উপর ছাত্র-ছাত্রী আছে যারা ২১৯টা দেশ থেকে ইসলামের উপর পড়াশোনা করছে।

আশা করি আগামি ৫ বছরে এর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা মিলিনিয়নে ছাড়িয়ে যাবে। এই ইউনিভার্সিটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে যত বেশী মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া যায়। এই ইউনিভার্সিটির লক্ষ্য টাকা নয়, মানুষকে ইসলামের সঠিক শিক্ষা দেয়া। গালফ ওয়ারের সময় ড. বিলাল ফিলিপ্স আমেরিকান এবং ব্রিটিশ সৈন্যদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াতী কাজ করেছিলেন এবং আলহামদুলিল্লাহ সেই সময় ড. বিলাল ফিলিপ্সের হাতে তিন হাজার আমেরিকান এবং ব্রিটিশ সৈন্য ইসলাম গ্রহণ করেছিল। আল্লাহু আকবার।

আরনড ভ্যান ডর্ন
(যিনি ইসলামের বিরুদ্ধে 'ফিতনা' নামে মুভি তৈরী করেছিলেন)

কে এই আরনড? বিশ্ব বিখ্যাত একজন আলোচিত ব্যক্তি যিনি ডেনমার্কে নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এবং ইসলামের বিরুদ্ধে 'ফিতনা' নামে একটি মুভি বানিয়েছিলেন। যিনি প্রচন্ড ইসলাম বিদ্বেষী ছিলেন, আল্লাহ বিরোধী ছিলেন এবং গ্রীট উইলডার্স এর ইসলাম বিরোধী পার্টির একজন মেম্বার ছিলেন। কিন্তু মহান আল্লাহর পরিকল্পনা ভিন্ন। এই আরনড একদিন সাক্ষ্য দিলেন যে ঃ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল"।

আরনড ইসলাম গ্রহণ করলেন, ইসলামের শুত্রু থেকে হয়ে গেলেন ইসলামের সেবক। এখন তিনি সারা পৃথিবী ঘুরে ইসলাম প্রচার করে বেড়াচ্ছেন, অমুসলিমদের ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বেড়াচ্ছেন।

আরনডের ইসলাম গ্রহণের পর অনেকেই যারা তাকে চিনত তারা খুব আশ্চর্য হয়ে গেলো এবং কেউ কেউ তাকে খুব কটুক্তি করল। সে তার টুইটার একাউন্ট থেকে খুব দুঃখ প্রকাশ করলেন। অনেক রকম কটুক্তির সম্মুখীন হয়েও আরনড কোন রকম উত্তর দেননি, ধৈর্যধারণ করলেন।

আল জাজিরা নেটে একটি ইউনিভার্সিটির কনফারেন্সে আরনড পরিস্কারভাবে বর্ণনা করলেন যে কেন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সে বলল, "আমাকে যারা খুব কাছ থেকে চিনে তারা আমার এই সিদ্ধান্তের পেছনের কারণ জানে। কারণ আমি গত এক বছর ধরে খুব গভীরভাবে ইমলামী বই-পত্র পড়েছি এবং মোটামুটি বুঝেছি। আমার কাছের মানুষ ছাড়া বাকী সবাই আমার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে খুব বিস্মিত হয়েছে। বিশেষ করে আমার ইসলাম বিরোধী কার্যক্রমের ব্যাপারে যারা জানত"।

আরনডের সিদ্ধান্তের পিছনের কারণগুলো তিনি ব্যাখ্যা করলেন, "আমি এমন একজন মানুষ যে বাইরের দিক না দেখে ভিতরের দিকটা দেখে মানুষকে বিচার করি। হগ সিটির কাউন্সিলে একটি মুসলিম কলিগের সাথে আলাপ-আলোচনার পর সে আমাকে একটি মসজিদ দেখিয়ে দিল। যখন আমি সেই মসজিদে গেলাম সেখানকার মুসলিমরা সম্মান এবং ভালবাসার সাথে আমাকে অভিবাদন করল।"

আরনড আরো বললেন, "আমরা সবাই ভুল করে থাকি কিন্তু ভুল করার পরেও আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু অর্থ খুঁজে পাই এবং ঐ অর্থ থেকেই আমার নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ। আমি জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কিছু শিখেছি এবং আমি বিশ্বাস করি যে, এই অভিজ্ঞতাগুলোই আমার মুসলিম হওয়ার পিছনের কারণ। এটা আমার জীবনের নতুন শুরু এবং আমি আল্লাহ ও রসূল ﷺ -এর দিক-নির্দেশনা মতই চলতে চাই"।

আরনডের সাথে একটি সাক্ষাতকার

প্রশ্ন ঃ যদি সম্ভব হয় আপনার ইসলাম গ্রহণ করার প্রধান কারণটি বলুন?

আরনড ঃ আমি কৌতুহল থেকে কুরআন একবার পড়েছিলাম যেটা শুরু করেছিলাম একবছর আগে। আমি কুরআন পড়ার আগে ইসলাম সম্পর্কে নেগেটিভ কথা শুনেছিলাম। কিন্তু আমি যত বেশি কুরআন, সুন্নাহ্ ও হাদীস ইত্যাদি পড়লাম ততবেশী আমার ইসলাম সম্পর্কে পজিটিভ ধারণা হল যে, এটা একটি শান্তিময় পবিত্র ধর্ম। আমার আগে ধর্মীয় শিক্ষা হয়েছিল একজন খ্রিস্টান হিসেবে তাই আমার বিশ্বাস ও মূল্যবোধ অনেকটা ইসলামের সাথে মিলে যায়। তাই আমার জন্য খুব সহজ হয়ে গেল ইসলামকে মেনে নেয়া।

প্রশ্ন ঃ আপনি এমন একটা ইসলাম বিরোধী সংগঠনের সাথে লিপ্ত ছিলেন যারা ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের সাথে যুক্ত ছিল এবং তারা নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর উপর একটা মুভি বানিয়েছিল। কিন্তু এখনতো দেখা যাচ্ছে তারা ইসলামের ব্যাপারে তেমন কিছুই জানে না। তাদের ইসলামের বিরুদ্ধে এই ধরনের মনোভাব কেন?

আরনড ঃ আমি কখনই এগুলোর ব্যাপারে এত বেশী ভাবিনি। কিন্তু অনেকের মতই আমারও ইসলামের ব্যাপারে খুব নেগেটিভ ধারনা ছিল। যেমন তারা মহিলাদেরকে পরাধীন করে রাখে, তারা ওয়েস্টার্ন কমিউনিটির প্রতি আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে থাকে। এরকম আরো অনেক কিছু।

প্রশ্ন ঃ ইসলাম গ্রহণ করার পর আপনার সহকর্মীদের আপনার উপর কি রকম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?

আরনড ঃ যিনি আমার পাটির নেতা ছিলেন তার কাছ থেকে আজ পর্যন্ত কোন রকম প্রতিক্রিয়া পাইনি এবং অন্যান্য সহকর্মীরা আমার সাথে যোগাযোগ করতে ভয় পেত কারণ এটা তাদের ক্যারিয়ারের জন্য খারাপ হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ আপনি অমুসলিমদের যদি দাওয়াত দেন তা হলে কীভাবে দেন?

আরনড ঃ আমি বলি ইসলামকে জানো, ইসলামের ব্যাপারে খারাপ ধারণাগুলো দূর কর তারপর জানতে পারবে যে ইসলাম কত শান্তিময় ও সুন্দর ধর্ম যার সাথে অনেক উচুঁ মানের ইতিহাস রয়েছে। জীবনে টাকার চেয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার রয়েছে যেগুলো পশ্চিমা সাফল্যের মূল মন্ত্র।

প্রশ্ন ঃ প্রাচ্যে ইসলামের সাধারণ মানে হল জঙ্গি এবং মহিলাদের তারা পরাধীন করে রাখে! এই ব্যাপারে আপনার কী মতামত?

আরনড ঃ এই ধরনের বিচারের পিছনের কারণ হলো ইসলামের ব্যাপারে কম জানা। আমাদের দায়িত্ব তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে জানানো।

ভ্যানের ছেলে ইসকান্দার বাবাকে অনুসরণ করে ইসলাম গ্রহণ করেছে। ইসকান্দার ছাড়াও আরো ৩৭ জন যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে আরনডকে অনুসরণ করে। ইসকান্দার বললেন, আমি দেখলাম আমার বাবা আগের চেয়েও অনেক বেশী শান্তিময় এবং হাসিখুশি হয়েছে ইসলাম গ্রহণের পর। তখনই আমি বুঝতে পারলাম যে এই ধর্মে অবশ্যই ভালো কিছু রয়েছে এবং সেটাই ছিল আমার ইসলামের প্রতি আকৃষ্টের মূল কারণ। তারপর আমি কুরআন পড়া শুরু করলাম এবং ইসলামিক প্রোগ্রামগুলোতে যাওয়া শুরু করলাম এবং ইসলামকে আরো বেশী করে জানতে থাকলাম।

http://www.new-muslims.info/converts/arnoud-van-doorn/

আবদুর রহীম গ্রীণ

আবদুর রহীম গ্রীণ একজন ব্রিটিশ ইংরেজ। আমাদের সবার এই মানুষটা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন, আমরা তার জন্য খুবই গর্ব বোধ করি। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে তিনি ইসলামের জন্য দিন-রাত কাজ করে যাচ্ছেন এবং অনেক বাঁধা-বিপত্তির মধ্য দিয়েও ইসলাম প্রচার করে যাচ্ছেন। আবদুর রহীম গ্রীণের ইসলামে প্রবেশের ঘটনা তার নিজ মুখ থেকেই শুনা যাক।

আমার যখন জন্ম হয় তখন আমার বাবা একজন ব্রিটিশ Empire Administrator ছিলেন। আমার বাবা-মা আমার নাম রেখেছিলেন এ্যানযোনি ভেট সোয়াপ গেলভিন গ্রীন। ভেট সোয়াপ ছিল একটি পলিশ নাম। কারণ আমার মা পোল্যান্ডের ছিলেন। আমার মা যেহেতু একজন পলিশ ছিলেন, তাই সে একজন রোমান ক্যাথলিক ছিলেন এবং সে আমাকে এবং আমার ভাই ড্যানকানকে ক্যাথলিক হিসেবেই বড় করেছিলেন। সেই কারণে আমাদের জন্মের পর আমাদেরকে খুব বিখ্যাত একটা ক্যাথলিক স্কুলে ভর্তি করেছিলেন। সেই স্কুলটি যারা চালাতো এবং যারা শিক্ষক ছিলেন তারা ছিলেন ক্যাথলিক Priest। স্কুলটির নাম ছিল Ample Forth College. এটি একটি ধর্মীয় স্কুল হওয়াতে সেখানে নিয়মিত প্রার্থনা হতো। আমাদের প্রার্থনা শুরু হতো এমন একটা গান দিয়ে যেমন ঃ "Hail Mary mother of God, blessed art thou amongst women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus."

এই ছোট বয়সে আমি নিজে নিজেই ভাবতে লাগলাম "কীভাবে ইশ্বরের মা থাকতে পারে"? ইশ্বরের তো কোন শুরু ও শেষ থাকার কথা নয়। কীভাবে ইশ্বরের মা থাকতে পারে? এটাই আমি বসে বসে ভাবতে লাগলাম যে যদি ম্যারী ইশ্বরের মা হয়ে থাকে তবে ম্যারী নিজে তো আরো বড় ইশ্বর, কারণ সে ইশ্বরের মা। এই প্রশ্নগুলো আমার মাথায় ঘুরতে লাগল। যখন আমার বয়স ১৯ বছর তখন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল। একসময় আমরা বেশ কিছু দিন ছুটি কাটালাম মিশরে। সেখানে একজন মুসলিমের সাথে পরিচয় হয় যিনি ইসলামের বিষয়ে অনেক কথা বলত। আমার অনেক প্রশ্ন ছিল আমার নিজ ধর্ম ক্যাথলিজম সম্পর্কে এবং কিছু প্রশ্ন ছিল সন্দেহজনক। এই প্রশ্নগুলো আমি করতাম ঐ মিশরী লোকটির কাছে। একদিন ৪০ মিনিট তার সাথে তর্ক-বিতর্ক করার পর লোকটি আমাকে কিছু সাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল যেমন ঃ

"তুমি কী এটা বিশ্বাস কর যে যীশু ইশ্বর?" আমি বললাম- "হ্যাঁ।" তিনি বললেন- "তুমি কি এটাও বিশ্বাস কর যে যীশুকে ক্রুশের মধ্যে ঝুলিয়ে মারা হয়েছিল?" আমি বললাম "হ্যাঁ"। তিনি বললেন- "তুমি কি বিশ্বাস কর যে ইশ্বর মারা গিয়েছিলেন"? যখন তিনি এই প্রশ্ন করলেন তখন আমার কাছে মনে হল কেউ আমার গায়ে জোরে একটা থাপ্পর দিল। আমি ভাবতে লাগলাম যে কী রকম অস্বাভাবিক পুরো বিষয়টা যে ইশ্বর মারা গেছেন! তখন আমি ঐ লোকটিকে বললাম যে, ইশ্বরকে কেউ মারতে পারে না। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে এগুলো বইয়ের কথা যা আমাদেরকে শেখানো হয়েছে, এগুলো যুক্তি সংগত নয়। আমি ভাবতে লাগলাম আমি এই লোকটির সাথে তর্কে হারবো না।

সেই লোকটি আমাকে অনুরোধ করলো কুরআন পড়ে দেখার জন্য। আমি বললাম ঠিক আছে। তাদের ইসলাম ধর্মের ব্যাপারে, নিয়মনীতি এবং তাদের পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে আমার আরো জানা উচিত। কারণ কুরআনের মধ্যে এমন কিছু অবশ্যই থাকবে যেটা থেকে আমি প্রেরণা পাবো। তাই আমি এই বিষয়ে খোলা মনে গবেষণা করতে লাগলাম, আমি সত্য খুঁজতে থাকলাম। আমার মধ্যে শুধু কৌতুহল ছিল যে কুরআনে কী বলা হয়েছে? তাই আমি একটা কুরআন নিয়ে পড়তে শুরু করলাম। আর আমি যখন কুরআন পড়া শুরু করলাম তখন নতুন নতুন তথ্য পেতে থাকলাম। তখন থেকে নিয়মিত কুরআন পড়তে থাকি এবং বুঝার চেষ্টা করতে থাকি। আমি ঐ মিশরী লোকটিকে দোকানের মধ্যে প্রায়ই নামায পড়তে দেখতাম। তাই তার দেখাদেখি মাঝে মাঝে আমিও নামায পড়ারও চেষ্টা করতাম।

একদিন আমি একটি বইয়ের দোকানে গেলাম যেটি ছিল একটি মসজিদের সাথে লাগানো। যেখানে মুহাম্মাদ ﷺ এবং নামাযের ব্যাপারে অনেক রকম বই ছিল। আমি এই বইগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম যে, বইগুলো খুব সুন্দর এবং তখনই একটা লোক এসে জিজ্ঞেস করল "আপনি কী মুসলিম"? আমি মনে মনে ভাবলাম, "আমি কি মুসলিম"? এই কথাটি দিয়ে লোকটি কী বোঝাতে চাচ্ছেন? আমি ঐ লোকটিকে বললাম- "শুনুন আমি বিশ্বাস করি যে, একটাই ইশ্বর আছেন যিনি হলেন আল্লাহ এবং মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন তার রসূল।" "তিনি তখনই বললেন আপনি আসলে একজন মুসলিম" আমি তাকে বললাম- "ও আচ্ছা ধন্যবাদ"। তারপর তিনি বললেন- "নামাযের সময় প্রায়ই হয়ে গেছে। আপনি কী আমাদের সাথে নামায পড়বেন?" সেদিন ছিল শুক্রবার আর মসজিদটা ছিল পুরোপুরি মানুষে ভরপুর। কিন্তু আমি তো জুমআর ব্যাপারে ঠিক জানতাম না। তাই আমি খুব Confused হয়ে গেলাম। আমি দেখলাম

সবাই নামায পড়ছে। আমিও তাদের সাথে সাথে নামায পড়লাম। নামায শেষে অনেকেই আমাকে ঘিরে দাঁড়ালো পাঁচ মিনিট ইসলাম শিখানোর জন্য। কারণ আমি সত্যি কথাটা জানতাম কিন্তু আমি সত্যিটা অনুসরণ করছিলাম না।

আসলে সেটাই সবচেয়ে খারাপ অবস্থা একটা মানুষের জন্য যে সত্যটা জানার পরও ভুল পথ অনুসরণ করে। আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম এবং আমি সবাইকে বলতাম আমি মুসলিম কিন্তু মানুষ আমাকে সিরিয়াসলি নিত না। কারণ আমি পার্টিতে যেতাম মদ খেতাম এবং মানুষকে ইসলামের ব্যাপারে বলতাম। যেই জিনিসটা আমাকে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন করল তা হচ্ছে আমি দিনে ৫ ওয়াক্ত নামায পড়া শুরু করলাম, আমি শপথ নিলাম আল্লাহর কাছে, যাই কিছুই হোক আমি ৫ ওয়াক্ত নামায পড়ব। এটাই ছিল আমার জীবনের পরিবর্তনের পেছনের সবচেয়ে বড় কারণ। আলহামদুলিল্লাহ।

আবদুর রহীম গ্রীণ মনে করেছিলেন তার বাবা কোন দিন ইসলাম গ্রহণ করবেন না। কিন্তু মহান আল্লাহর ইচ্ছা তিনি তার মৃত্যুর দশদিন আগে ইসলাম গ্রহণ করেন। আবদুর রহীম গ্রীণ বর্তমানে একজন বড় মাপের ইসলামিক স্কলার। আবদুর রহীম গ্রীণ ইংল্যান্ডে একটি অর্গানাইজেশন প্রতিষ্ঠা করেছেন যার নাম IERA – Islamic Education and Research Academy। এই অর্গানাইজেশনের দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে ইউরোপ, আমেরিকা এবং ক্যানাডায় প্রতি দিন শতশত অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করছে। আল্লাহু আকবার। আবদুর রহীম গ্রীণ-এর কার্যক্রম সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য তার ফেইসবুক দেখা যেতে পারে।

https://www.facebook.com/AbdurraheemGreen/

ইসলাম ধর্ম থেকে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ এবং আবার খৃষ্টান ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

নাম স্টিভ রকওয়েল, ক্যানাডিয়ান নাগরিক। এই ঘটনাটি অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই ঘটনায় মুসলিম থেকে খৃষ্টান, আবার খৃষ্টান থেকে মুসলিম। স্টিভ রকওয়েলের পূর্ব পুরুষ ছিলেন মুসলিম। সেই সূত্রে তিনিও ছিলেন মুসলিম। হয়তো পারিবারিক অবহেলা, মুসলিম সোসাইটির অবহেলা ও বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের চারিত্রিক দুর্বলতা ইত্যাদির নানা কারণে এক সময় মুসলিমদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন, ইসলাম থেকে দূরে সরে যান। খৃষ্টানিটি সম্পর্কে জানতে থাকেন এবং খৃষ্টান মিশনারির দাওয়াত পেয়ে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন এবং এই ধর্ম পালন করতে করতে একসময় খুব ভাল খৃষ্টান আলেম হয়ে যান। এরপর দীর্ঘদিন চার্চের পাদ্রির ভূমিকায় দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। তিনি খুবই ভাল বক্তা। বিশেষ করে চার্চের পাদ্রিরা খুব ভাল বক্তা হন।

ইসলামের জন্য ত্যাগ ঃ হিদায়াত দেয়ার মালিক আল্লাহ। তিনি স্টিভ রকওয়েলকে দিয়ে ইসলামের খিদমত করাবেন বলে তাকে হিদায়াত দিলেন। স্টিভ রকওয়েল ইসলামের দাওয়াত পেলেন এবং আবার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। স্টিভ রকওয়েলের ইসলামের জন্য ত্যাগ অপরিসীম। আমি আমির জামান যে মসজিদে জুম্মার সলাত আদায় করি সেই মসজিদের তিনি ইমাম। মসজিদটির প্রতিষ্ঠাতা স্টিভ রকওয়েল নিজে যা টরন্টো শহরের হার্ট অফ দ্যা সিটিতে অবস্থিত। সেই এলাকা কমার্সিয়াল প্লেস হিসেবে পরিচিত (ডানডাস স্কোয়ার)। তিনি যেই জায়গায় মসজিদ করেছেন সেই জায়গার দাম স্বর্ণের দামের চেয়েও বেশী মূল্যবান। এই মসজিদ তিনি নিজের খরচেই পরিচালিত করে থাকেন।

জুম্মার খতিব ঃ আলহামদুলিল্লাহ, প্রতি জুম্মায়ই তিনি বিশ্বের সমসাময়িক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে খুতবাহ দেন। তিনি কাউকে ভয় করে কথা বলেন না। তিনি খুব স্পষ্টভাষী এবং কাস্টমাইজ করে কোন খুতবাহ দেন না। এই মসজিদে দু'টি জুম্মা হয়। (আমেরিকা-ক্যানাডার প্রায় সব মসজিদেই এক ঘন্টার ব্যবধানে দু'টি জুম্মা হয়)। এই মসজিদের এক পাশে রায়ারসন ইউনিভার্সিটি। প্রথম জুম্মার খুতবা দেন সাধারণত রায়ারসন ইউনিভার্সিটি প্রফেসরগণ এবং দ্বিতীয় খুতবা দেন স্টিভ রকওয়েল। জুম্মার মুসল্লিদের মধ্যে হয়তো অর্ধেকই রায়ারসন ইউনিভার্সিটির মুসলিম ছেলেমেয়েরা।

ইসলামের দাওয়াতী কাজ ঃ ইসলামের দাওয়াতী কাজের জন্য তার ত্যাগ অসাধারণ। তার মসজিদের নিকটেই টরন্টোর বিখ্যাত শপিংমল ইটন সেন্টার। এই শপিংমলের সামনে আমাদের একটি টিম প্রতি শনি ও রবিবারে টেবিল নিয়ে বসে এবং পথচারীদের মধ্যে হাজার হাজার দাওয়াতী মেটারয়াল বিতরণ করে থাকেন। অনেকেই অন দ্যা স্পটে ইসলাম গ্রহণ করেন। যাহোক, স্টিভ রকওয়েল এই দাওয়াতী কাজের জন্য নানা রকম সহযোগীতা করে থাকেন। মাঝে মাঝে তিনি রায়ারসন ইউনিভার্সিটির অমুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের দাওয়াত দেন জুম্মার খুতবা শুনার জন্য। মসজিদের ভিতরে শেষের দিকে এক সারি চেয়ার দেয়া হয় তাদের বসার জন্য। আলহামদুলিল্লাহ অনেকেই হিদায়াত পায় এই খুতবা শুনে।

টিভি শো ঃ তিনি প্রতি শনিবার ভিশন টিভিতে Call to the Minarat নামে একটি টিভি শো পরিচালনা করে থাকেন। এই টিভি শোটি মূলতঃ Comparative Religion-এর উপরে। এই অনুষ্ঠান দেখে নিয়মিত প্রচুর অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে থাকে। আলহামদুলিল্লাহ এই টিভি চ্যানেলের খরচও তিনি নিজেই জুগিয়ে থাকেন।

নাম কেন স্টিভ রকওয়েল? তিনি তার নাম কেন পরিবর্তন করেননি এই নিয়ে মাঝে মাঝে প্রশ্নের সম্মুখিন হন। একবার এক বাংলাদেশী কমিউনিটি প্রোগ্রামে গেষ্ট স্পিকার হিসেবে এসেছিলেন। ঐ একই প্রশ্ন বাংলাদেশীদের মধ্য থেকে একজন তাকে করেছিলেন। তার প্রশ্নের উত্তরে তিনি প্রশ্নকর্তাকে জিজ্ঞেস করলেন 'আপনার নাম কি?' প্রশ্নকর্তা বললেন 'জামাল হোসেন'। এবার স্টিভ রকওয়েল বলছেন আপনি জামাল হোসেন নাম নিয়ে যতোটা না অমুসলিমদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে যেতে পারেন আমি স্টিভ রকওয়েল নাম নিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশী দ্বীন ইসলামের দাওয়াত নিয়ে অমুসলিমদের নিকট যেতে পারি। আমার এই নামের জন্য অমুসলিমরা আগ্রহ করে আমার কথা শুনে থাকে। কথাটি সত্যি, নর্থ আমেরিকা বা ইউরোপে যারাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন তাদের বেশীরভাগই তাদের পূর্বের নামের কিছু অংশ নতুন নামের সাথে রেখে দিয়েছেন এতে দাওয়াতী কাজ করতে সুবিধা হয়। একজন অমুসলিম তখন চিন্তা করেন যে এই লোক তো আমার মতোই অমুসলিম ছিল। যেমন ঃ ইউসুফ স্টেস, আব্দুর রহিম গ্রীন, ইউসুফ চেম্বারস, আব্দুল মালেক ক্লেয়ার, বিলাল ফিলিপস, আব্দুল্লাহ হাকীম কুইক প্রমুখ।

https://www.youtube.com/watch?v=Kj0DAaF-XFE

ইসলাম সম্পর্কে পৃথিবীর বিখ্যাত অমুসলিম ব্যক্তিগণের মন্তব্য

Former U.S Attorney General Ramsey Clark: Islam is the best chance the poor of the planet have for any hope of decency in their lives. It is the one revolutionary froce that cares about humanity. (1998)

U.S Supereme Court Justice Anthony Kennedy: Muslims are decent, brilliant, and talented with a great civilization and traditions of their own, inlcuding legal traditions. American know nothing about them.

Napoleon Bonaparte: I hope the time is not far off when I shall be able to unite all the wise and educated people and establish a uniform regime based on the principles of Quran which is true.

Sir George Bernard Shaw: I have always held the religion of Muhammad in high estimation because of its wonderful vitality.

H.G. Wells: The Islamic teachings have left great traditions for equitable and gentle dealings and behaviour, and inspire people with nobility and tolerance.

Sarojini Naidu: It was the first religion that preached and practiced democracy;

A. S. Tritton: The picture of the Muslim soldier advancing with a sword in one hand and the Qur'an in the other is quite false.

Gibbon: The good sense of Muhammad despised the pomp of royalty.

Edward Gibbon and Simon Oakley: The greatest success of Mohammad's life was affected by sheer moral force.

Edward Montet: Islam is a religion that is essentially rationalistic in the widest sense of this term considered etymologically and historically.

Michael Hart: My choice of Muhammad who was the only man in history who was supremely successful on both the secular and religious level.

Carly Fiorina, Ex-CEO of Hewlett-Packard: The technology industry would not exist without the contribution of Arab mathematicians.

Mahatma Gandhi: I became more than ever convinced that it was not the sword that won a place for Islam in those days in the scheme of life.

অভিভাবকগণ একটু খেয়াল করি

যে সকল পিতা-মাতাদের সন্তান বড় হয়ে গেছে অর্থাৎ ইউনিভার্সিটি পাশ করে গেছে অথবা বিয়ে-স্বাদী হয়ে গেছে তারা মনে করেন যে, বিষয়টি আমাদের না। আমাদের সন্তানতো বড় হয়েই গেছে, তারা তো পড়াশোনা শেষ করে প্রফেশনাল হয়ে গেছে। আমি এখন আল্লাহ-বিল্লাহ করে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিব। আমরা কি কখনো গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি যে আমার ইউনিভার্সিটি পাশ করা প্রফেশনাল ছেলে বা মেয়ে কি প্রকৃত মুসলিম হয়েছে? তারা কি পরিপূর্ণভাবে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জীবন-যাপন করছে? তাদেরকে প্রকৃত মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমার কি কোন অবদান আছে?

শিশু, বালক, যুবক, বৃদ্ধ সকলের মন এক চলমান মেশিন। এ মেশিন সর্বদা সচেতন ও অবচেতনমনে ইনপুট (Input) গ্রহণ করছে। সে ইনপুট প্রসেস (Process) হয়ে আউটপুট (Output) বেরোয় মানুষের কর্ম ও দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে। ফলে কেউ হয় দানশীল, কেউ উদ্ধত, কেউ হয় আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা আবার কেউ হয় বিপথগামী। আমার শিশু কোন না কোন কিছু শিখছে। প্রতিদিন সে নিত্য নূতন কায়দা রপ্ত করছে। এটা ভাবা যাবে না যে আমরা যদি কিছু না শেখাই তাহলে কোথা হতে সে শিখবে? আসলে এই ধারণাটা ভুল। আশেপাশের পরিবেশ, টিভি, রেডিও, স্কুল-কলেজ, ইন্টারনেট, পত্র-পত্রিকা, আমার আচরণ, আমার স্ত্রীর আচরণ সবকিছু হতে প্রতিনিয়ত সে ইনপুট সংগ্রহ করছে।

সুতরাং আমি কি সতর্ক হবো না? আমি কি চাই না যে আমার শিশুর মনে ভাল উপাদানগুলি বেশী করে ঢুকুক? আমি কি চাই না যে আমার শিশু একজন ভাল একাডেমিক হওয়ার পাশাপাশি একজন ভাল মুসলিম হোক? আমি কি চাই না যে সে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হয়ে পিতামাতার মুখ উজ্জ্বল করার পাশাপাশি কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে দ্বীনের উপর অনর্গল বক্তৃতা দিয়ে অমুসলিমদের হিদায়াতের নূর দেখাক?

আসুন চোখ বন্ধ করে খানিক চিন্তা করি। হলিউড বলিউড বা এর অন্ধ অনুসারী অন্য টিভি চ্যানেলগুলি প্রতিনিয়ত মুভি আর বিচিত্র অনুষ্ঠান চালিয়ে যাচ্ছে। বলিউডের প্রভাব এখন প্রযুক্তির আশীর্বাদে সর্বত্রই দৃঢ়ভাবে প্রসারিত। আমি এবং আমার সন্তানেরা প্রতিনিয়তই এগুলি হতে মনের খোরাক নিচ্ছি। শিশুরা অনুকরণ প্রিয় হবার কারণে এসব বিনোদনের মৌলিক বিষয়গুলির সাথে খুব

সহজে পরিচিত হয়ে যাচ্ছে। এভাবেই তদের মননশীলতার উপর ঐসব উপাদানগুলির স্থায়ী প্রভাব পড়ছে। আসুন এবার চিন্তা করি এসব অখাদ্য কুখাদ্যের (অপসংস্কৃতির) বিপরীতে আমি নিজে ও আমার সন্তানরা কী ইনপুট নিচ্ছি? খোদ হলিউডের জন্মস্থান হতেই এখন এর কুরুচি আর বিকৃত সংস্কৃতির বিরুদ্ধে শ্লোগান উঠেছে। এর বদৌলতে ছেলেমেয়েরা বইয়ের চাইতে বন্দুকের প্রতি বেশী আগ্রহী হয়ে উঠেছে। ড্রাগ, ভায়োলেন্স, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব, পারিবারিক বন্ধন শিথিল হওয়া ইত্যাদির অবদানে বলিউড সংস্কৃতি বেশ নাম করেছে।

বলিউড সংস্কৃতি আজ এমন এক টর্ণেডোর নাম যা সারা বিশ্বের আনাচে কানাচে লজ্জা শরমের অবশিষ্টাংশটুকুও ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে ফেলতে চায়। এক আমেরিকান আইডলই দুনিয়া কাঁপানোর জন্য যথেষ্ট। নিজেকে এবং আমার পরিবারকে এগুলি হতে বিরত রাখার দায়িত্ব আমারই। এটি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসের গভীরতার উপর নির্ভর করে। তবে সন্তানের চরিত্র গঠনে একটি ভারসাম্যপূর্ণ স্ট্রাটেজীর অংশ হিসেবে হলিউড-বলিউডের কুখাদ্যের পাশাপাশি যদি কিছু পুষ্টিকর ভালো খাবার সরবরাহ না করা হয় তাহলে এ সন্তানটি যে কি হবে তা এখন হয়তো আমরা বুঝবো না কিন্তু ভবিষ্যতে যখন বুঝবো তখন আর আমাদের করার কিছু থাকবে না। তখন চিন্তা করে বা চেষ্টা করেও কোন কুলকিনারা করা যাবে না। কারণ আমার শিশু তখন বড় হয়ে যুবক হয়ে গেছে। তার নিজস্ব মূল্যবোধ তৈরী হয়ে গেছে। এখন তার নতুন তাগুতি বিশ্বাস (conviction) ও মূল্যবোধের দাওয়াতী কাজের প্রথম টার্গেট হবো আমি নিজে ও আমারা স্বামী/স্ত্রী। আমরা কবরে বসে তাদের কাছ থেকে কোন দু'আ পাবোনা।

হাইস্কুল পাস মেয়েরা আজকাল নিজেরাই একটা আদর্শ তৈরী করে নেয়। সেটি হতে পারে Rock n Roll এর আদর্শ, কিংবা আমেরিকান আইডলের আদর্শ, কিংবা ইন্ডিয়ান কোন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী গায়ক বা গায়িকার আদর্শ। শুধু তাই নয়, এর বাইরে সব কিছুকে তারা সেকেলে বা নিম্নস্তরের জিনিস বলে মনে করে। শুধু নিজেরা এই আদর্শ অনুসরণ করেই ক্ষান্ত হয়না, অন্যদেরকেও সে আদর্শের অনুসারী বানানোর চেষ্টা করে।

আমরা পিতামাতারা জেগে উঠি, সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে, সঠিক ইসলামী শিক্ষায় নিজেদের ও সন্তানদের দীক্ষিত করার এটাই প্রকৃষ্ট সময়। আর অবহেলা না করি।

ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজের উদ্দেশ্য

সকল প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলার।

আমরা মূলতঃ 'প্যারেন্টিং এবং ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট' নিয়ে গবেষণা করি। আমাদের প্রকাশিত বইগুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে পারিবারিক উন্নয়ন। আমরা সকলেই চাই এই দুনিয়া এবং আখিরাত দুই দিকেই সফলতা। প্রকৃত ইসলামিক জ্ঞান এবং সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা ছাড়া এটা কিছুতেই সম্ভব না। আমাদের মতো যারা ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া জেনারেল এডুকেশনে এডুকেটেড তাদের ইসলামের উপর তেমন কোন একাডেমিক এবং সিলেবাসভিত্তিক পড়াশোনা নেই। আমরা দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে যতোটুকুই জানি তা শুনে শুনে বা দুই একটা বই পড়ে যার বিস্তৃতি বা গভীরতা নগণ্য। আমরা যারা দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ও আমলযোগ্য জ্ঞান অর্জন করতে চাই তাদের সামনে এক মহাসমুদ্র, কোথা থেকে শুরু করবো আর কোথায় গিয়ে শেষ করবো বুঝে উঠা মুশকিল! এছাড়া আমাদের সামনে ইসলামিক স্টাডিজের উপর বাস্তব জীবনধর্মী কোন পরিপূর্ণ সিলেবাসও নেই। বরং রয়েছে বাজার ভরা আনঅথেন্টিক বই-পত্রের সমারোহ। আমরা যারা ব্যস্ত জীবন-যাপন করি তাদের সময়-সুযোগ করে সব দিক মিলিয়ে ইসলামকে জানার জন্য প্রচুর পড়া-শোনার সময়ও হয়ে উঠে না।

এই বিষয়ে আমরা নিজেরা (স্বামী-স্ত্রী) যেহেতু ভুক্তভুগি ছিলাম তাই অন্যদের কথা চিন্তা করে দ্বীন ইসলামের উপর আমাদের ১২ বছরের অধ্যয়ন, বিভিন্ন কোর্স এবং গবেষণার ফল ১২টি বইতে বিষয়ভিত্তিকভাবে উপস্থাপন করেছি। কোন পরিবার যদি ১২টি বইয়ের এই সিলেবাস অধ্যয়ন করেন তাহলে তাদের সঠিক ইসলামের উপর ওভারঅল একটা নলেজ হবে। আমরা ১২ বছরে যা শিখেছি আশা করি এই ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজের ১২টি বই অধ্যয়ন করলে তা এক বছরেই পাওয়া সম্ভব, ইনশাআল্লাহ। একই কথা চিন্তা করে বড়দের ডেভেলপমেন্টর পাশাপাশি আমরা আমাদের সন্তানদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলা মিডিয়ামের জন্য ১২টি বই বাংলায় এবং ইংরেজী মিডিয়ামের জন্য ১২টি বই ইংরেজীতে প্রকাশ করেছি। এই বইগুলো পড়লে বড়রাও সমভাবে উপকৃত হবেন।

আমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনই মূলতঃ IT Professionals, আমাদের মেধা ও একাডেমিক কোয়ালিফিকেশনকে আমরা সঠিক দ্বীন বুঝার কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি, তাই প্রকৃত পক্ষে আমরা হলাম Students of Knowledge। আমাদের বইগুলো প্রকাশনার সমস্ত ব্যায় IFD Trust-কে সদাকা করে দেয়া হয়েছে। এই বইয়ের বাজারজাতকরণ এবং বিক্রি সবই Non-commercial। এই বইয়ের বিক্রয় মূল্য সমাজের কল্যাণে পরবর্তী ভার্শন প্রিন্টিংয়ে ব্যবহৃত হবে, ইনশাআল্লাহ।

পারিবারিক গিফ্‌ট

আমরা যখন কোথাও দাওয়াত খেতে যাই সেখানে সাধারণত দই-মিষ্টি, ক্রোকারিজ, শোপিস বা অন্য কোন গিফ্‌ট সামগ্রী নিয়ে যাই উপহার হিসেবে। যা একটি পরিবারের পারিবারিক ডেভেলপমেন্টে কোন ভূমিকা রাখে না। আমরা কি কখনো গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি যে এই উপহারের ধরণ একটু পরিবর্তন করলে আমরা উভয় পক্ষই অসীম উপকৃত হতে পারি? তাই আমরা যখন কোন পারিবারিক দাওয়াত খেতে যাই তখন এই ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজের ১২টি বই সুন্দর র‍্যাপিং করে একটি সুন্দর গিফ্‌ট ব্যাগে গিফ্‌ট হিসেবে উপহার দিতে পারি। এতে দাওয়াত খাওয়াও হলো এবং ঐ পরিবারটিকে দ্বীন ইসলামের দাওয়াতও দেয়া হলো। এতে আল্লাহর রহমত নিহিত থাকবে দু'পক্ষের জন্যেই।

Acknowledgement

It is acknowledged that some of the texts were sourced online and from various other sources, and as such it was not possible to cite specific references. The sole objective of this book is Dawah in order to raise understanding and interfaith tolerance. There is no intent to achieve commercial or financial gains of any nature.

- কুফরীর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ - সালেহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান
- ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও ইসলাম - ড. মানে' ইবন হাম্মাদ আল-জুহানী
- নিফাকের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ - সালেহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান
- ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব - মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব আত-তামীমী (রহ.)
- গান-বাদ্য ও এর কুপ্রভাব - আলী হাসান তৈয়ব
- পোশাক যখন বিপদের কারণ - আলী হাসান তৈয়ব
- অসহিষ্ণু মৌলবাদীর অপ্রিয় কথা - ড. আবু জাফর
- সফল প্রবাস জীবন - সারওয়ার কবীর শামীম
- লালন-সঙ্গীত (১ম খন্ড) - ফকির আনোয়ার হোসেন
- আবদুল আযীয ইবন মারযূক আত-ত্বারীফী
- সানাউল্লাহ নজির আহমদ
- শাহ আব্দুল হান্নান
- জাবেদ মুহাম্মাদ
- ড. আবুল কালাম আজাদ
- আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান
- আব্দুল্লাহিল হাদী মুহাম্মাদ ইউসুফ
- ড. এফ.এম.কামাল
- ড. আবু বকর মুহাম্মদ যাকারিয়া
- www.quaraneralo.com
- www.islamhouse.com